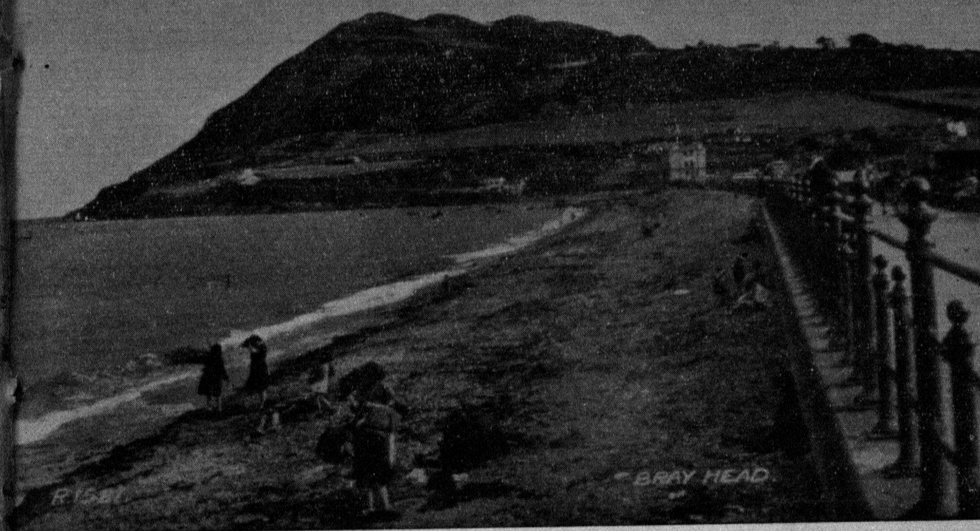
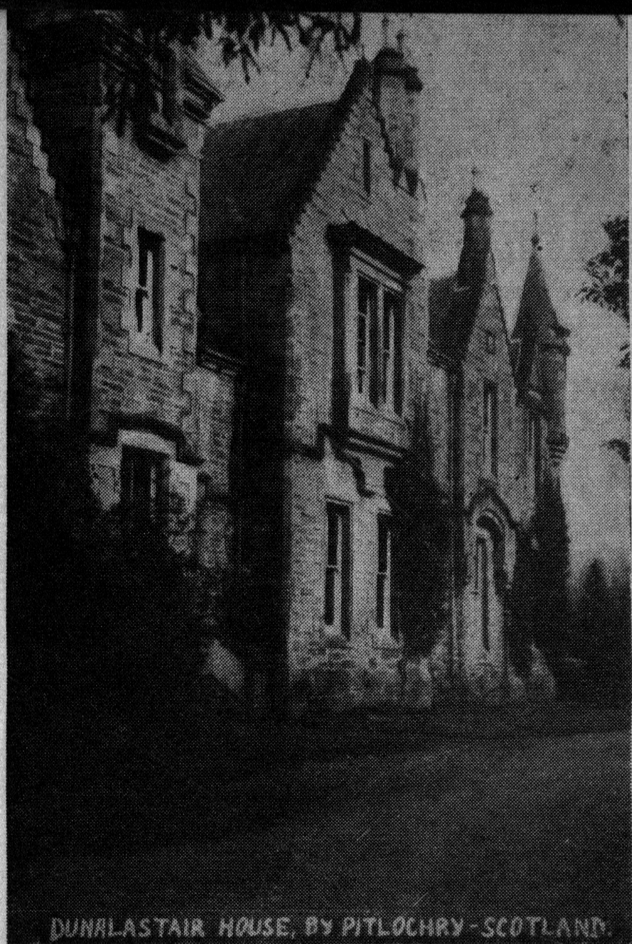


ব্রের পাহাড় ও সমুদ্রতীর



ডান্‌লিয়ারের শান্ত সমুদ্রে পালতোলা নৌকার বহর



পিট্‌লক্‌রির পোলিশ বিদ্যালয়—ডানালাস্টেয়ার হাউস

প্রাগে নিখিল যুব-উৎসবে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি



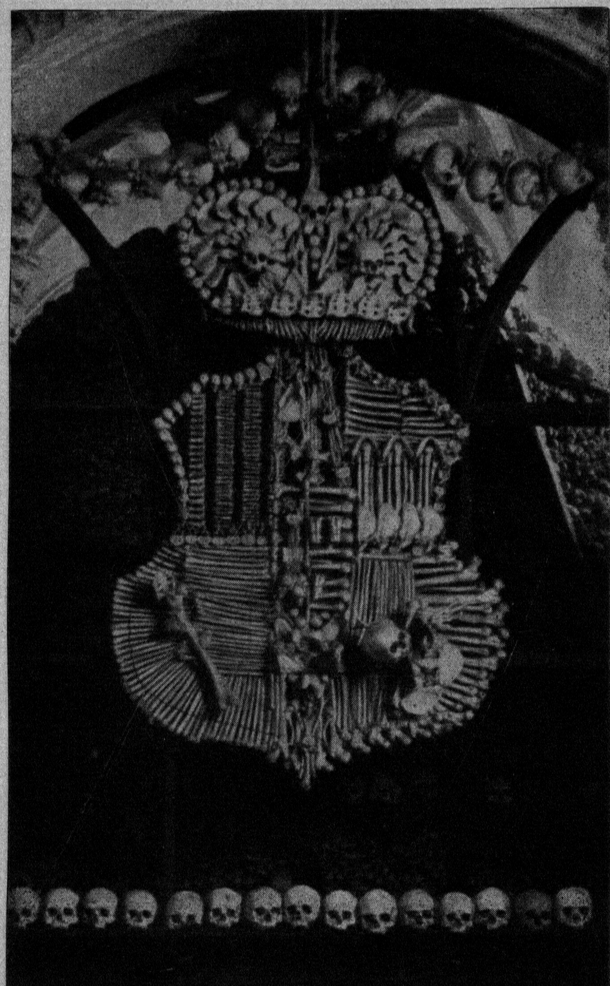
প্রাগের রাজপথ



দুনিয়া দেখছি

কল্যাণী প্রামাণিক

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২



সেডলেকের নৃমুণ্ডমালিনী গীর্জা—চেকোশ্লোভাকিয়া

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৭

প্রচ্ছদ

শ্রীকল্যাণী প্রামাণিক

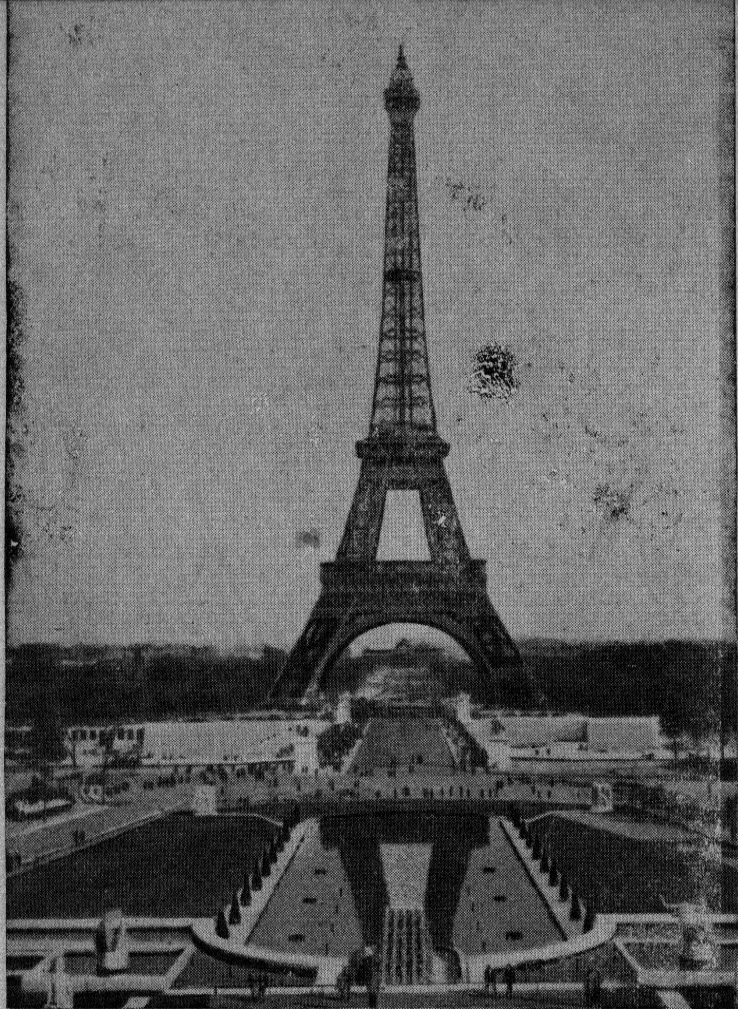
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।



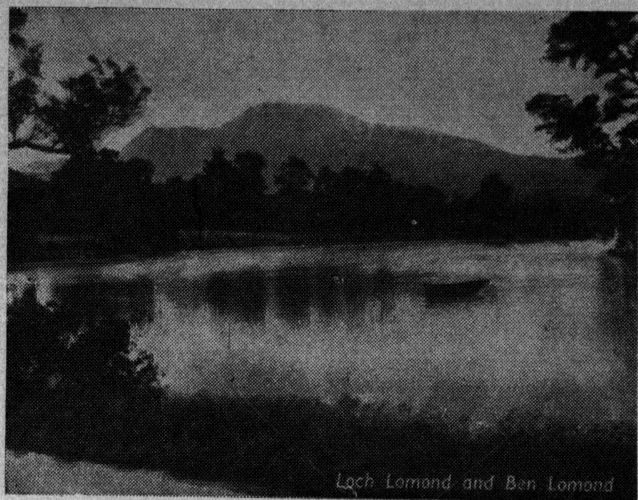
চেকোশ্লোভাকিয়ার পার্বত্যশ্রী—ক্রকনোজ

উৎসর্গ

আমার এই পুস্তকের পরিকল্পনার পশ্চাতে দুইজনের উৎসাহ ছিল,—একজন আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, আর একজন আমার ছোট ভাই নিমিসোণা। বইটি দুজনের নামেই উৎসর্গ করলাম।

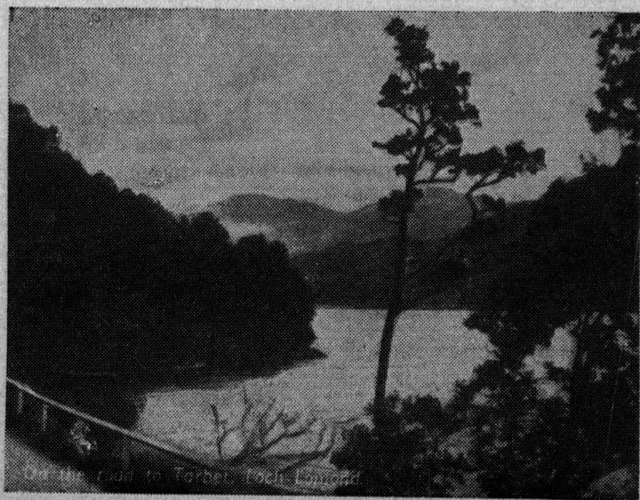


ইফেল টাওয়ার—প্যারিস



লক লমণ্ড—লেক ও পাহাড়ের দৃশ্য
স্কটল্যাণ্ড

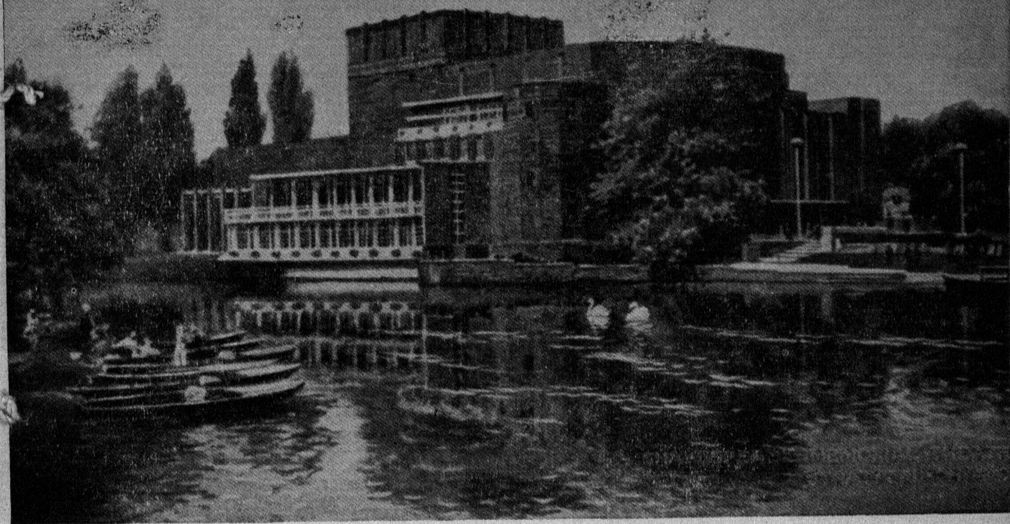
লক লমণ্ড হ্রদ—প্রকৃতি রসিকের প্রিয় স্থান



সূচীপত্র



টেইন নদীর মোহনা—টেইনমাউথ



এ্যাভন নদীর তীরে শেক্‌স্‌পীয়রের স্মারক থিয়েটার

॥ সুদূরের পথে ॥

বাংলা দেশের অতি সাধারণ মেয়ে আমি। বিশ্ববিদ্যালয় আর গৃহকোণ, আর দুএকটি বন্ধুর বাড়ি,—এইতেই যার বাইরের জগৎ সীমায়িত। জানালার ফ্রেমে আঁটা সৌধচূড়ায় আঁকাবাঁকা আকাশের টুকরো অসীম দাক্ষিণ্যের আভাস এনে দেয়, দিনে দেয় মেঘের সঙ্গী হবার ডাক, রাতে দেয় সপ্তর্ষির অকুণ্ঠ আশীর্বাদ। পার্ক থেকে কুড়িয়ে আনা একমুঠো বকুলের গন্ধ মনে আনে স্বপ্নের আবেশ, পাশে থাকে রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, ভবভূতির কয়েকটি প্রিয় কাব্য।

সেই সাধারণ মেয়ে, নিজের মনে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকা মেয়ের কাছে এল সাগরপারের ডাক। একটু আকস্মিকভাবেই।...

হয়তো আমার জীবনের পরিপূর্ণতার পক্ষে এর প্রয়োজন আছে, এই মনে করেই সে ডাকে সাড়া দিলুম। মনে হল :

"মোর জীবনের বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।"

স্থির হল, একটি সরকারী বৃত্তি নিয়ে দুবছরের জন্য লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হতে পাড়ি দিতে হবে। তখন ১৯৪৬ সাল। কলকাতায় সেই বিশ্রী ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামার ঠিক পরের ঘটনা। অক্টোবরে জাহাজ ছাড়বে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পোশাকপত্র, পাশপোর্ট ইত্যাদি জোগাড় করতে হল। আমার বাবা আমার সঙ্গে বোম্বে পর্যন্ত গেলেন, জাহাজে তুলে দিতে।

হাওড়া স্টেশনে খুবই মন খারাপ করছিল মা ভাইবোনদের ছাড়তে। তবু, কড়া হুকুম দিয়েছিলাম, মার চোখে যেন জল না দেখি। যতটা সম্ভব হাসিমুখেই বিদায় নিলাম। জামাইবাবু স্টেশনে এসেছিলেন। তিনি একটা টেডি আঁকা বালতি উপহার

টকির সমুদ্র—ডেভনশায়ার



দিলেন। 'সমুদ্রের ধারে বালু নিয়ে খেলার জন্য এটা দিলেন?' বলে খুলে দেখি টফি লজেন্স ভর্তি! বিষাদের মধ্যে হাসির রোল উঠল। সকলে ভাগাভাগি করে সেই লজেন্স খেলাম।

ট্রেণ ছাড়লে রাতে বিশেষ কিছু দেখা গেল না, শুধু অন্ধকার আকাশে অন্ধকারতর ডালপালায় জোনাকির ঝিকিমিকি। রাতে ভালো ঘুম হল না, কেবল মনে হয়, ঘুমিয়ে পড়লেই ভালো ভালো দৃশ্যগুলি পার হয়ে যাবে। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটু বেলায় উঠে দেখি, দূরে 'মেঘালংকৃতমৌলিনীলশিখর' পর্বতমালা। অনেক নদী পার হলাম। অপূর্ব সুন্দর স্থান। কত পাখি! কাছা দিয়ে কাপড়পরা মেয়েরা মাথায় পিতল তামার ঘড়া নিয়ে যাচ্ছে, রামগোপাল বিজয়বর্গীয়ের আঁকা ছবির মতো। ট্রেণ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে গেল। ঘন নীল জঙ্গল। বনস্পতির শাখায় আরণ্য-ময়ূর ঘাড় বেঁকিয়ে বসে আছে। একটা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ট্রেণ গেল, তখন চারিদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। সুড়ঙ্গ পেরিয়েই দেখি, ভীষণ উঁচু-নীচু বন্ধুর কালো পাথরের চাঁই, মস্ত পাহাড়, ঘন অরণ্যে একটি স্নিগ্ধ ঝরণা ঝর্‌ঝর্‌ করে পড়ছে। তার কাছে একটি ছোট্ট হরিণছানা বিস্ময়ভরা চোখে যন্ত্র-দানবের দিকে তাকিয়ে আছে। বহুক্ষণ ধরে পাহাড় দেখলাম।

ট্রেণেই স্নান করলাম কয়লার গুঁড়ো মেশানো জলে। ভাত আর ডিমের ডালনা খেলাম,—মুসলমানী খানা। বাবু হিন্দুখানাও নিয়েছিলেন,—ঘি, তরকারী, বড়া, ডাল, পায়েস ইত্যাদি। দুই মিলিয়ে পরিপাটি ভোজ সারা হল।

নাসিক রোড স্টেশন থেকে জলবিদ্যুতে ট্রেণ চলে, তাই কয়লার গুঁড়ো নাই। তার আগে পর্যন্ত এই কয়লার গুঁড়োই যা জ্বালাতন করেছে, তা না হলে এই দীর্ঘ যাত্রা মোটেই ক্লান্তিকর বা একঘেঁয়ে বলে মনে হয় নি আমার। এত দীর্ঘ সময় কখনও



আন্তর্জাতিক গণবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী

ট্রেনে চড়ি নি বলে মনে যে পুলকের উদয় হচ্ছিল, তাইতেই বোধহয় সব ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছিল।

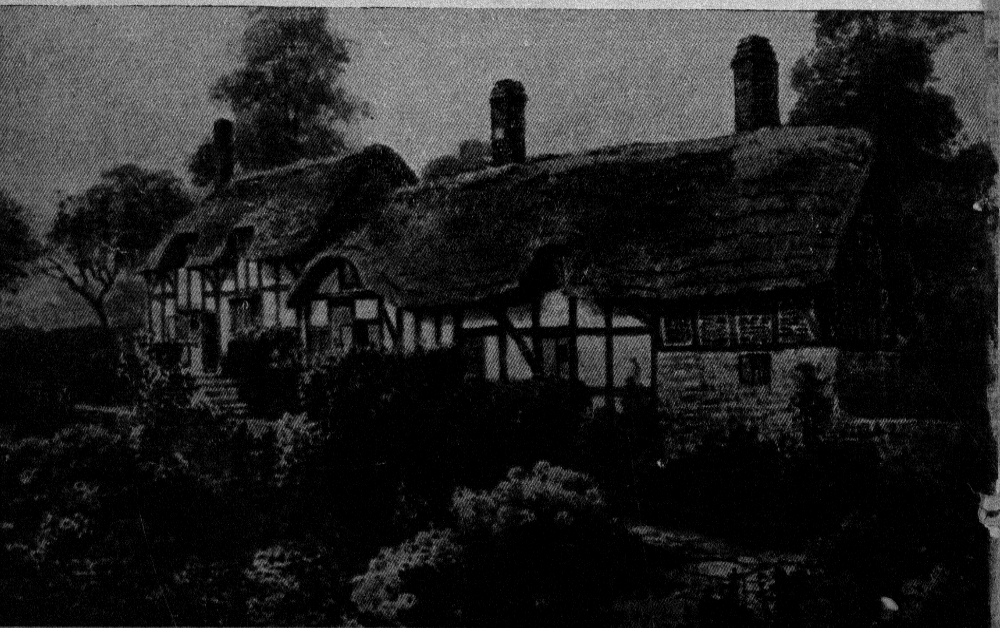
বোম্বের স্টেশনে হোটেলের লোকেরা পাণ্ডাদের মতো ছেঁকে ধরল। Sea-view নামে একটা হোটেলে উঠলাম। সেটা স্টেশনের খুব কাছে। সমুদ্রের দৃশ্য কি রকম দেখা যায়?—বাথরুম থেকে ক্রেণ ও জাহাজের মাস্তুল।

সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্রের ধারে Marine driveএ বেড়াতে গেলাম। খুব ভিড়। বাঁধানো ঘাট, শান্ত সমুদ্র, শুধু তীরের কাছে পাথরে জল আছড়াচ্ছে। সমুদ্রের তিনদিকই বোম্বে সহর দ্বারা আবদ্ধ।

জাহাজের নাম Largsbay। চড়ার আগে কাস্টম্স্ এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। আমার কিছুই তারা দেখল না। বাবাকে একটা জায়গায় আটকে দিল, এর পরেই জাহাজে উঠতে হবে। জাহাজের ডেকে উঠে দেখি জেটিতে বাবা দাঁড়িয়ে। বল্লেন, টমাস কুকের লোক বিশেষ ব্যবস্থা করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। যতক্ষণ দেখা যায়, বাবার সঙ্গে গল্প করলাম। শুনলাম, জাহাজ তার পরদিন ২২শে অক্টোবর ছাড়বে। দুরুদুরু বুকে, মুখে প্রাণপণ সাহস এনে বাবাকে বল্ছি, 'কোনো ভয় নেই তোমার, এখানে অনেক সঙ্গীসাথী আছে, ভাব করে নেব, কোনও অসুবিধা হবে না' ইত্যাদি। এখন ভাবি, বাবা নিশ্চয় মনে মনে হেসেছিলেন। ভয়টা যে কার করছে, তা কি তিনি বুঝতে পারেন নি?

জাহাজ সকাল ৮টায় ছাড়ল। তখন সবে প্রাতরাশ খেয়েছি। প্রথমে টেরই পাইনি যে, জাহাজ নড়েছে। পরে গোল গবাক্ষ দিয়ে দেখি, তীর সরে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ডেকে এসে দাঁড়ালাম। Gate of India আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। চারিদিকে কূলহারা কালো জল। সকালের রোদে দাঁড়িয়ে মন উদাস হয়ে গেল।' কোথায় ছিলাম, কোথায় যাচ্ছি, ভবিষ্যতের অন্ধকারে কী অসীম রহস্য লুকানো আছে, এই সব মনে হতে লাগল।

এ্যাভন নদীর তীরে কবিপ্রিয়ার কুটির



এই জাহাজটি সাধারণতঃ সৈন্য সরবরাহের কাজে ব্যবহার করা হয়। তাই যদিও এখন যাত্রী বহন করছে, আরামের আয়োজন নাকি স্বল্পতর। আমার কিন্তু মন্দ লাগছিল না। কিছু বকশিস দিলে সব ব্যবস্থাই ভালো হয়। তাই খাবার টেবিলে এবং অন্যত্র,—কোথাও অসুবিধা হয় নি। জাহাজটি পেট্রোলে চলে, তাই কয়লার ধোঁয়া নেই।

সমুদ্র মাঝে মাঝে অশান্ত হয়। ঠাণ্ডাও ক্রমশঃ বেশি বোধ হচ্ছে। সামুদ্রিক পীড়া আমার একবারও হয় নি।

জাহাজে দিনগুলি খুব আনন্দে কেটেছে। বাঙ্গালী, অসমীয়, বিহারী, উড়িয়া, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, দিল্লীওয়ালী, গুজরাটী, হায়দ্রাবাদী সব আছে। আমার একটা পুরানো শাড়ী পেতে সকলে বসে গল্প করি। বাড়ি থেকে আনা আচার, মিঠাই ইত্যাদি ভাগ করে খাই। সমুদ্রের রং বার বার বদলায়। সবুজ, হাল্‌কা নীল, কালির মতো, শ্লেটের মতো,—কত বর্ণ বৈচিত্র্য! উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক দেখি প্রায়ই। তিমিরও দেখা মিল্‌ল, ফোয়ারার মতো জল ছুঁড়ছিল। কিছু সামুদ্রিক পাখি আছে, তারা জাহাজের সঙ্গে সঙ্গেই যায়, সন্ধ্যায় মাস্তুলে আশ্রয় নেয়।

২৬ তারিখে সকালে বাবার একটি বেতারে টেলিগ্রাম পেয়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠল। আর কারো এখনও কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে বার্তা আসে নি। বাবার আদরিণী বলে বন্ধুমহলে নাম হয়ে গেল। আজ আরবের তীর দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে। শুধু বালি আর পাহাড়। একটা মস্ত হাঙ্গর আমাদের জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেশ কিছু দূর চল্ল, তারপরে ডুবে গেল। সামুদ্রিক সংস্কারবশে নাবিকরা নানারূপ অমঙ্গল আশঙ্কা করতে লাগল, কিন্তু ভালোমন্দ কিছুই হল না।

রাতে এডেন পার হয়ে এসেছি। ২৭ তারিখে লোহিত সমুদ্রে পড়লাম। একদিকে আরব, আর একদিকে আফ্রিকা। অনেক



আন্তর্জাতিক গণবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত ম্যানিকা

সুইডেন ও প্যালেস্টাইনের দুটি ছাত্রী
আন্তর্জাতিক গণবিদ্যালয়



পাহাড়ে দ্বীপ, তার মাথায় বাতিঘর। লাল রংএর শৈবাল জলে ভাসে। কড মাছ খেলাম, অদ্ভুত স্বাদ।

৩০ তারিখে সকালে জাহাজ Port Tewfik-এ পৌঁছাল। মরুভূমির মধ্যে সুন্দর সাজানো গুছানো সহর। অনেক নৌকা করে মিশরীয়রা এল। তাদের সঙ্গে চামড়ার হাতব্যাগ, জীপ লাগানো ব্যাগ, সিগারেট কেস, কুশনকভার, জুতো ইত্যাদি সামগ্রী। তারা গবাক্ষে আঁকশি ছুঁড়ে নিজেদের নৌকা আটকাল, তারপর পাল নামিয়ে দিয়ে দরদস্তুর করতে লাগল, যারা কিনছিল, তাদের দিকে লম্বা দড়ি ছুঁড়তে লাগল। দড়ির সঙ্গে ঝুড়ি ঝুলছে। তাতে করে জিনিস ও টাকা আদানপ্রদান হল। অনেক কাফ্রিও তাদের মধ্যে ছিল। হঠাৎ দেখি খালাসীরা ব্যাপারীদের দিকে বিস্কুট, রুটির টুকরো ছুঁড়ছে। শেষে হোস পাইপ দিয়ে জল ছুঁড়তে লাগল। তখন তারা গালাগালি দিতে দিতে পালাল। আমরা সাহেবদের এ রকম অভদ্র ব্যবহারে খুব চটে গেলাম। একজন ত বলেই ফেল্ল, 'আজ আমরা বিলেতী আদবকায়দা শিখলাম।' তারা বল্ল, 'ওরা অনেক সময়ে দুষ্ট মতলবে আসে, গবাক্ষের ভিতর দিয়ে ঢোকে।' কিন্তু গবাক্ষ ও কেবিনের দরজা তখন বন্ধ করাই ছিল, এবং প্রথমেই ওদের জাহাজের কাছে আসতে বারণ করলে হত ; আসতে দিয়ে, যখন বেচাকেনা বেশ জমে উঠেছে, তখন এ রকম করে জল ছিটিয়ে তাড়ানোটা খুবই অভদ্রতা বলে বোধ হল আমাদের। জাহাজ চলার আগে মিশরীয় পতাকা লাগানো হল। সবুজ পতাকায় সাদা চাঁদ ও তিনটে সাদা তারা।

জাহাজ সুয়েজ খালে ঢুকল। বিকাল বেলা সহর স্পষ্ট দেখা গেল। অতি পরিষ্কার সুন্দর ঝক্ঝকে বাড়িগুলি ছবির মতো। সন্ধ্যার সময়ে পাহাড়ের পিছনে সূর্য অস্ত গেল। মরুভূমির মধ্যে সহর,—খেজুর, ঝাউ ও এক প্রকার শস্য,—



ডেনমার্কের গ্রামের বাড়ি

ডেনমার্কের চাষার বাড়ি



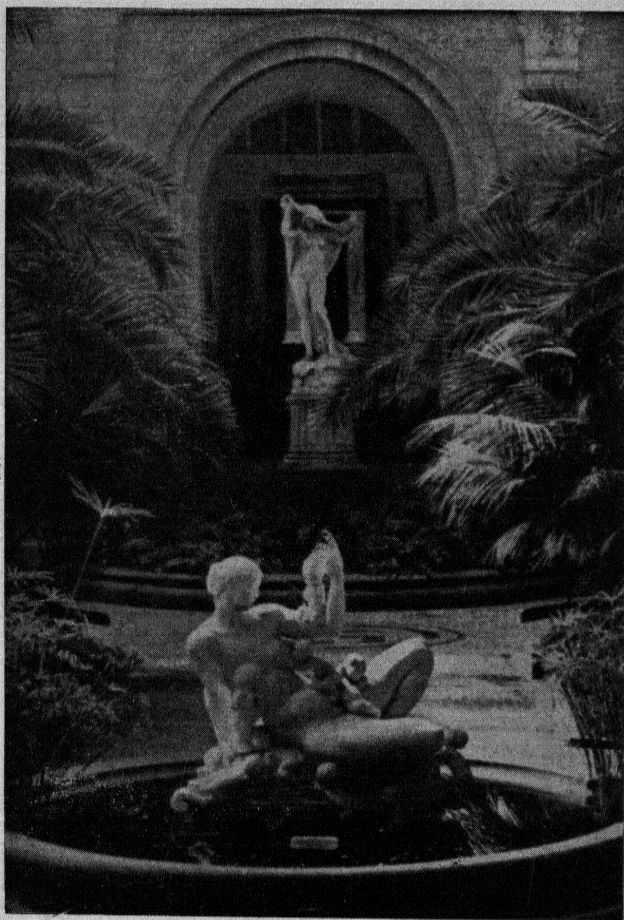
এই গাছ। খুব ঝোড়ো বাতাসে গাছপালা নুয়ে পড়ছে। বাড়ির উঠানে পোষা উট বাঁধা আছে। গাধায় চড়ে লোক যাচ্ছে। কতগুলি হ্রদ পেরিয়ে রাতে ইস্মাইলিয়া নামে একটি সহর দৃষ্টিগোচর হল। প্রকাণ্ড সহর, আলোর মালায় যেন দেয়ালী.উৎসবে সজ্জিত মনে হচ্ছিল।

৩১শে ঘুম ভেঙ্গেই দেখি গবাক্ষের ভিতর দিয়ে গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। জাহাজ পোর্ট সৈয়দে নোঙ্গর করল। আমরা তাড়াতাড়ি ডেকে গেলাম্। দেখি গতকালের মতো অনেক লোক নৌকা করে জিনিস বেচছে, জাহাজশুদ্ধ লোক কিনছে। আমি একটা স্ফিংক্স্এর ছবি আঁকা কার্পেট কিনলাম। গোলাপফুল, বড় বড় রসালো খেজুর, নারাঙ্গলেবু, কমলালেবু ইত্যাদি বিক্রী হচ্ছিল। খবরের কাগজওয়ালারা এসেছিল। অনেক সাহেব ফেজটুপি কিনে মাথায় পরে ঘুরতে লাগল। মিশরীয়রা জাতীয় পতাকা লাগানো মোটর লঞ্চে চড়ে বেড়াতে লাগল। একজন যাদুকর জাহাজে এসে 'গিলিগিলি গিলিগিলি' শব্দ করতে করতে সাহেবের বাচ্চাদের নাক থেকে পকেট থেকে মুরগীর ডিম, ছানা বার করল।

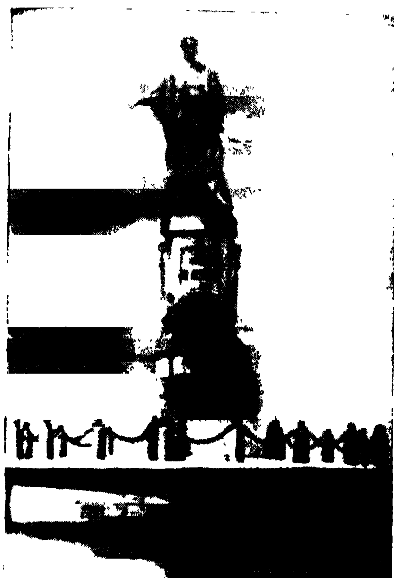
বেলা একটার সময়ে জাহাজ চলতে আরম্ভ করল। বাঁধের ওদিকে ভূমধ্যসাগরের জল। লেসেপ সাহেবের মূর্তি খালের দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে।

ক্রমশঃ খাল পেরিয়ে সাগরে এলাম। জাহাজের গতি বেড়ে গেল। আবার অকূল সমুদ্র।

২রা নভেম্বর সমুদ্র সকাল থেকেই খুব অশান্ত। ঘন নীল রঙে উত্তাল ঢেউ। মেঘলা আকাশ। বিকেলে অল্প বৃষ্টি হল, তখন আকাশে দুটি রামধনু দেখা গেল। দুটি ছোট পাখি আমাদের ডেকে উড়ে এসেছিল। একটা পাখি ভিজে, সমুদ্রে গা ভাসিয়ে মাছ ধরছিল বোধ হয়। আজকের সন্ধ্যাটি রঙে রঙে অপূর্ব হয়েছিল।



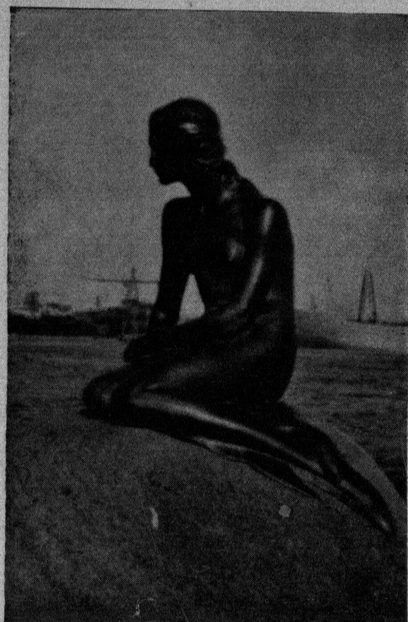
কোপেনহেগেনে গ্লিপ্‌টোটেক যাদুঘরে শ্বেতপাথরের মাতৃমূর্তি



সুয়েজ খালের মুখে লেসেপ্‌স্‌ সাহেবের মূর্তি

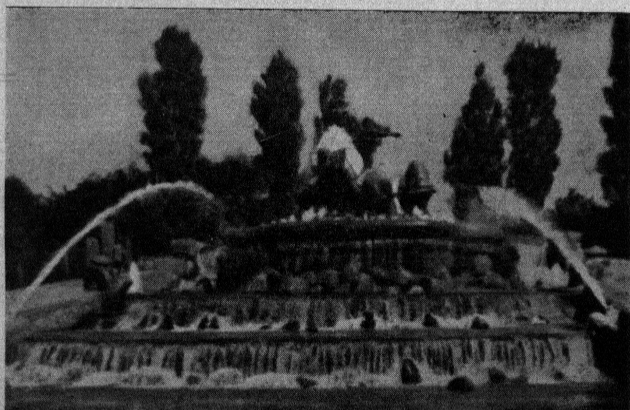
মাল্‌টা





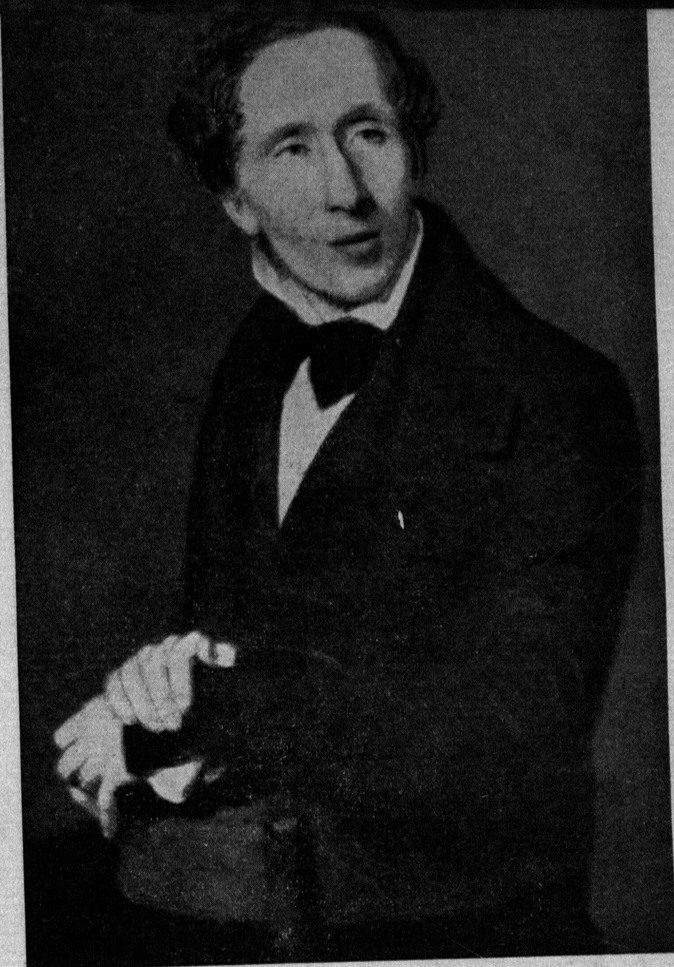
এণ্ডারসেনের সাগরিকা—কোপেনহেগেন

কোপেনহেগেনের একটি ফোয়ারা—দেবী জিফঁর মূর্তি





লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংঘের বাড়ির সম্মুখে ভারতীয় ছাত্রদল



রূপকথার রাজা হ্যান্স্ এণ্ডারসেন

তেসরা জাহাজ মাল্টা পৌঁছাল। এখানে দুদিন থামবে, কিছু কিছু মালপত্র নামানো দরকার। সামনে মাল্টা দ্বীপ, পাহাড়ে সহর। পাহাড় থাকে থাকে কেটে এই জায়গাটি তৈরী। পাথরে বাঁধানো দেয়ালের উপরে বাড়ি। এক জায়গায় দেখলাম খুব উঁচু লিফ্‌টে করে লোক পাহাড়ের মাথায় রাস্তায় উঠছে। এক বকম ছোট ছোট গুল্মজাতীয় গাছ ও সাইপ্রাস ধরনের গাছ দেখছি। যুদ্ধেব সময়ে মাল্টা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বোমায় বহু ঘরবাড়ি এবং পাথরের দেয়াল ভেঙে চুরমাব হয়েছে।

বন্দরের মধ্যে জাহাজ ঢোকাতে খুব বেগ পেতে হল। নানাদিক দিয়ে চেষ্টা করে কোনও মতেই সুবিধা না হওয়াতে একটা ছোট জাহাজ এল। সেটা আগে আগে পথ দেখাতে লাগল, ক্রমশঃ তার সাহায্যে আমাদের জাহাজ বাঁধের মধ্যে ঢুকল। বাঁধের মুখটা সরু, দুটো বড় জাহাজ বোধ হয় পাশাপাশি ঢুকতে পারে না। একটা ব্রীজেব মতো আছে, সেখানে বাধা পেয়ে জল দশ বারো ফুট উঁচুতে লাফিয়ে ভেঙে পড়ছে। বন্দরের মধ্যে শান্ত সবুজ জল। পাল তোলা নৌকা যাচ্ছে। কতগুলো প্রকাণ্ড জাহাজ যুদ্ধে ভেঙে গিয়ে জলে অর্ধমগ্ন হয়ে মরচে ধরে পড়ে আছে। এই বন্দরে অনেক যুদ্ধজাহাজ আছে। লম্বা লম্বা বন্দুক তাতে। সৈন্য ভর্তি জাহাজও দেখলাম। এটা সৈন্যদের শিক্ষাকেন্দ্র। একটা জাহাজ থেকে ছোট ছোট নেভির শিক্ষার্থী নৌকায় লাফিযে পড়ে টেনিস খেলতে গেল। এ জায়গাটা মিলিটারীর শাসনাধীন বলে কাউকে নামতে দেওয়া হল না।

শ্রমিকদের পায়ে চটের থলে জড়ানো, জুতোর বদলে। পোশাকের অবস্থাও ভালো নয়। দুদিন ধরে ক্রমাগত জাহাজ থেকে ঠাণ্ডা ঘরে রাখা ও কাপড়ের থলেতে ভরা বড় বড় গরু, শুয়োরের ধড় ক্রেণে করে মাল্টায় নামানো হল। সেগুলি

এণ্ডারসেনের রূপকথা—সন্তানহারা মা—ওডেন্স



দেখে দেখে সাময়িকভাবে মাংসের উপরে ঘৃণা ধরে গিয়েছিল। জাহাজ মাল্টা ছাড়লে স্বস্তিবোধ করলাম।

১১ই নভেম্বর জাহাজ সাউদামটনে লাগল। যারা বিশেষ ট্রেণে লণ্ডনে যাবে তারা ১২ তারিখে জাহাজ থেকে নামল। ১২ই নেমে লণ্ডনে দুপুর সোয়া এগারটায় এলাম। হাই কমিশনারের লোকেরা দেখাশুনা করেছেন।

লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য আগে থেকেই সিট ঠিক করা ছিল। ১৭ই নভেম্বর রবিবার সকালে রওনা হলাম। আমার জন্য যে থাকার জায়গা ঠিক হয়েছে, সেখানে পোঁছে দেখি, সেটা সহরের বাইরে একটা গ্রামে। সেখানে গাছ, পাহাড়, নদী—সব আছে।



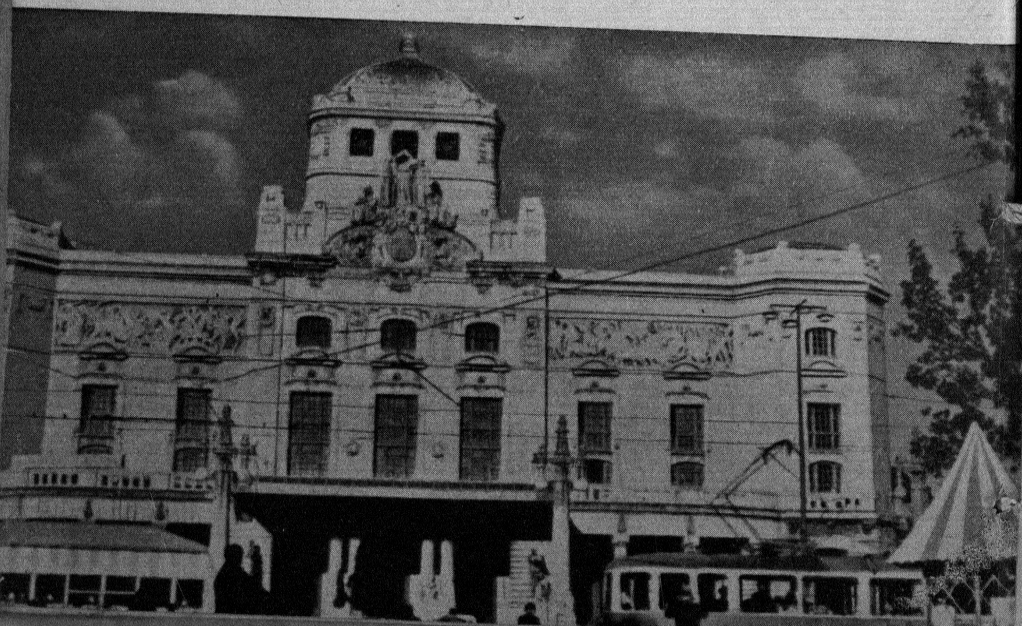
সুইডেনের রাজধানী স্টকহল্‌মের দৃশ্য

॥ লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ॥

লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ঢের ছোট। ছাত্রসংখ্যা প্রায় তিন হাজারের মতো। কলকাতার সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র পরীক্ষা করে উপাধি দেওয়াই লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ নয়। যখন প্রথম গেলাম, আমাদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক বলে দিলেন, 'এখানে তোমরা শুধু পড়তেই আসো নাই। আমরা চাই, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা জীবনকে দেখবে, পরিপূর্ণভাবে বাঁচার চেষ্টা করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামুদায়িক জীবন একটা মস্ত বড় কথা, এবং এখানে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে নানাবিধ সমিতি সংঘ ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে তোমরা জীবনকে উপভোগ করবে। চোখ কান সর্বদাই খোলা রাখবে, আধুনিকতম খবরও তোমাদের রাখতে হবে। নয়ত, শুধু কতগুলি বই মুখস্থ করলেই এখানকার কর্তব্য সমাপ্ত হবে না।'

আমি দু বৎসর ছিলাম, এই কথাগুলির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের সঙ্গে কথাগুলি মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করেছি। দেখেছি, অধ্যাপক মহাশয় ঠিকই বলেছেন। ভারতবর্ষে যেন মনে হত, অদৃশ্য বোরখায় ঢাকা জীবন। তাতেও পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সম্মান পেতে বাধা হয় নি। কিন্তু সব কৃতিত্বের পরেও একটি নিতান্ত নিরীহ আত্মকেন্দ্রিক জীব ছাড়া আর কিছুই ছিলাম না। কিন্তু এখানে? এখানে গতি স্বচ্ছন্দ, নির্ভয়। এখানে আমি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছি। এখানে চোখ মেলে তাকাতে পারছি, এখানে খোলা মনে হেসে উঠলেও কেউ ভ্রূকুটি করবে না। এমন স্বাধীনতার স্বাদ পরাধীন দেশের নারীজাতির একজন হয়ে আমি আগে বাস্তবিকই পাই নি। (১৯৪৬ এর কথা বলছি।)

স্টকহল্মের থিয়েটার



এখানকার জীবন বহু ধারায় উৎসারিত। বাস্তবিকই কয়েকটি পুঁথি মুখস্থ করার মধ্যে তা আবদ্ধ নয়। প্রচুর বই আছে, বিষয়গুলি খোলা চোখে সাদা মনে দেখে আলোচনা করে বিচার করে গ্রহণ করতে হয়। নিজের চিন্তাশক্তি প্রয়োগ না করলে পরীক্ষায় ভালো ফল করা শক্ত। খুব গ্রন্থকীট বিদ্যোৎসাহী ভদ্রলোকদেরও খারাপ ফল কবতে দেখেছি এই ধারাটি ঠিক বুঝতে না পারার জন্য। শিক্ষাজগতের সব খবরই মোটামুটি রাখতে হত, এবং পরীক্ষায় এমন প্রশ্ন এসেছিল যার সুষ্ঠু উত্তর দিতে হলে আগের সপ্তাহের Times Educational Supplement পড়া থাকা চাই।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্র-সংঘটির বিষয় না বললে কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়েব সমাজজীবনে আমরা সবাই অংশীদার। আমাদের ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ঐতিহ্য, ভিন্ন সংস্কার। সব রকম রুচির ব্যবস্থা যথাসাধ্য করা হয়েছে এই সংঘে। আমরা ব্যক্তিগত ভাবে যাতে আমাদের রুচিমতো কাজ বেছে নিতে পারি, এবং সমাজগত ভাবে যাতে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে পাবি তারই জন্য এই ছাত্র ইউনিয়নটি চেষ্টা করছে। আমাদেব ভাইস-চ্যান্সেলাবেব ভাষায় ঃ—

"The pursuit of learning provides an interest common to all : but a single interest is not enough for a full life. To get the best out of his time at the University the student must join with his fellows in some form of corporate activity, whether physical or intellectual. Without this he will not acquire a sense of community and though he may have much learning he will have little wisdom. He may understand the quantum theory but he will not understand his fellow-beings. A University training should aim at both.

"The Union, the centre of the corporate life of the students, provides a great variety of communal activities······It is to be hoped that every student will find at least one which suits his bent to which he is prepared to contribute his own personal efforts. The more he gives to the University the more he will get out of it, and the more will University life seem and be worth-living." অর্থাৎ—বিদ্যাচর্চায় সাধারণভাবে সকলেরই আগ্রহ আছে, কিন্তু একটি সমগ্র জীবনের পক্ষে কেবল-মাত্র একটি বিষয়ে আগ্রহই যথেষ্ট নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়টুকুর পূর্ণসদ্ব্যবহার করতে হলে ছাত্রকে তার সঙ্গীদের সঙ্গে কোনও সামুদায়িক কাজে যোগ দিতেই হবে,—তা সে শরীরচর্চামূলকই হোক বা বুদ্ধিচর্চামূলকই হোক। এ না হলে তার সামাজিক বোধ জাগ্রত হবে না, অনেক বিদ্যা শেখা হলেও জ্ঞানভাণ্ডার তার অপূর্ণই থেকে যাবে। সে হয়তো কোয়াণ্টাম তত্ত্ব বুঝতে পারবে, কিন্তু তার সাথীদের সে বুঝবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য দুই রকমই হবে।

ছাত্রদের সমাজজীবনের কেন্দ্র এই সংঘটি নানাবিধ সামুদায়িক কাজের ব্যবস্থা করেছে।······আশা করা যায় যে প্রত্যেক ছাত্রের কাছে এতগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটি কাজও মনের মতো হবে, এবং তাতে সে তার ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা কিছু দান করতে পারবে। সে বিশ্ববিদ্যালয়কে যত বেশি দেবে তত বেশি তার কাছ থেকে পাবে, এবং ততই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন তার কাছে সুন্দরতর হয়ে উঠবে।

এই ছাত্রসংঘের একটি বেশ বড় নিজস্ব বাড়ি আছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে এই বাড়িটির উদ্বোধন করা হয়। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য সব রকম ব্যবস্থা আছে। ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথক্ বিশ্রামের বিরাট হলঘর আছে। তাতে সোফা

ইত্যাদি সাজানো। তার সঙ্গে লাগানো ক্লোকরুম ও স্নানের ঘর আছে। বাড়িতে স্নানের অসুবিধা থাকলে এখানে এসে গরম জলে খুব আরাম করে স্নান করা যেতে পারে। নাচবার জন্য একটি হলঘর আছে। বাঁধানো স্টেজশুদ্ধ ঘর আছে। নিজস্ব cafe´teria আছে, ছাত্রছাত্রী উভয়ে বিশ্রাম করতে পারে এমন ঘর আছে, নিজস্ব একটি লাইব্রেরী ও পড়ার ঘর আছে। জিনিসপত্র চাবি দিয়ে রাখার জন্য লকারও পাওয়া যায়। ফটো ডেভেলাপ করার জন্য একটি ডার্করুম আছে। বিলিয়ার্ড খেলারও জায়গা আছে। বিভিন্ন সমিতির সভা বসার জন্য কতগুলি ঘর আছে।

সংঘের বাড়ির গায়েই সংঘ পরিচালিত খাবার জায়গা। এখানে দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত লাঞ্চ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সকাল ৮-৩০ থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এটি খোলা থাকে। কোনও উৎসব থাকলে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্তও খোলা থাকে। অবশ্য, এতে সব ছাত্রের খাওয়া সম্ভব হয় না বলে এর পাশে আর একটি refectory খোলা হয়েছে যেখানে ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত শুধু লাঞ্চই দেওয়া হয়। ডাক্তারি যারা পড়ে তাদের জন্য আলাদা একটি খাবার জায়গা আছে।

সংঘের কাজকর্ম চালাবার জন্য চাঁদা ৪ পাউণ্ড। The Gryphon নামে একটি পত্রিকা ও The Union News নামে একটি পাক্ষিক খবরের কাগজ এই সংঘ থেকে বার করা হয়। সংঘের নিজস্ব সংবিধান আছে। সংঘের কমিটির বহু কাজ। প্রতিষ্ঠানটি বেশ বড় এবং এর কাজ চালানো বেশ শ্রমসাধ্য। সংঘের নিজস্ব রং (colour) হচ্ছে সবুজ, সাদা ও মেরুন। এই রংএর টাই, মাফলার, স্কার্ফ ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যায়।

এই ছাত্রসংঘের অধীনে নানাবিধ ক্লাব ও সমিতি আছে। তাদের নাম করলেই এখানকার কাজকর্মের বৈচিত্র্যের আভাস

পাওয়া যাবে। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পছন্দমতো এক বা একাধিক সমিতির সভ্য হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালের সমিতিগুলি নিম্নরূপ :—

Association Football Club.
Athletic Club.
Women's Athletic Club.
Badminton Club.
Basketball Club.
Boat Club.
Women's Boat Club.
Boxing Club.
Climbing Club.
Cricket Club.
Women's Cricket Club.
Cross Country Club.
Fencing Club.
Fives Club.
Golf Club.
Gym Club.
Hockey Club.
Women's Hockey Club.
Women's Netball Club.
Rugby Union Football Club.
Rugby Union Football Club (Medicals).
Swimming Club.
Tennis Club (Men).
Women's Tennis Club.
Table Tennis Club.
Agricultural Society.
Anthropological Society.
Arab Society.

Catholic Society.
Chemical Society.
Chemical Engineering Society.
Chess Society.
Christian Union.
Church of England Society.
Conservative Association.
Classical Society.
Debates Society.
Dental Students' Society.
Economics Society.
Engineering Society.
English Society.
French Society.
Geographical Society.
German Society.
Indian Association.
International Society.
Jewish Students' Association.
Law Society.
Leather Students' Society.
Liberal Society.
Mathematical Club.
Methodist Society.
Mining Society.
Music Society.
Natural History Society.
Philosophical Society.
Photographic Society
Physical Society.
Riding Club.
Rhythm Club.

Scout & Guide Group.
Sketching Society.
Slavonic Society.
Socialist Society.
Social Studies Society.
Spanish Society.
Student Christian Movement.
Textile Society.
Theatre Group.
Grants & Welfare Sub-Committee.

এই সংঘ থেকে মাঝে মাঝে বল নাচ ও পার্টির ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিবৎসর গ্রীষ্মের টার্মের শেষে পরীক্ষার পরে একদিন Ragday হয়। ঐ দিনটি খুব মজার। ছাত্রছাত্রীরা নানাবিধ অদ্ভুত সাজে সেজে সারা সহর ঘুরে বেড়ায় এবং সহরবাসীর কাছ থেকে টিনের কৌটো হাতে চাঁদা তোলে। নানারকম সেজে অনেকগুলি লরী বোঝাই হয়েও তারা সহরে শোভাযাত্রা করে। আমাদের চোখে এটা খুবই নতুন ঠেকেছিল। যাদের গম্ভীর মুখে বই হাতে ক্লাসে যেতে দেখেছি, অথবা লেবরেটরী ঘরে যন্ত্রপাতির মধ্যে বিশ্বসংসার ভুলে যেতে দেখেছি, হঠাৎ যদি তারা বাচ্চা ছেলে সেজে পেরাম্বুলেটারে চড়ে ফিডিংবটল মুখে দিয়ে বেড়ায়, অথবা টাউনহলের সামনে খোলা জায়গায় স্ট্যাচুগুলোর গায়ে পরী সেজে বেয়ে বেয়ে ওঠে, অথবা বিকটাকার দৈত্য সেজে মুখোশ পরে ভয় দেখাতে যায়, তবে ত আশ্চর্য হবারই কথা। সেদিন সহরের সব লোকজন রাস্তায় সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের বাঁধভাঙা আনন্দের অংশ গ্রহণ করে।

একদিন সংঘের 'বাজার ডে' (Bazaar Day)। নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তির ঠিক পরেই এটি হয়। ঐদিন সমস্ত সমিতিগুলি যে যার নিজের বিজ্ঞাপনের জন্য বাজার সাজিয়ে বসে। নানাবিধ চার্ট, পোস্টার, পুস্তিকা ইত্যাদি দিয়ে এক একটি জায়গা সাজানো

হয়। সেখানে সেই সমিতির সভ্যরাও থাকে, আর যত দর্শক ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের সমিতির সভ্য হবার জন্য অনুরোধ করে। সুন্দর করে সাজানোর ফলে মনে হয় যেন মেলা বসেছে। ঐদিন অনেকে অনেক সমিতির সভ্য হয়। অবশ্য, পরেও হতে পারে। এই 'বাজার ডে' বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে খুবই আনন্দের দিন। নতুন ও পুরাতনের মিলনে আনন্দে হাসিতে হল্লাতে সংঘটির অপরূপ শোভা হয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, রাজনীতিবিদ্, অর্থনীতিবিদ্ প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করে বক্তৃতার ব্যবস্থা করাও ছাত্রসংঘের কাজ। এই বক্তৃতাগুলি শুনে ছাত্রসাধারণ যে-নানাভাবে উপকৃত হয় একথা বলাই বাহুল্য।

প্রায়ই ছাত্রসংঘ থেকে Lunchtime Music-এর ব্যবস্থা করা হয়। যেদিন এই ব্যবস্থা থাকত, সেদিন তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়েই গান বাজনা শুনতে যেতাম। ভালো ভালো ঐক্যতান বাদকের দল, বিখ্যাত গায়িকা ইত্যাদির সুন্দর সঙ্গীত বিনা পয়সায় বহুবার উপভোগ করেছি। শুধু সঙ্গীত পরিবেশন করা নয়, ভালো ভালো অভিনয়ের দলও মাঝে মাঝে আনা হত। মনে আছে, একবার একটি অভিনয়ের দল এসেছিল শেক্স্পীয়ারের নাটক দেখাতে। 'জুলিয়াস সীজার' আর 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' হয়েছিল। একবার ব্যালে নাচও দেখেছিলাম। এর আগে কখনও ব্যালে দেখি নি। এতে কথা কয় না, শুধু নেচে নেচে ভাবপ্রকাশ করে। সেদিনের পালা ছিল হংসরাজকুমারী। গল্পটা বেশ। একজন রাজকুমার মৃগয়ায় গিয়ে এক হংসীকে মারতে গিয়ে দেখে তার মাথায় মুকুট। তখন বুঝল, এ হংসী নয়, কোনও শাপগ্রস্ত রাজকন্যা। তখন তাকে উদ্ধার করার অনেক চেষ্টা করল, সখী হাঁসরাও খুব নাচতে লাগল। কিন্তু যাদুকরের হাত থেকে তাকে কিছুতেই উদ্ধার করা গেল না। এই হল গল্পাংশ। এই সঙ্গে

ছোট ছোট লোকনৃত্য কয়েকটি ছিল। একটা নাচ ছিল গয়লানী নৃত্য। একজন লোক গরু হয়ে হাতের আঙুল দিয়ে বাঁট করল। একজন তার পিছনে দাঁড়িয়ে হাত দোলাতে লাগল, যেন লেজ দোলাচ্ছে। একটি মেয়ে আঙুল টেনে টেনে দুধ দুইতে লাগল। এই রকম সব নাচ।

বিভিন্ন সমিতিগুলির উদ্যোগে নানারকমের উৎসবাদি প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয়। একটি উৎসবের বর্ণনা দিচ্ছি। আমরা Indian Association থেকে একবার স্বাধীনতা দিবসের উৎসব করলাম। ১৯৪৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী রবিবার দিন বলে ২৮শে তারিখে ঐ উৎসব হল। ছাত্রসংঘের বাড়ির বড় হল ঘরটা (Riley Smith Hall) এজন্য নেওয়া হয়েছিল। অনেক সাহেব মেম এসেছিলেন। স্টেজে মস্ত বড় ভারতের মানচিত্র, তাতে একটি মেয়ে যেন মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে 'সারে জঁহাসে আচ্ছা' তারপরে 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা' কোরাস গান হল। কিছু গাইতে না জানলেও গান গাওয়া যায়, বিলেতের এই মজা। একটি ছোট্ট মেয়ে বেশ নাচল। গ্লাস্‌গো থেকে এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি বাঁশি বাজালেন। লণ্ডন থেকে কুমুদ মেহতা নামে এক ভদ্রমহিলা এসে খুব ভালো বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতার সারমর্ম হচ্ছে, যুদ্ধ হয়ে গেছে, এখন ব্রিটেনের ছেলেরা দেশে গিয়ে সুখী ও সুন্দর ঘর তৈরী করুক (খুব হাততালি)। ঘর ভেঙে কি হবে? কেন তোমরা আমাদের ছেলেদের গুলি করে আমাদের ঘর ভাঙছ? তোমাদের তো যথেষ্ট কাজ আছে, তাই কর না, আমাদের ব্যাপার আমাদেরই মীমাংসা করতে দাও (সব মুখ চুন)। বক্তৃতার পর কাওয়ালি হল। হক সাহেব (একজন ছাত্র) নবাব সাজলেন। হুসেন সাহেব (আর একজন ছাত্র) তাঁর বান্দা হয়ে তাঁর পা টিপে দিচ্ছিলেন। তখন তাঁর বন্ধুরা এল গানবাজনা করার জন্য। খুব 'আইয়ে আইয়ে'

কোলাকুলির পর গান আরম্ভ হল। একজন পিয়ানোয় বসলেন, একজন তবল্‌চী ছিলেন। হিন্দুস্তানী গানটি খুব মজার। 'যার সঙ্গে ঝগড়া তার ঘরের সামনে একটা লাশ লট্‌কে দেব', এই ধরনের মানেটা। তারপর আর একটা গান হল যার মানে, 'লণ্ডনে গিয়ে উল্লু বনে গিয়েছি' এই সব। তারপর লণ্ডন থেকে নিমন্ত্রিত শ্রীরতনলাল সরকার খুব সুন্দর সেতার বাজালেন। এর পরে সেই ছোট্ট মেয়েটি ঘুরে ঘুরে চড়াইপাখির মতো নাচল। শেষকালে 'জনগণমন' গান হল ও তারপর Our Heritage প্রভৃতি কয়েকটা ছোট ছোট ফিল্ম দেখানো হল।

এই ছাত্রসংঘের একটি প্রাক্তন ছাত্র সমিতি (Old Students' Association) আছে। বৎসরে একবার করে এর তরফ থেকে ডিনার ও নাচের ব্যবস্থা করা হয়। সংঘের বাড়িতে পৃথক প্রাক্তন ছাত্রদের ঘর আছে। সভ্যরা সে ঘর ব্যবহার করতে পারেন।

ছাত্রসংঘটি জাতীয় ছাত্রসংঘ (National Union of Students) এর অনুমোদিত ও তার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এখানকার সব ছাত্রই N. U. S. এর সভ্য। এই জাতীয় ছাত্রসংঘ ইংল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্‌ ও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের ছাত্রদের যুক্ত প্রতিষ্ঠান। এছাড়া, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ছাত্রসংঘ (United Nations Student Association) একটি আছে, যা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান। লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়েও এর শাখা আছে।

দুটি বৎসর এখানে মনের আনন্দে পড়াশোনা করেছি, নানাবিধ সামুদায়িক কাজে যোগদান করে, বিভিন্ন পোশাকের বিভিন্ন আচারের মানুষের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করে বিশ্বমৈত্রী বিশ্বপ্রীতি অন্তরে অনুভব করেছি। একটি ঘরকুণো বাঙালী মেয়ের বোধের পরিধি এখানে এসে বহুদূর প্রসারিত হয়েছে, তার জীবনের বহু ঐশ্বর্য এইখানে এসে সঞ্চিত হয়েছে, এইটিই পরম লাভ।

॥ ছাত্রী-আবাসে ॥

লীড্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিয়ম আছে যে, পিতামাতার সঙ্গে যে ছাত্র বা ছাত্রী না থাকবে, তার থাকার জায়গাটি বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। ছাত্রীদের জন্য কিছু হস্টেল আছে, সেগুলি সহরের মধ্যে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেই হস্টেলে আমাকে থাকতে দেওয়া হয় নি। সহরের উপান্তে হর্সফোর্থ (Horsforth) নামে বেশ বড় একটি গ্রাম আছে। ট্রাম রাস্তার শেষ হলেও খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। সেখানে সেণ্ট ক্যাথারিন্স্ নামে রোমান ক্যাথলিকদের পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত একটি কনভেণ্ট আছে। তাতে কিছু কিছু ছাত্রীদের জায়গা দেওয়া হয়। আমিও সেইখানেই সিট পেলাম।

মস্ত বড় বাগানের মধ্যে একটু পুরানো ধাঁচের একটি পাথরের বাড়ি। আগে নাকি কোন্ জমিদারের ছিল, তিনি বিক্রী করে দিয়েছেন। বাগানে অজস্র ফুলের গাছ। স্বাভাবিক সৌন্দর্য কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। বাগানটি একটি ছোট বনের মধ্যে শেষ হয়েছে। অবশ্য বন বলতে ট্রপিক্যালের লোক যেরকম ঘন বৃক্ষরাজির কল্পনা করে, বিলেতের জঙ্গল সেরকম নয়। গাছগুলি অপেক্ষাকৃত ফাঁক ফাঁক। শীতকালে পাতা ঝরে গেলে গাছের ফাঁক দিয়ে আয়ার নদীর (The Aire) ঝিকিমিকি দেখা যায়। বনতলে বড় বড় কালো পাথরের চাঁই। খুব ঘন জঙ্গল না হলেও নিভৃত কবিত্বের পক্ষে জায়গাটি উত্তম। বাগানটিও ভারী সুন্দর। খুব যত্নে রাখাও। প্রচুর পাখি বাগানের বাসিন্দা। এত থ্রস্ল্ পাখি আছে যে, বাড়িটির নাম থ্রস্ল্স্ নেস্ট (থ্রস্ল্ পাখির বাসা)। এই পাখির নীড়ে আমরা কয়টি পাখি দিগন্ত থেকে উড়ে এসে আশ্রয় লাভ করেছিলাম।

এক শীতের ম্লান সন্ধ্যায় যখন প্রথম সেণ্ট ক্যাথারিন্সে পৌঁছালাম, সত্যি বলতে কি, ভয়কৌতূহলমিশ্রিত একটা আনন্দ বোধ হচ্ছিল। হস্টেলের কর্ত্রী মাদার রোজের হাসিমাখা মুখখানির আন্তরিক অভিনন্দন মনের সব ভয় এক মুহূর্তে দূর করে দিল। আমার মাতৃস্নেহের প্রয়োজনটা তিনি কেমন করে জানি না, বুঝে নিয়েছিলেন। আমার প্রতি বরাবরই তাঁর কৃপাদৃষ্টি একটু অধিকমাত্রায় ছিল।

প্রথম কিছুদিন আমার ঘরের সঙ্গীদের আমার ভালো লাগে নি। শাসকের জাতের প্রতি একটা আশৈশব বিতৃষ্ণাই বোধ হয় এর প্রধান কারণ। (এ বিতৃষ্ণা অবশ্য ধীরে ধীরে মাস ছয়েক পরে অনেকটা কেটে গিয়েছিল, তার কারণ, পরিচয় নিবিড় হলে অনেক ভুল ধারণা মিলিয়ে যায়।) তারপরে, মেয়েগুলি অন্ধকূপ হত্যা ইত্যাদি মিথ্যা কাহিনীতে আকণ্ঠ নিমগ্ন। সুতরাং, কথা বলতে গেলেই উভয় পক্ষেই জাতিবিদ্বেষ প্রকট হয়ে পড়ত। বোধ হয়, কালা আদমীকে তারা সহ্য করতে পারছিল না। তারপর, ওদের নির্লজ্জতাতেও অনভ্যস্ত চোখ বড় পীড়া পেত। একদিন ভোরে বাথরুম থেকে মুখহাত ধুয়ে এসে দেখি, একটি ইংরেজ মেয়ে আগুনের সামনে সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে নতজানু হয়ে বসে তার জামাকাপড়গুলো সেঁকে গরম করছে। আমি ঘরে ঢুকতে ভ্রূক্ষেপও করল না। তখন খুব অপমানিত বোধ করেছিলাম, ভেবেছিলাম, ও কি আমাকে মানুষ বলেও মনে করে না! অবশ্য পরে আমার ভুল বুঝেছি, এরা এসব নিয়ে মাথাই ঘামায় না।

যাই হোক, শীঘ্রই তারা আমার ঘর ছেড়ে চলে গেল। এর পর যে মেয়েরা এসেছে, একজন পোলিশ, দুজন ভারতীয়, একজন আইরিশ ও একজন ইংরেজ,—এরা সবাই ভালো, সুখে দুঃখে দিনগুলি এদের সঙ্গে আমার মন্দ কাটে নি। আমার ঘরে

তিনজনের জায়গা। এই পোলিশ মেয়েটি ও আমিই দীর্ঘদিন ছিলাম, অন্যরা এসেছে গিয়েছে।

থ্‌সল্‌স্‌ নেস্টের পাখিদের পরিচয় একটু দেওয়া যাক। আইরিশ মেয়েটির নাম ছিল শীলা। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। ক্রমাগত একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলত, সিঁড়ি দিয়ে টপকে টপকে হাঁটত। আমাকে বলত, ওর মাথার চুল খুব জোরে টানতে। আমিও মহানন্দে দুই হাতে প্রাণপণে ওর কেশাকর্ষণ করতাম। আর ও আনন্দে বাঃ বাঃ বলে তারিফ করত। খুব শীতেও ওকে কখনও গরম জলের ব্যাগ নিতে দেখি নি। ও খুব ভালো কেক তৈরী করতে পারত।

একটি ইংরেজ মেয়ে অল্প দিনই আমার ঘরে ছিল। তবে সে এমন অদ্ভুত ছিল যে তার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। তার নাম মেরী, ডিপ্লোমার ক্লাসে আমার সঙ্গেই সে পড়ত। তার বাবা মা হঠাৎ লণ্ডনে চলে যাওয়াতে পরীক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত তার এখানে থাকার ব্যবস্থা আমিই করে দিয়েছিলাম। মেয়েটি আমার সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গেই মিশত না। আমার সঙ্গেও কথা কমই বলত, শুধু নীরবে মোটা ঢাউস জুতো পরে প্রকাণ্ড পা ফেলে আমাকে নিয়ে বেড়াতে যেত। আমাকে তার সঙ্গ রাখতে প্রাণপণে ছুটতে হত। একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সুপ্রভাত না বলে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'আচ্ছা, চার্চিল সাহেব সম্বন্ধে তোমার কি মত?' আমি বল্লাম, 'ভোরবেলায় এইটিই কি একটা জিজ্ঞাসা করার মত কথা?' মেয়েটির হাবভাবে মেয়েলিত্ব কিছু কম ছিল বলে অন্য ইংরেজ মেয়েরা তাকে ঠাট্টা করত। মোটা ফ্রেমের চশমা, অন্যমনস্ক ভাব, চোখ নীচু করে চলা, 'ঠোঁট লাঠি' ইত্যাদি ব্যবহার না করা, নারীসুলভ মিঠে মিঠে করে কথা বলা বা হাসার কায়দা না জানা—সবই অপরের কাছে অদ্ভুত

মনে হত। আমি কিন্তু ওর সঙ্গে মিশে দেখেছি, মেয়েটি অত্যন্ত ভালো। একটি ভাই, বাবা ও মা নিয়ে ছোট সংসার। নিজেদের মনেই দিন কেটেছে, নিজের কল্পলোকেই ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ। অত্যন্ত unsophisticated. বাড়িতে আদরে মানুষ বলে ওর খাওয়া একটু বেশি। তাই অন্য মেয়েরা গা টেপাটেপি করত। অন্যমনস্ক হলেও মেরীর এটুকু নজরে পড়ত। বেচারীর সঙ্কোচের ভাব দেখে আমি রুটি কেটে ওর পাতে তুলে দিতাম। সেলাইএর পরীক্ষার জন্য একটা মস্ত বড় রাতকামিজ সে তৈরী করেছিল। যদিও সে এটির জন্য সমস্ত রাত জেগে খেটে ছিল, তবু এত কদর্য সেলাই যে কোনও মেয়েমানুষের হাত দিয়ে বার হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। পরীক্ষা কাছে আসা সত্ত্বেও সে কিছুই পড়ত না, বলত, 'আমি কিছুতেই পাশ করতে পারব না। এসব আমার ভালো লাগে না। তবে ড্যাডি বলেছে, ফেল করলে একটুও বকবে না।' পরীক্ষার আগের দিন সারা রাত জেগে 'জেন আয়ার' পড়ল এবং ভোরবেলা গড়গড় করে পাতার পর পাতা মুখস্থ বলতে লাগল। আমরা তো ওর কাণ্ড দেখে হাঁ!

পোলিশ মেয়েটির নাম স্তেনিয়া। ও ডাক্তারী পড়ত। ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের বাঁধন আজও অটুট আছে। খুব গুছানো গিন্নী প্যাটার্ণের মেয়ে। ঘর-দোর নোংরা করা ও দুচক্ষে দেখতে পারত না। ওর এপ্রণ পরা সিগারেট-ধরা ঝাঁটাবিহারিণী মূর্তিটি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরতে দেরী হলে দেখতাম, আমার সব কিছু ঝাড়ামোছা, বিছানা নতুন করে করা, এমন কি, ছাড়া জুতোটি পর্যন্ত কাদা তুলে কালি লাগিয়ে পরিষ্কার করা। আমি বুঝতে পেরেও চেঁচাতাম, 'কে এসব করেছে' বলে, আর স্তেনিয়া এসে একটা রুলার দিয়ে আমাকে দমাদম পিটতে শুরু করত। অবসর সময়ে

আমাকে ও পোলিশ এম্‌ব্রয়ডারি শেখাত, আর আমি ওকে আমাদের পুরাণ, রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলতাম। ওর প্রিয় গল্প ছিল, সাবিত্রী সত্যবান, শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব। পোল্যাণ্ড থেকে বহু দুঃখ পেয়ে ওদের পরিবার যুদ্ধের সময়ে ইংল্যাণ্ডে রাজনৈতিক উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে, পারিবারিক বাঁধুনিটা ওদের খুব শক্ত ছিল। আমার মনে হয়, দুঃখই এখানে সিমেণ্টের কাজ করেছে। অনেক ব্যথা সত্ত্বেও মেয়েটির মুখে হাসি লেগেই থাকত। আমাদের ঘরের নাম দিয়েছিলাম পাগ্‌লীস্তান। এই পাগ্‌লীস্তানের অন্যতম প্রধান পাগ্‌লী ছিল ও। আমাদের নানাবিধ মুখভঙ্গী করার প্রতিযোগিতায় ওই সাধারণতঃ প্রথম হত, ওর ছত্রিশ রকমের জানা ছিল। তাছাড়া বাঁদর নাচ ছিল ওর প্রিয় নাচ। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ঘরে এক আধটা মথ ঢুকে পড়লেও ওর উদ্দাম নৃত্যটা দেখবার মতো হত। পোকা ঢুকত বলে সে সময়ে রাতে আলো নিবোবার পর ও জানালা খুলত। একদিন রাতে অন্ধকারে জানালা খুলে তার উপরে চড়ে পর্দা ঠিক করাতে আমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছি, 'জানালা দিয়ে গলে যেওনা!'—তার পরে আধ ঘণ্টা ধরে সবাই মিলে কী হাসি! স্তেনিয়া খুব ভালো রাঁধতে পারত। আমাকে না জানিয়ে লুকিয়ে রান্না করে এনে খাওয়াত। আমার উপরে ডাক্তারী বিদ্যা পরখ করার খুবই চেষ্টা করত মাঝে মাঝে।

একবার বড় মজা হয়েছে। কোথা থেকে সে একটা ফুটদেড়েক লম্বা মোটা লাঠি নিয়ে এসেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করাতে বল্ল, 'এটা একটা সসেজ।' এরকম সসেজ কখনও দেখি নি, খুবই শক্ত। সেইদিনই সে একটা বিশেষ কাজে লণ্ডনে গেল। তাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে দেখি, যাঃ! তার সাধের সসেজ ফেলে গেছে। আবার এক বন্ধুকে নিয়ে পোস্ট অফিসে ছুটে গিয়ে রেজেষ্ট্রী ডাকে সেটা পাঠিয়ে দিলাম, বেচারী নিশ্চয়

লণ্ডনে খাবার জন্য ঐ সসেজটা জোগাড় করেছিল। দিন তিনেক পরে স্তেনিয়া ফিরে এসে সসেজটা হাতে নিয়ে তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাগল। বল্ল, হোটেলে হঠাৎ ওর নামে রেজেস্ট্রী পার্শেল এসেছে শুনে খুলে দেখে সসেজটা! ভেবেছিল, আমরা বুঝি ঠাট্টা করে পাঠিয়েছি। যাই হোক্, ঐ বিদ্‌ঘুটে পদার্থটা ও মাঝে মাঝে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খেত। আমাকে অনেকবার খেতে সেধেছিল, কিন্তু আমি খাইনি। স্তেনিয়া এখন ইংল্যাণ্ডের একটি বড় হাঁসপাতালের ডাক্তার হয়েছে।

বিদ্যাবতী নামে একটি বিহারী ছাত্রী গভর্ণমেন্টের স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে এসেছিল। আমার আর স্তেনিয়ার মধ্যে ঝগড়া হলে (যেটা প্রায়ই হত) ও গম্ভীরমুখে বিচারক হত। অবশ্য, স্তেনিয়া একদিন ওর চুল কুঁকড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল বলে বিচারকের পক্ষপাতিত্বের প্রতি আমি প্রায়ই কটাক্ষ করতাম। বিদ্যাও খুব ভালো রাঁধতে পারত, আমাকে অনেক খাইয়েছে। বিদ্যা এখন বিহারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিতা।

হস্টেলে অন্যান্য ঘরে আরো অনেক মেয়ে ছিল। কিছুদিন এক ফরাসী প্রৌঢ়া মহিলা হংস মধ্যে বকের মতো খানিকটা অশান্তির সৃষ্টি করেছিলেন। যে সময়ে মেয়েরা পড়ত, তখন তিনি ফরাসী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইতেন, আর ভোররাত্রে যখন মেয়েরা ঘুমোত, তখন তিনি উঠে খুব আড়ম্বর-সহকারে ঘরের বেসিনে মুখ ধুতেন। ভদ্রমহিলা আমাকে জন্মদিনে বড় বড় লাল টিউলিপ দিয়েছিলেন।

আমাদের দুজন জীন ছিল। একজন অত্যন্ত serious ধরনের মেয়ে। বোধহয়, আমাদের বাড়িতে অত গুরুগম্ভীর প্রকৃতির আর কেউ ছিল না। সে বি. এস্‌-সি পড়ত, ভূগোল ও জীববিদ্যা নিয়ে। ভূগোলে অনার্স, তবে দুটোই খুব মন দিয়ে পড়ত। আশ্চর্য শান্তস্বভাবের মেয়ে। কোনদিন প্রসাধন

করতে দেখি নি। সব কিছুই অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখত। আমার মাথার খুলিটার ওপরে ওর লোভ ছিল। প্রায়ই নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করত, তার আকৃতিটা নাকি ওর পছন্দ হত। আমাকে ও ভালোই বাসত। প্রায়ই ওদের বাড়িতে যাবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানাত। ওর এক দিদি শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তাঁর স্কুল দেখতে যাবার সৌভাগ্য একবার হয়েছিল। শান্ত হলেও ও অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ ছিল। তবে, আবেগগুলি এমন নিঃশব্দে বহন করত যে, যারা খুব অন্তরঙ্গভাবে মেশে নি, তারা কেউ টের পায় নি।

অন্য জীন ছিল স্কুলের ছাত্রী। অত্যন্ত প্রাণময়ী। উচ্চ হাসিতে বাড়ি কাঁপিয়ে চলাফেরা করত। এ খুবই রন্ধনপটীয়সী ছিল, প্রায়ই সিস্টারদের রান্নাতে সাহায্য করত। একজন সদ্য স্কুল থেকে পাশ করা মেয়ে ছিল, জুডি। খুব ভাবুক। একটি প্রকৃত শিল্পীমন তার মধ্যে দেখেছিলাম। সে খুব ভালো ছবি আঁকত। তার আঁকা ছবি আমরা ঘরে টাঙিয়ে রাখতাম।

মার্সিডিজ নামে একটি ইঙ্গো-স্প্যানিশ মেয়ের সঙ্গেও আমাদের খুব ভাব হয়েছিল। এর বাবা দাক্ষিণাত্যের লোক, স্পেনে বসবাস করতেন। একে বলা হত Pagliest, অর্থাৎ পাগ্‌লীতম। এর মাথায় যে কতরকম ফন্দী ঘুরত তা বলার নয়। এর বাবার মস্ত বড় কারবার এই চালাতো, কারণ এর দাদা সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সম্পর্কেই পড়াশুনা করার জন্য এ এসেছিল। কিন্তু হাসিতে গল্পে গানে নাচে এ যেন একটি ছোট মেয়ে ছিল। প্রায়ই এ আমার শাড়ী পরে ঘুরত। সখ চাপাতে কিছুদিন বিদ্যার কাছে হিন্দী শিখে সিস্টারদের দেখলেই বলত, 'তুম্ পাপী হো।' আমার ঘরে ঢুকে এক একদিন মার্সিডিজ মেঝের উপরে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ত। আমি ওর পেটের উপরে কাগজ ফেলা ঝুড়িটা চাপিয়ে দিতাম, সেটা হাসির চোটে নড়ত।

শেষ পর্যন্ত আমরা ওকে চ্যাংদোলা করার উপক্রম করলে তখন মেঝে ছেড়ে উঠত। মাঝে মাঝে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ে রেলিংএর হাতল বেয়ে নামতে ও ভালোবাসত। একদিন আবার দেখি, সিঁড়িতে উঠবার সময়ে বলছে, 'আমাকে উঠিয়ে দাও।' তখন স্তেনিয়া ওর এক একটা করে পা ধরে ধরে এক একটা ধাপে তুলে দিল। এই ভাবে সে তেতলা পর্যন্ত উঠল। একদিন সকলের খাওয়া হয়ে গেলে রান্নাঘর থেকে একটা মস্ত বড় পাঁজরের হাড় (খুব সম্ভব গরুর) এনে দুহাতে ধরে কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল। আমার একটা বই ছিল, To whom Do Schools Belong ? এই নামটা ওর কাছে বড় কৌতুকের উদ্রেক করত। একদিন ওর বিভাগের একজন বয়স্ক গম্ভীর প্রকৃতির মাদ্রাজী ভদ্রলোককে গিয়ে আমার নাম করে বলেছে, 'ওর সাথে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করবেন তো, To whom Do Schools Belong ?' ভদ্রলোক আমাকে বল্লেন, 'ব্যাপার কি ?' আমি তো অপ্রস্তুত! মার্সিডিজ আমাকে এখনও ভোলে নাই।

দুজন মার্গারেট ছিল আমাদের। তার মধ্যে একজন আমাকে খুব ভালোবাসত। পাখির ছবি আমার পছন্দ বলে আমাকে পিটার স্কটের আঁকা পাখির ছবি উপহার দিত। অত্যন্ত সৎপ্রকৃতির মেয়ে।

যারা আমার স্বজনবিচ্ছেদের দুঃখ ভুলিয়েছে, যারা আমার প্রবাসমুহূর্তগুলি হাসিতে গানে গল্পে আনন্দে ভরে দিয়েছে, তাদের ঋণ-স্বীকার জন্যই বান্ধবীদের কথা এইটুকু বল্লাম।

আমরা সবাই পরস্পরকে বিপদে আপদে সাহায্য করতাম কারো বাড়ি থেকে কখনও খাবার এলে সবাই ভাগ করে খেতাম। আমাদের শাড়ী ওরা প্রায়ই পরত। আমাদের আচার দেখে নাক সিঁটকাত। আমরা অবশ্য তাতে গ্রাহ্যই করতাম না। কয়েকটি শব্দ ওদের শিখিয়েছিলাম, যথা, পাগ্‌লী, বাপ্‌রে বাপ্‌,

বাপ্ বাপ্ বাপ্‌রে বাপ্, what is this? চিংড়ি fish—ইত্যাদি। কাপড় কাচার দিনে সকলে মিলে হৈ হৈ করতে করতে কাপড় কাচতাম ও ইস্ত্রি করতাম।

আমার ঘরটা ছিল একটি আড্ডাখানা। নানাবিধ তর্কের মধ্যে ধর্মসম্বন্ধীয় তর্কটা খুব হত। খ্রীষ্টধর্মের নানাবিভাগের মেয়ে ছিল, সিস্টাররাও মাঝে মাঝে যোগ দিতেন। এছাড়া নিছক আমোদ প্রমোদ, নাচগান হল্লাও খুবই হত। প্রাণখোলা হাসিতে বাড়ি গম্‌গম্ করত। আমরা যেখানে যা শিখে আসতাম, সব বিদ্যা বন্ধুদের না দেখিয়ে তৃপ্ত হতাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের একজন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি চুল দাড়ি কাটতেন না, আঁচড়াতেনও না। স্নান করার নিদর্শনও কিছু পাই নি। অত্যন্ত উদাসীন ভাবে কি সব বলতে বলতে মাথা নাড়তে নাড়তে পথ চলতেন। মার্গারেট তাঁকে খুব ভালো নকল করত। আমার Speech Training এর ক্লাসে শিখে আসা মহিষ নৃত্য এরা খুবই উপভোগ করত, স্তেনিয়ার বাঁদর সেজে উকুনবাছার নৃত্য তো বটেই। বলা বাহুল্য, আমার চকোলেট লজেন্সের খরচটাও একটু বেশিই হত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বল নাচ থাকলে আমাদের আস্তানায় খুব সাড়া পড়ে যেত। যারা নিমন্ত্রণে যাবে তারা বিকেল থেকে সাজতে আরম্ভ করত। আমরা,—যারা যেতাম না,—তাদের সাজতে সাহায্য করতাম। প্রথম পর্ব ছিল উত্তমরূপে স্নান। সপ্তাহে দুদিন করে প্রত্যেকের স্নানের পালা পড়ত। যে যাবে তার যদি ঐদিন স্নানের পালা না থাকত, তবে, যে যাবে না অথচ ঐদিন স্নান করবে,—এমন মেয়ের সঙ্গে পালাটা বদলিয়ে নিত। তারপর কত রকমের প্রসাধন। হাতের নখের পাশের পাতলা চামড়া একটা যন্ত্র দিয়ে ভিতরে গুটিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। এর অর্থটা কিন্তু আজও আমি খুঁজে পাই নি। মাথার

চুল নানা ভাবে বাহার করে কুঞ্চিত করা হত। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পালিশ করে যার যা ভালো জামাটামা আছে পরে সব তৈরী থাকত। তারপর রাত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা (যার যার ছেলে বন্ধু) আসত ট্যাক্সি নিয়ে। গভীর রাত্রে নাচ সেরে পা টিপে টিপে মেয়েরা ঘরে ঢুকত, পাছে আমাদের ঘুম ভাঙে। আমরা কিন্তু সর্বদাই টের পেতাম। তারপর কিছুদিন পর্যন্ত সেই বলনাচ ও পার্টির গল্পে সেণ্ট ক্যাথারিন্স্ মুখর থাকত।

আগেই বলেছি, আমাদের হস্টেলে অনেক ভালো রাঁধিয়ে ছিল। সুতরাং বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে রান্না করে খাওয়ানো প্রায়ই হত। ভারতীয় রান্না করতে হলে একটু নিভৃতে করতে হত, নয়ত ওরা ফোড়ন দেবার সময়ে বলত, 'রান্নাঘরে কাঁদুনে গ্যাস ছেড়েছে!' একবার আমার জন্মদিনে বিকেলের দিকে আমার ঘরে আগুনের কাছে কার্পেটের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। সন্ধ্যাবেলায় জেগে দেখি, মাথার কাছে থালায় মস্ত বড় একটা কেক, একটা যিশুখ্রীষ্টের সুন্দর ছবি, তাতে সিস্টারদের জন্মদিনের শুভকামনা লেখা। রাতে দেখি স্তেনিয়া ও বিদ্যা কখন গোপনে ভাত, আলু-কপির ডালনা, টমেটোর চাটনি রান্না করে উপরে এনেছে। আমাদের ঘরে বাতাবি লেবুও ছিল। এই সব দিয়ে আমাদের খাসা ভোজ হল। আমি যে ইস্কুলে পড়াতাম সেখানকার গার্হস্থ্য বিদ্যার ক্লাসে একদিন চেল্‌সি বান্‌ নামে একরকম মিষ্টি রুটি তৈরী করা শিখে এলাম। আমার শখ হল, ঐ রুটি তৈরী করে হস্টেলের মেয়েদের খাওয়াব। মাদারকে বলা মাত্র রান্নাঘরে উৎসাহের সাড়া পড়ে গেল। সব জিনিস তিনি আনিয়ে দিলেন। সারা হস্টেল তো লাফাচ্ছে! আমি রাঁধছি, এটা একটা অষ্টম আশ্চর্য তাদের কাছে। খুব মন দিয়ে বান্‌ তৈরী করলাম। ছোট

ছোট ইঁটের টুকরোর মতো হল। কোনমতে কামড়ানো যায় অবশ্য, কিন্তু ছুঁড়ে ব্যথা দেওয়াও যায়। মেয়েরা তাই সোনামুখ করে খেল, আর বল্ল, 'ও যখন এই একটা রান্নাই জানে, তখন ওর সংসার হলে প্রাতরাশেও চেল্‌সি বান্‌, লাঞ্চেও চেল্‌সি বান্‌, আবার ডিনারেও চেল্‌সি বান্‌,—সব খাদ্যতালিকাতেই এই একটাই খাবার থাকবে।' চেল্‌সি বানের গল্প বহুদিন চলেছিল।

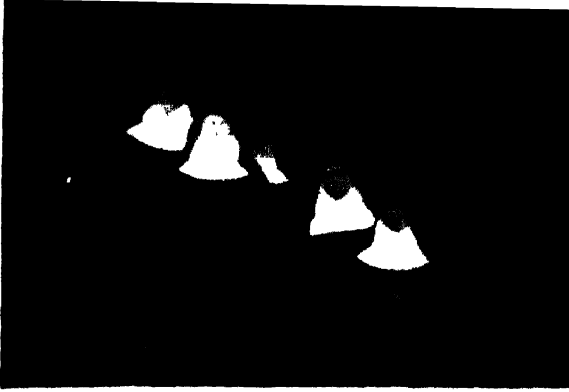
এক বিকেলে আমার একটি ছাত্রীকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। চা খাওয়া হলে দুজনে বাগানে বেড়াতে বের হলাম। উঁচু বন্য চেরিগাছে তখন ফল এসেছে। সিস্টাররা বাড়ি ছিলেন না। আমাদের মাথায় বুদ্ধি এল, ফল পাড়তে হবে। একটা বিজলী তার লাগাবার মই ছিল, গুরু শিষ্যা মিলে সেটাকে টেনে গাছতলায় রাখলাম। আমি সেটা চেপে ধরলাম, মেয়েটি বেয়ে বেয়ে উঠল। চেরি পাড়া হল। অভিযান যখন প্রায় শেষ, তখন সিস্টাররা বেড়িয়ে ফিরছেন। সঙ্গে এক বুড়ো ফাদার। ব্যাপার দেখে সব চেঁচিয়ে উঠেছেন। ফাদার বল্লেন, 'বুনো চেরি খেওনা, পেট কামড়াবে।' আমার একটু একটু ভয় করছিল। ছাত্রী সাহস দিল, 'কিচ্ছু হবে না,—আমি কত খেয়েছি!' পেট কামড়ায় নি কিন্তু।

সিস্টাররা অধিকাংশই বেশ প্রাণোচ্ছল ছিলেন। তাঁদের এই যৌবনে যোগিনী সাজা দেখে আমার মনে কষ্ট হত। রোজ তাঁরা আমার ঘরে আসতেন, আমার বিছানায় খ্রীষ্টধর্মের উপদেশ-মূলক ছোট ছোট বই রেখে দিতেন, নানাভাবে ধর্মমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করতেন। একটি ছোট চ্যাপেল ছিল আমাদের ঘরের কাছে, সেখানে মাঝে মাঝে ঢুকে দেখতাম, ভালোই লাগত। খ্রীষ্টের বেদীর জন্য একবার একটি রেশমের টুকরোর উপরে কৃষ্ণচূড়া পুষ্পগুচ্ছের অলঙ্করণ দিয়ে একটি ক্রশ এঁকে দিয়েছিলাম। একজন সিস্টার কিছু রুক্ষ প্রকৃতির ছিলেন, অন্য সকলেই খুব

ভালো। মাদার রোজ আমার ফুলদানিতে রোজ ফুল দিতেন, আমাকে সর্বদা খুব যত্ন করতেন। আমাদের পরীক্ষার সময়ে সিস্টাররা রান্নাঘরের দেয়ালে কার কবে পরীক্ষা লিখে টাঙিয়ে রাখতেন এবং সেই দেখে দেখে বিশেষ প্রার্থনা করতেন।

এক সিস্টার প্রায়ই আমার সঙ্গে নানারকম মজা করতেন। একদিন তিনি বল্লেন, 'আহা, তুমি ক্লান্ত, এস, তোমার বিছানাটা আমি করে দিই।' শুতে গিয়ে দেখি চাদরগুলি এমনভাবে রাখা যে, বিছানায় ঢোকা যাচ্ছে না। একটা চাদর তুলে ফেলে ঘুমোলাম। সকাল বেলায় তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, 'কেমন ঘুমালে?' 'ভালো।' 'ওটা French Bed বানিয়েছিলাম।' হাসি চেপে বল্লাম, 'English bed যে নয় সেটা বুঝতে পেরেছি।' 'Apple pie bed ওটা।' বল্লাম, 'ওই apple pie বিছানাতেই আমি এগার ঘণ্টা ঘুমিয়েছি, অনেক ধন্যবাদ।'

আর একদিন দেখি আমার বিছানায় জামা পরানো লেজ-ওয়ালা একটা খেলার ভেড়ার বাচ্চা শোয়ানো রয়েছে। আমি তার কানে একটা সেফটিপিন দিয়ে দেয়ালের পেরেকে তাকে ঝুলিয়ে রাখলাম। খানিকপরে সিস্টার আমার ঘরে এসে বিছানায় খুঁজে পুতুলটা পেলেন না। তখন আমি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লাম, 'হতভাগা আমার বিছানায় ঢুকেছিল বলে শাস্তি দিয়েছি।' তখন একটা টুলের উপরে চড়ে কোনমতে সেটাকে উদ্ধার করে দে ছুট্। আমি বল্লাম আমাকে দিতে, কিছুতে দিলেন না। পরদিন একটা পার্শেল এল আমার নামে। আমি দেখি, টিকিট ব্যবহৃত, উঠিয়ে লাগানো। বুঝলাম, একটা কারসাজি। খুলে দেখি সেই Teddy lamb ও একটা প্রকাণ্ড আলু! আমি লুকিয়ে রেখে দিলাম। মাদার ভালমানুষ, হাতে করে পার্শেলটা এনেছিলেন, তিনি অপ্রস্তুত। বল্লেন, 'আমি গিয়ে বকব।' আমি বল্লাম 'বকবেন কেন? আমি ত মনে করি একটা ভীষণ মজা।



সেন্ট ক্যাথারিন্সের
সিস্টারেরা



সেণ্ট ক্যাথারিন্সের বাগানে

সেণ্ট ক্যাথারিন্সের



জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েরা অভিনয় করছে

লণ্ডনের ছাদের উপর বাগান



হল।' তারপর সিস্টারকে প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দিলাম। তখন সিস্টার বলেন, 'ভেড়াটা আমায় দাও, আমি আর কাউকে পার্শেল পাঠাব।' আমি বল্লাম, 'না আমি ভারতবর্ষে ওটা আপনার ভালোবাসার চিহ্ন স্বরূপ পার্শেল পাঠাব।' আমি ভেড়াটা এমন ভাবে রেখে দিলাম, অনেক খুঁজেও তিনি সেটা পান্ নি। যেদিন ভাত রাঁধলাম সেদিন আলুটা রেঁধে খেলাম, বল্লাম, 'দেখুন, আপনার উপহার কি সুন্দর, এমন আরও দেবেন, খুশি হব।'

বিভিন্ন ঋতু এসে সেণ্ট ক্যাথারিন্সে সোনার কাঠি রূপার কাঠি ছুঁইয়ে যেত। হেমন্ত কালটা আমার বাইরেই কেটেছে, সুতরাং সেণ্ট্ ক্যাথারিন্সে তার রূপটি আমি প্রত্যক্ষ করতে পারি নাই। বর্ষা বিলেতে লেগেই আছে। আলোঝলোমলো প্রভাতের খুশি খুশি মুখটি দেখতে পাওয়া দুর্লভ ভাগ্যের লক্ষণ। সেই জন্যেই বোধহয় মেঘঢাকা ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টিপড়া হাঁড়িমুখো সকালে এত Good morning করার ঘটা! বর্ষার প্রতি আমার মনে চিরকাল একটি গভীর অনুরক্তি আছে। দেশে প্রাণজ্বলানো গ্রীষ্মের পরে মৌসুমী মেঘ যখন জানালার প্রান্তে তার সব স্নিগ্ধতা সব মুগ্ধতা নিয়ে দাঁড়াত, তখন কলকাতার মতো নোংরা অকাব্যিক সহরকেও স্বপ্নপুরী মনে হত। বস্তুতঃ, বর্ষা ঋতুই কলকাতার মতো সহরে একমাত্র উপভোগ্য ঋতু, কারণ এর আকাশের সৌন্দর্য অসীম। ধরণীর সৌন্দর্য তো পিচ বাঁধানো রাস্তায় বিশেষ দেখার সৌভাগ্য হয় নি। তাই বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয় মেঘ আমার কাছে উৎসবের দূত হয়ে আসত। প্রতি বছর পয়লা আষাঢ় আমি বর্ষামঙ্গল উৎসব পালন করতাম। বিলেতে দুদিন দেখেছিলাম, সেই রকম গুমোটের পর মেঘ ডেকে বিদ্যুত হেঁকে পুরোদস্তুর ট্রপিক্যাল বর্ষা। তার মধ্যে একদিন তো বাড়ির কাছে রাস্তাতে জলই জমে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে দেখি

একটি ষণ্ডামার্কা লোক কুসুমকোমলাঙ্গী তরুণীদের কোলে করে জলটুকু পার করে দিচ্ছে। জলরাশির উভয় দিকেই বেশ লোক জমে আছে। আমাকে ট্রাম থেকে নামতে দেখেই তাড়াতাড়ি পারকর্তা ছুটে এসেছে। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বল্লাম, 'সাহায্যের দরকার নাই, নিজেই পারব।' পায়ে ছিল শান্তিনিকেতনের চটি, খুলে সাবধানে জল পার হলাম। প্রায় হাঁটু পর্যন্ত জল। সবাই রুদ্ধনিঃশ্বাসে চক্ষু বিস্ফারিত করে রইল, পেরিয়ে গেলে চীৎকার করতে লাগল, 'Brave girl, brave girl (সাহসী মেয়ে, সাহসী মেয়ে)।' মনে মনে বল্লাম, 'ঠন্‌ঠনে কালীতলা তো দেখ নি!' যাক্, বাড়ি এসে শুনি মার্গারেট ঐ লোকটির ঘাড়ে চড়ে পার হয়েছে। আমি পা ভিজিয়ে এসেছি শুনে ইংরেজ মেয়েরা তো অবাক্। এই দুদিন ছাড়া বিলেতের বর্ষা কোনওদিন আমার কবিমনের কাছে কোনও আবেদন জানাতে সমর্থ হয় নি। মাসের পর মাস ছিঁচ্‌কাঁদুনে বৃষ্টি, মনে হয়, আকাশের চোখে ছানি পড়েছে।

তবে, বরফ পড়তে আরম্ভ হলে খুব রোমাঞ্চ বোধ হত। প্রথম যখন বরফ পড়ত, আমরা হাত বাড়িয়ে ধরে চেটে চেটে খেতাম। হঠাৎ একরাশ সাদা পালকের বৃষ্টি হলে যেমন দেখতে হয় ঠিক তেম্‌নি। অনেকদিন আগে দেখেছিলাম, একটা চিল একটা ধব্‌ধবে পায়রাকে ধরে ছাতের কার্ণিসে বসে খাচ্ছিল। সেই পায়রার ছোটবড় পালকে সেখানকার আকাশ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। বরফ পড়া দেখে সেই কথাটাই মনে হয়। নিষ্পত্র গাছগুলির আঁকাবাঁকা ডালপালায়, ঢালু বাড়ির ছাতে বরফের স্তূপ দেখতে খুব সুন্দর দেখায়। তখন রবিন পাখি ছাড়া অন্য কোনও পাখি বড় একটা আসে না, অবশ্য থ্রস্‌ল্ পাখিকেও মাঝে মাঝে খিদের জ্বালায় বের হতে দেখেছি। বাইরে ঘনায়মান অন্ধকারে ঝুর্‌ঝুর্ করে বরফ পড়ছে, গাছপালাগুলি যেন

যাদুবলে নানারকম মূর্তি ধারণ করছে, গৃহকোণে উষ্ণ অগ্নিকুণ্ডের কাছে ঘেঁষে বইপড়া আর চকোলেট খাওয়া যে কী আরামের!

বরফ যখন প্রথম গলতে আরম্ভ করত, তখন সেণ্ট ক্যাথারিন্সের বাগানে গলা বরফের ফাঁক দিয়ে মাথা তুলত স্নোড্রপ ফুল। ছোট্ট গাছে ছোট্ট ছোট্ট সাদা সাদা ফুলগুলি, তুষারবিন্দু নাম ওর ঠিকই হয়েছে। বসন্তের আগমনী এই ফুলটিই ঘোষণা করত। তারপর ধীরে ধীরে দেখা দিত ড্যাফোডিল, ক্রোকাস্, নার্সিসাস্ ইত্যাদি। গাছ নতুন পাতায় ঝল্‌মল্ করত। সমস্ত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালটা সেণ্ট ক্যাথারিন্স ছিল স্বর্গ। প্রায়ই রোদ উঠত। আমরা ডেকচেয়ার নিয়ে বাইরে বসতাম। রডোডেনড্রন গাছের শাখায় শাখায় গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল আসত। তলায় শুকনো ফুলের রাশি। মস্ত বড় হর্সচেস্টনাট গাছের তলাটা গোলাপী ফুলে ভরে যেত। আপেল ও পীচ গাছেব ফুলও খুব বাহারে। যেসব মরশুমী ফুল আমাদের দেশে শীতকালে ফোটে, সে সব ওখানে ফোটে গ্রীষ্মকালে, কারণ আবহাওয়া প্রায় সেই রকমই হয় তখন। ফক্‌স্‌গ্লাভ, লুপিন, লার্ক্‌স্পার প্রভৃতি কত মরশুমী ফুলই ফুটত। সেণ্ট ক্যাথারিন্সের পাশের বনতল অজস্র ব্লুবেলে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত, মনে হত, কে যেন ময়ূরকণ্ঠী রংএর কুয়াশার একটি চাদর বিছিয়ে রেখেছে। তারি ফাঁকে ফাঁকে ফুটত নার্সিসাস, ড্যাফোডিল, বুনো এনিমোন, ভায়োলেট। মাঠ দিয়ে চলার সময়ে হঠাৎ বাতাসে মৃদু সুগন্ধ পেয়ে আবিষ্কার করেছিলাম পাতার আড়ালে লুকিয়ে ফোটা লিলি অব ভ্যালিকে। বাগানে লাইলাকের সারি আমাকে স্বপ্নাবিষ্ট করে রাখত। এছাড়া ছিল বহুবিধ গোলাপের বেড। ডেজি ফুল আর বুনো চেরি ফুলে চমৎকার শিরোভূষণ তৈরী করত একটি মারাঠী মেয়ে। ফুল ফুটতে আরম্ভ করলে বৃষ্টি না থাকলেই আমি সময় পেলে বাগানে

এসে বসে থাকতাম। নীল আকাশে গলানো সোনা, তার সঙ্গে মিশে যেত নাইটিংগেল ও বউকথা কও (cuckoo) পাখির অবিশ্রান্ত গানের ধারা। কখনও বই পড়তাম, কখনও আপন মনে হাঁটতাম, কখনও বা চুপ করে বসে থাকতাম। মন আশ্চর্য প্রশান্তিতে ভরে উঠত। উত্তর জীবনে বহু ঝঞ্ঝাট ও অশান্তির মধ্যে এই শান্তরসপ্রধান দিনগুলির কথা আমার বারংবার মনে পড়েছে।

॥ ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা সম্বন্ধে দুচার কথা ॥

কি করে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হয় সেই সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতেই ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম। এ বিষয়ে তাত্ত্বিক পড়াশুনা ছাড়াও হাতে কলমে কাজ অনেক করতে হয়েছে। এই হাতে কলমে কাজের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব।

আমরা নানাবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখতে যেতাম। এছাড়া বিদ্যালয়ে পড়ানোও একটা বিশেষ কাজ ছিল। আমাকে আবার কিছুদিন একটি স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের (Local Education Authority) সঙ্গে কাজ করতেও হয়েছিল। এই ত্রিবিধ অভিজ্ঞতার কথাই কিছু কিছু বিবৃত করব।

বিদ্যালয় দেখা—প্রাথমিক, মাধ্যমিক, শিশু-বিদ্যালয়, পাবলিক স্কুল, মুক্ত বাতাসে প্রতিষ্ঠিত স্কুল, বিকৃত শিশুদের জন্য স্কুল প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানই দেখেছি। বিকৃত শিশুদের জন্য স্কুল বলতে জড়বুদ্ধিদের জন্য, বিকলাঙ্গ, অন্ধ ও কালা বোবাদের জন্য বিদ্যালয়ের কথা বলছি।

জড়বুদ্ধি শিশুদের প্রতিষ্ঠানটিই আমাকে সর্বাপেক্ষা অভিভূত করেছে। যে দেশে সুস্থ ও স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষেরই সর্বপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় নি, সে দেশে জড়বুদ্ধিদের শিক্ষার ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে একটি বড় সমস্যা বলে প্রতিভাত না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ বিষয়ের অবতারণার সার্থকতা আছে বলে মনে করি। কারণ, আশা আছে, ভারতবর্ষ একদিন জগৎসভায় মাথা তুলে বলতে পারবে যে, আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে আমরা সমর্থ হয়েছি। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে সমাজের প্রত্যেক মানুষের মূল্য এবং অনন্য-নির্ভরতা সম্বন্ধে অবহিত

হওয়ার প্রশ্ন আপনি এসে পড়ে। অপরাধপ্রবণ, বিকৃত-মস্তিষ্ক বা জড়বুদ্ধি লোকও সমাজের একটা অঙ্গ। হতে পারে, সে অঙ্গ দুষ্ট, অকর্মণ্য,—কিন্তু তারও সম্যক্ শুশ্রূষা চাই, তাকেও কর্মক্ষম করে তোলবার চেষ্টার প্রয়োজন। অতএব অন্যান্য স্বাধীন দেশে এদের সম্বন্ধে কি রকম ব্যবস্থা করা হয়, সেটা জানার সার্থকতা আছে, কারণ সে পথ অনুসরণ করে আমরা লাভবান হতে পারি।

বুদ্ধির স্বল্পতা নানা কারণে হতে পারে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগে, অথবা ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে অথবা তার পরে মস্তিষ্কে কোনও কারণে আঘাত লাগলে জড়বুদ্ধি হবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। শিশুকালে 'মেনেঞ্জাইটিস্' রোগ হলে অথবা কোন কারণে 'থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড'এর রসক্ষরণের স্বল্পতা হলেও লোকে জড়বুদ্ধি হয়। অনেক সময়ে আবার এরকম কোনও প্রত্যক্ষ কারণ দেখাও যায় না। সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত না হলেও, চিকিৎসকরা বহুক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন যে, পিতামাতার মদ্যপায়িতা, সিফিলিস্ রোগ, জড়বুদ্ধিতা, মৃগী অথবা উন্মাদ রোগ থাকলে সন্তানের জড়বুদ্ধি হবার দিকে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হয়।

মনস্তত্ত্ববিদরা বুদ্ধির তারতম্য নিয়ে বহুপ্রকার গবেষণা করেছেন এবং করছেন। ফরাসী পণ্ডিত বিনে ও সাইমনের বুদ্ধির মাননির্ণয় সম্পর্কে পরীক্ষার কথা অনেকেই জানেন। ইংল্যাণ্ডের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক সিরিল বার্ট (Prof. Cyril Burt)-এর মতে যাদের বুদ্ধির মান শতকরা ৭০ থেকে ৮৫, তারা স্থূলবুদ্ধির (dull) পর্যায়ে পড়ে, এবং এই মান যাদের ৭০-এর নীচে, তারা জড়বুদ্ধির গোষ্ঠীতে পড়ে। এদের মধ্যে আবার শিক্ষার দিক দিয়ে অপরিণত-বুদ্ধি (educationally sub-normal), এদের বুদ্ধির মান ৫০—৭০, ক্ষীণ-বুদ্ধি (imbecile) এবং স্বভাব-মূঢ় (idiot,) এদের বুদ্ধির মান ৫০-এর নীচে—প্রভৃতি নানা রকম স্তরভেদ আছে।

জড়বুদ্ধি শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে একটি বিশেষ শিক্ষা-আইন প্রবর্তিত হয়। তাতে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপর নিজ নিজ এলাকার জড়বুদ্ধি শিশুদের সংখ্যা নির্ধারণ করে তাদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় খোলার ভার দেওয়া হয়। তারপর ১৯১৩ এবং ১৯২৭ সালে দুটি 'Mental Dificiency' আইন প্রবর্তন করা হয়। এই আইন দুটিতে শিক্ষা ছাড়া জড়বুদ্ধিদের অন্যান্য প্রয়োজনগুলিও বিবেচিত হয়েছে। ১৯৪৪ সালের বিখ্যাত শিক্ষা আইনেও জড়বুদ্ধিদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ভালোভাবে আলোচিত হয়েছে।

লীডস্ সহরের একটি জড়বুদ্ধিদের শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করার সুযোগ আমার হয়েছিল। এই সহরের চারদিকে চারটি এরকম শিক্ষাকেন্দ্র আছে। আমি কয়েকটি সহপাঠীর সঙ্গে পূর্বদিকে অবস্থিত কেন্দ্রটি দেখতে গিয়েছিলাম। এই কেন্দ্রগুলি ঠিক সাধারণ বিদ্যালয়ের পর্যায়ে পড়ে না বলে এগুলিকে বলা হয় 'কর্মকেন্দ্র'। আমি যে কেন্দ্রটি দেখেছিলাম, তার নাম 'পূর্ব লীডস্ কর্মকেন্দ্র' (East Leeds Occupation Centre)।

'বাস' থেকে নেমে আধুনিক ধরনের স্কুল বাড়িটি চোখে পড়ল। আমাদের প্রত্যুদ্গমন করার জন্য জনৈক শিক্ষয়িত্রী অপেক্ষা করছিলেন। আমরা যেতেই তিনি সমাদরে অধ্যক্ষা মহাশয়ার (Mrs. Taylor) কাছে আমাদের নিয়ে গেলেন। একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষায়তন হওয়াতে এখানে প্রায়ই দর্শক সমাগম হয়। মিসেস্ টেলর এই কেন্দ্র পরিচালনার কার্য খুব দক্ষতার সঙ্গে নির্বাহ করছেন। বুদ্ধিবৃত্তির অপকর্ষ হেতু যারা মানুষ হয়েও সুস্থ মানুষের জীবনযাপনে বঞ্চিত, তাদের প্রতি এঁর করুণার সীমা নেই। মমতার বশবর্তী হয়েই তিনি এই সমাজ-সেবার কাজ জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষায়তনের কার্যকলাপ দেখতে যাওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে জড়বুদ্ধিদের শিক্ষা এবং এই কেন্দ্রের কাজ সম্বন্ধে অনেক আলাপ আলোচনা হল। কোনও শিশু যে জড়বুদ্ধি সে সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়া যায় কি করে, এ বিষয় জানবার জন্য আমাদের বড়ই কৌতূহল ছিল। কতগুলি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা দ্বারা বুদ্ধির মাননির্ণয় করা আজকালকার দিনে খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। তাছাড়া আরও অনেক কিছু দেখে বোঝা যায় যে, শিশুটি স্বাভাবিক-বুদ্ধির নয়। স্বাভাবিক নিয়মে শিশুর বেড়ে ওঠার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধারা আছে। যেমন, ৬।৭ মাসে সাধারণতঃ প্রথম দন্তোদ্গম হয়, ৯ মাসে শিশুরা বসতে শেখে, মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস নিয়মিত হওয়ারও একটা নির্দিষ্ট বয়স আছে। বছর তিনেকের সময়ে শিশু নিজের জামা জুতো পরতে শেখে। কিন্তু জড়বুদ্ধি শিশুদের এই স্বাভাবিক বৃদ্ধি যথাসময়ে হয় না, বেশ দেরী করে হয়। অনেক সময়ে নানা প্রকার শারীরিক বিকারও দেখা যায়, যেমন, খুব বেঁটে, মাথা মোটা, জিভ মোটা, কান বাঁকা, চামড়া খস্‌খসে ইত্যাদি হতে পারে। 'মঙ্গোল' বলে এক-ধরনের জরদ্‌গব গোছের শিশু আছে, তারা দেখতে অনেকটা মঙ্গোলীয়ান্ জাতির আকৃতিবিশিষ্ট। তাদের চোখ ছোট, বাঁকা করে বসানো, নাক থ্যাবড়া। শিশুকালে অনেক সময়ে জিভটা বাইরে বেরিয়ে থাকে, হাতের তেলো কদাকার। এরা প্রায়ই কৈশোর অবস্থায় উপনীত হলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জড়বুদ্ধি শিশুরা সাধারণ বিদ্যালয়ে গেলে শিক্ষকরা কিছুদিনের মধ্যেই ধরে ফেলতে পারেন। এরা এক বিষয়ে বেশীক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না, অনেক সময়ে তোতাপাখির মতো কিছু মুখস্থ করলেও পড়া বলতে বা বুঝতে পারে না, কার্যকারণ সম্বন্ধে জ্ঞান এদের অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, সাধারণ পদ্ধতিতে এদের

লেখাপড়া শেখানো অসাধ্য ব্যাপার। অন্যান্য স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকাও এদের পক্ষে দুষ্কর হয়, কারণ তারা প্রায়ই বিদ্রূপ করে বেচারীদের জর্জরিত করে তোলে। এই ধরনের শিশু দেখলেই ইংল্যাণ্ডের শিক্ষকের কর্তব্য বিদ্যালয়ের চিকিৎসককে জানানো। তখন এদের পরীক্ষা করা হয়। অনেক সময়ে বুদ্ধিবৃত্তি স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও রোগভোগ বা প্রতিকূল পরিবেশের জন্য ছেলেমেয়েরা পড়াশুনায় পিছিয়ে থাকে, অথবা ঠিকমতো মনোনিবেশ করতে পারে না। বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা তাদের বাছা সম্ভবপর হয়। দুই বছর বয়স হলেই স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ যে কোনও শিশুকে এজন্য পরীক্ষা করতে পারেন, কারণ শীঘ্র দোষগুলি ধরা পড়লে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

এই কেন্দ্রটিতে ছেলে এবং মেয়ে দুই-ই আছে। তবে পুরুষ শিক্ষক নেই। শ্রীযুক্তা টেলরই শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করেন এবং শিক্ষয়িত্রী নির্বাচনের সময়ে বিবাহিতা ও সন্তানবতী জননীদেরই মনোনয়ন করেন। তাঁর মতে, এতো জননীরই কাজ। যে সন্তানটি রুগ্ন, অসহায়, মাতৃ-হৃদয়ের পুঞ্জীভূত করুণা তো তার উপরেই বেশি করে পড়ে। যদিও প্রত্যেক নারীর মধ্যেই একটি মাতৃরূপ নিহিত আছে, তথাপি যাঁরা সত্যি সত্যি সন্তান কোলে করবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, যাঁরা জানেন, কী অসীম ধৈর্য, ক্ষমা ও ভালোবাসা দিয়ে অবোধ শিশুর পরিচর্যা করতে হয়, তাঁদেরই বেছে নেওয়া হয় এই জড়বুদ্ধি শিশুদের সেবার জন্য। কেন্দ্রটি দেখার পর শ্রীযুক্তা টেলরের দূরদর্শিতা সম্যক্ উপলব্ধি করলাম।

এ বিষয়ে শিক্ষয়িত্রীদের কোনও বিশেষ ধরনের ট্রেণিং দেওয়া হয় না। তবে, মধ্যে মধ্যে অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ্ বা চিকিৎসকের বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়।

এখানকার ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ১০৯। সকাল সাড়ে নটা

থেকে বিকাল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত কাজের সময়। এদের জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থা আছে, কারণ সাধারণ ছেলেমেয়েদের মতো এদের যানবহুল পথে ছেড়ে দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। শনি রবিবারে ক্লাস হয় না এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের ছুটি অনুসারেই এই কেন্দ্রের ছুটি হয়। বছরে দুবার অভিভাবকদের কেন্দ্র পরিদর্শন করতে এবং শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করতে ডাকা হয়। এছাড়া অবশ্য জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলেই অভিভাবকদের জানানো হয়।

জীবনযাত্রার সাধারণ কাজগুলি যাতে এরা করতে শেখে সেজন্য সম্ভব হলে একটা জীবিকা অর্জনের মতো অর্থকরী বিদ্যা এদের শেখানো হয়। অন্যের অসুবিধা না করে যাতে এরা শান্ত ও নির্বিরোধ জীবনযাপন করে, এই হল এখানকার শিক্ষার লক্ষ্য। ষোল, এমন কি আঠার বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েরা এখানে শিক্ষালাভ করে। এখান থেকে বেরিয়ে কেউ কেউ ছুতোর মিস্ত্রির কাজ, জুতো-সেলাই, ধোপার কাজ, দড়ি বোনার কাজ প্রভৃতি করে জীবিকা নির্বাহ করে। কেউ কেউ কিন্তু এমন জরদ্গব যে, তাদের কোনও জ্ঞানই হয় না। তাদের জন্য রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষ থেকে বিশেষ আশ্রমের ব্যবস্থা করা আছে, তাতেই তারা অবশিষ্ট জীবন কাটায়। এদের বাইরে ছেড়ে দিলে বিপদ অনেক রকম। নানা দুর্ঘটনা হতে পারে, দুর্বৃত্তের দল এদের অসৎ কাজে লাগাতে পারে, নিজেদের ঠিকমতো সমাজে খাপ খাওয়াতে না পারার জন্য এদের খারাপ হয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা আছে। সংযম এবং সমাজবোধের অভাব হেতু এদের সন্তান-উৎপাদন-প্রবণতা অত্যন্ত বেশি, এদের সন্তান হলে সে সন্তান প্রায়ই জড়বুদ্ধি ও বিকলাঙ্গ হয়। এই সব কারণেই ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষ এদের জন্য এত সব ব্যবস্থা করেছেন।

আলাপ-আলোচনার পর আমরা কেন্দ্রটি ঘুরে দেখতে গেলাম। বাড়িটি আধুনিক স্কুল-বাড়ির ধরনে তৈরী। মস্ত বড় বড় আলো-হাওয়া-যুক্ত ক্লাস-ঘর, প্রত্যেক ঘরে বড় বড় কাচের জানালা, তার ধারে ফুলদানীতে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। ঘরের দেওয়াল হাল্‌কা রঙে চিত্রিত। শীতকালে ঘরেব মধ্যের বাতাস গরম রাখার জন্য গরম জলের 'পাইপ'-এর (Central heating) বন্দোবস্ত আছে। প্রার্থনা এবং ড্রিল করার জন্য মস্ত বড় হল-ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, কোনও কিছুরই অভাব নেই। দুপুরবেলার খাবার ওখানেই রান্না হয়। রোজ দুধ বিতরণ করা হয়। দন্ত চিকিৎসা এবং সাধারণ চিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে।

এখানকার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি এবং বয়স বিচার করে উচ্চ শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীতে ফেলা হয়। উচ্চ শ্রেণীর জড়বুদ্ধিদের বহুকষ্টে অতি সামান্য লেখাপড়া শেখানো যায়। এদের মানসিকতা সাধারণতঃ নার্সারী স্কুলের ছেলেদের সমান। খুব বেশি হলেও ৯।১০ বছরের ছেলেদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি পূর্ণবয়স্ক জড়বুদ্ধির হয় না। তবে, ঐ বয়সেও তো মানুষে খানিকটা শিখতে পারে, সুতরাং সেটুকু এদের শেখানো যায়। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে একাজে অগ্রসর হতে হয়, কারণ এরা শেখে খুব দেরীতে। নানা প্রকার ছবি এবং বড় বড় টাইপে লেখার সাহায্যে এদের পড়তে শেখানো হচ্ছিল। রবিন পাখি, পিঠে, মেয়ে ইত্যাদির ছবি দেখিয়ে সেই সেই নামলেখা কার্ড সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে এক একটি শব্দের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এর পর আছে সেই সব শব্দসম্বলিত ছোট ছোট বাক্য। এগুলির পরিচায়ক ছবিও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। অক্ষর চেনাটা আসে তারও পরে। সাধারণতঃ রাস্তার নাম, খবর বা ইস্তাহার প্রভৃতি পড়তে পারার মতো বিদ্যা হলেই যথেষ্ট মনে করা হয়। অঙ্কও অতি সামান্য শেখানো হয়। জিনিসপত্র ওজন করা, পয়সা

গোণা ইত্যাদির মধ্যেই সেটা সীমাবদ্ধ থাকে। অঙ্কের ক্লাসে দেখলাম ১২।১৩ বছরের ছেলেমেয়েরা অতি সাধারণ যোগ অঙ্ক সামনে নিয়ে হাঁ করে বসে আছে। লেখাপড়া-শেখা আদৌ সম্ভবপর হবে কিনা, সেটা সাধারণতঃ এদের ১১ বছরেই শিক্ষয়িত্রী বুঝতে পারেন।

প্রত্যেকের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হয় বলে এক একটি ক্লাসে ২০ জনের বেশি ছাত্রছাত্রী থাকে না। প্রত্যেকের অগ্রসর হওয়ার অনুপাত বিভিন্ন। তাই একই ক্লাসে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করছে, এমন অনেককে দেখলাম। এখানে কখনও সহপাঠীর সঙ্গে তুলনা করা হয় না, কারণ তাতে এরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে।

পড়াশুনা বিশেষ হয় না বলে হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার প্রচলন এখানে খুব বেশি। এদের স্নায়ুর দোষ থাকাতে এরা সব সময়ে ঠিকভাবে হাত-পা নাড়তে পারে না। কয়েক মাসের স্বাভাবিক শিশু যেমন অপটু হাতে জিনিস ধরে, এদের অঙ্গ সঞ্চালন অনেক সময়ে সেরকম হয়। অতএব মণ্টেসরী আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে 'sense training' বা বুদ্ধি-অনুশীলনের শিক্ষা এখানে খুব দেওয়া হয়। নানাপ্রকার কাঠের টুকরো নিয়ে খেলা, বড় বড় কাচের পুঁতির মধ্য দিয়ে সুতো গলানো প্রভৃতি এরা করে থাকে।

হাতের কাজের মধ্যে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য আছে। একটি ক্লাসে দেখলাম, ছাত্রছাত্রীরা ছবি আঁকছে। শিক্ষয়িত্রী বিষয়বস্তু বলে দিচ্ছেন, কি কি রং ব্যবহার করতে হবে, তাও বলছেন। মস্ত মোটা তুলি দিয়ে ধ্যাবড়া ছবি এরা আঁকে। প্লাস্টিসিনের কাজ, দড়ি বোনা, উল দিয়ে কার্পেট বোনা ইত্যাদি এদের শেখানো হচ্ছিল।

একটি ক্লাসে সেলাই হচ্ছিল। একটি ১৩।১৪ বছরের ছেলে লেখাপড়া কিছু পারে না, কিন্তু সেলাই শিখছে যত্ন করে। যে

যেদিকটা পারে না, সেই দিকে বেশি ঝোঁক দিয়ে তাকে নিরুৎসাহ না করে যে যেটা পারে, তাকে তাই করতে দেওয়া হয়। সেলাইয়ের ক্লাসে প্রথমে বড় বড় ফুটোওয়ালা কাপড়ে মোটা ছুঁচ দিয়ে সোজা ফোঁড় তুলতে শেখানো হয়। কেউ কেউ তাতেই আটকে যায়, কেউ কেউ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। উলের কাজও শেখানো হয়। দু-একটি মেয়ে দেখলাম, খুব শান্ত। মন দিয়ে শেখবার চেষ্টা করছে। আগ্রহে জিভ বার করে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে তারা প্রাণপণে সেলাই করছে।

একটি ঘরে কতগুলি ছেলেমেয়ে চামচ পরিষ্কার করছিল। কেউ কেউ কাঠ টুকরো করছিল। তাদের দিয়ে এর বেশি কাজ আশা করা যায় না।

জিভের জড়তা থাকার জন্য অনেক জড়বুদ্ধি শিশু ভালো করে কথা বলতে পারে না। তাদের কথা বলতে শেখানো এখানকার একটি কষ্টসাধ্য কাজ, আনন্দপূর্ণ খেলার মধ্য দিয়ে এ শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়। যত অল্প বয়সে এটা আরম্ভ করা যায়, ততই ভালো।

নানাপ্রকার অভ্যাস শিক্ষা (habit training) দেওয়াও এখানকার কাজের অঙ্গ। স্কুলে আসামাত্র এদের পরিষ্কারভাবে হাত মুখ ধুতে হয়। চুল আঁচড়ানো, দাঁত বুরুশ করা, নিজেদের জামাকাপড় পরিচ্ছন্ন রাখা, শান্তভাবে কাজকর্ম করা, অপরের বিরক্তি উৎপাদন না করা প্রভৃতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যবহার খুব ধৈর্য ধরে অভ্যাস করানো হয়।

সকলের পক্ষে কিন্তু এটুকু শেখাও সম্ভব হয় না। দুতিনটি ১৭।১৮ বছরের ছেলে দেখলাম, তারা মস্ত মোটা মোটা কাঠিতে উল বোনার নামে কতগুলি মোটা উল নিয়ে জট পাকাচ্ছিল। তারা নিজেদের কাপড়চোপড় অপরিষ্কার করে ফেল্লেও কিছু বুঝতে পারে না। এদের প্রতি শিক্ষয়িত্রীদের আন্তরিক মমতা লক্ষ্য করলাম।

এখানে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে কোনও কড়াকড়ি নেই। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীদের 'হাঁ'-কে 'না' এবং 'না'-কে 'হাঁ' করা যে যায় না, তা এরা জানে। সদয় ব্যবহারে শিক্ষয়িত্রীরা এদের হৃদয় জয় করেছেন। ভালো ব্যবহার পশুপাখিতেও বোঝে, আর এরা তো মানুষ। শাস্তির প্রয়োজন কদাচিৎ কখনও হয়। তখন কোনও একটা আনন্দ (যেমন খেলা) থেকে এদের বঞ্চিত করে বোঝানো হয় যে, কাজটা অন্যায় হয়েছে, অন্যায় করলে শাস্তি পেতে হয়। এ শাস্তি খুব বিবেচনার সঙ্গে দেওয়া হয়, যাতে কোনও রকম নিষ্ঠুরতার প্রশ্ন না ওঠে, এবং দোষটা সংশোধিত হতে পারে। অল্প অল্প করে দায়িত্বপূর্ণ কাজ এদের দেওয়া হয়। স্কুলের নোটিসপত্র সব এদের হাত দিয়েই দেওয়া হয়। সারাদিন ভালো ছেলে হয়ে থাকলে বিকালবেলায় বাড়ি ফেরবার সময়ে একটি লাল টুকটুকে আপেল পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা আছে। একটি ছোট্ট ছেলে সেদিন এই পুরস্কার পেল। তার নির্বোধ মুখের তৃপ্তির হাসিটি আমি আজও ভুলতে পারি নি। এরা সাধারণত নিজেদের মধ্যে বেশ মিলেমিশে থাকে। সকলে ভালো করে কথা বলতে না পারলেও পরস্পরকে বুঝতে এদের অসুবিধা হয় না। এরা মাঝে মাঝে খুব সহজ নাটক অভিনয় করে।

আমরা এই স্কুলে গেলে বিচিত্র পোশাকে কালো মানুষ দেখে কেউ কেউ বিস্মিত হল। একটি মেয়ে এসে আমার শাড়ীর আঁচল ধরে দেখল। একটি মেয়ে তার মাথার রঙিন ফিতে আমাকে দেখিয়ে বন্ধুত্বের হাসি হাসল।

দুপুরবেলায় খাওয়ার ঘণ্টা পড়তে আমরা সবাই খাবার ঘরে গেলাম। সেখানে শিক্ষয়িত্রীদের রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়। ভোঁতা কাঁটা ছুরি দিয়ে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে খায়। অনেকেরই গলায় ঝাড়ন বাঁধা। সাধারণত পুষ্টিকর ও খুব সহজপাচ্য খাবার এদের দেওয়া হয়।

খাওয়ার পর প্রয়োজনবোধে কেউ কেউ বিশ্রাম করে। বিকাল বেলায় এদের অন্যান্য কার্যকলাপ দেখলাম। নানাপ্রকার ব্যায়াম, খেলা, নাচ-গান, এই সব হল। কথার মধ্যে যে ছন্দ আছে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। চেয়ারে বসে নানাপ্রকার করতাল, ঝুমঝুমি বাজিয়ে ঐক্যতান বাজনা হল। মাংসপেশীর সম্যক্ চালনের জন্য খেলার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত যত্ন করে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। এরই মধ্যে দেখলাম একটি ১৫ বছরের ছেলে এক কোণে বসে চোখের জল ফেলছিল। একজন শিক্ষয়িত্রী কাছে গিয়ে জানতে পারলেন যে, জুতোর ফিতে লাগাতে পারছে না বলে বেচারী নিরুপায়ের কান্না কাঁদছে। তিনি ফিতেটা লাগিয়ে দিলেন।

সারাদিন সেখানে থেকে এটা বেশ বুঝতে পারলাম যে, অকৃত্রিম এবং আন্তরিক স্নেহ-মমতা না থাকলে দিনের পর দিন এদের নিয়ে কাববার করা অসম্ভব। নির্বোধ দৃষ্টি, বুদ্ধিহীন মুখ, বিকৃত ভঙ্গী, শম্বুক গতিতে অগ্রসর হওয়া, অতি অদ্ভুত ভুল করা, এসব বেশিক্ষণ দেখলে স্বভাবতঃই শরীর্মন অবসন্ন হয়ে আসে। আর এই শিক্ষয়িত্রীদের মুখে অম্লান হাসিটি লেগেই আছে। জড়বুদ্ধিদের এই নিকেতনটিকে কেন্দ্র করে যে কল্যাণবুদ্ধি প্রদীপ্ত মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তাকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে এখান থেকে বিদায় নিলাম।

বিদ্যালয়ে পড়ানো—আমি ইংল্যাণ্ডে তিনটি বিদ্যালয়ে পড়িয়েছি। তার মধ্যে বেল ভিউ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Belle Vue Secondary Modern School)-টিই আমাব সব চেয়ে ভালো লেগেছে। একটি অদ্ভুত আন্তরিকতার আস্বাদ সেখানে পেয়েছিলাম।

এটি প্রথমে একটি কাউন্টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। এর সঙ্গে কয়েকটি মাধ্যমিক শ্রেণীও যুক্ত ছিল। পনেরো বছর বয়স

পর্যন্ত ছাত্রীরা এখানে থাকত। পরে এটি ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা আইন অনুসারে সেকেণ্ডারী মডার্ণ স্কুল আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

এই বিদ্যালয়ে বহুপ্রকার মূল্যবান্ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী খুব চমৎকার মহিলা। কারুণ্যরসধারায় তাঁর মন সর্বদাই সিক্ত থাকত। এমন কোমলহৃদয়া মাতৃস্বরূপিণীর সংস্পর্শে দিনের পর দিন আসতে পারাটা সেই সুদূর প্রবাসে আমি বিশেষ লাভ মনে করতাম। তিনি আমার সঙ্গে প্রায়ই বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ব্যবস্থা নিয়ে নানাবিধ আলোচনা করতেন। ছাত্রীদের ভালো-মন্দ নিয়েও যথেষ্ট আলোচনা হত।

ছাত্রীরা আসত সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তর থেকে। দরিদ্র শ্রমিক, কারখানার কুলি, বয়লার, কলকারখানার মজুব প্রভৃতির পরিবারভুক্ত ছিল এদের অধিকাংশ। এই বিদ্যালয়ের আগে আমি একটি গ্রামার স্কুলে পড়াতাম। সেখানকার অধিকাংশ বালিকা আসত কেতাদুরস্ত পরিবার থেকে, যেখানে শিক্ষার হাওয়া অনেক দিন থেকেই বইছে। কিন্তু সেখানে ব্যবহাব ঢের বেশি আড়ষ্ট ও নিষ্প্রাণ মনে হত। সভ্যতাটা যে কেমন মুখোশের কাজ করে তা সেখান থেকে এখানে এলে বেশ বোঝা যায়। এখানে প্রাণশক্তি উদ্দামতর, চঞ্চলতর, তার প্রকাশ অকুণ্ঠতর। আমি পড়াতে যাবাব আগের দিন ইস্কুলটিকে চিনে আসতে গিয়েছিলাম। বাচ্চাগুলি আমাকে দেখামাত্র ভীড় করে লাফাতে লাগল ও কলরব করতে লাগল। তাদের আনন্দের প্রকাশ হয়তো খুব কায়দামাফিক নয়, কিন্তু আন্তরিক। দারিদ্র্য ও অভাববোধের তিক্ততা এদের জীবন সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা দান করেছে। ধনীর দুলালীদের থেকে ব্যবহারে পার্থক্য বেশ বোঝা যায়। অনেক সময়ে ছোটমুখে এমন সব কথা শুনেছি যে চমকে উঠতে হয়েছে। শৃঙ্খলার সমস্যাও এখানে বহুবিচিত্র।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বলা দরকার। হয়তো পাঠক মনে করতে পারেন যে, দরিদ্রের সন্তানের জন্য বুঝি সেকেণ্ডারী মডার্ণ স্কুল, আর ধনীর সন্তানের জন্য গ্রামার স্কুল। তা নয়।

অনেকদিন আগে অবশ্য ইংল্যাণ্ডে যে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, তাতে খানিকটা এইরকম অবস্থা ছিল বটে। শ্রী W. K. Richmond তাঁর Education in England গ্রন্থে বলছেন,

"The Victorian attitude to education was much the same as it was to all the other public services: it had its First-Class compartments, the Public Schools with the doors and windows locked against riff-raff ; its Second Class, the old Grammar Schools intended for the sons of the bourgeoisie, the professions ; its Third Class, the Elementary Schools for the 'lower orders', artisans. The First Class was always strictly reserved for those destined to bear office—labelled 'Not for public use'—and therefore does not here concern us: but the ways in which the differences between the Second and Third Classes have gradually come to be resolved are an indication of the power of education to bring about a social change". অর্থাৎ—

'শিক্ষার প্রতি ভিক্টোরীয় যুগের মনোভাব অন্য সমস্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠানেরই অনুরূপ ছিল। এর প্রথম শ্রেণীর কামরা ছিল পাবলিক স্কুলগুলি, দরজা জানালা বন্ধ করে তাতে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা ছিল। এর দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল প্রাচীন গ্রামার স্কুলগুলি, সেগুলি ছিল বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্তের সন্তানের জন্য। আর, এর তৃতীয় শ্রেণী ছিল এলিমেণ্টারী স্কুল, যেগুলি সমাজের নিম্নস্তরের শ্রমিক, মিস্ত্রী প্রভৃতিদের সন্তানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

প্রথম শ্রেণী সর্বদাই যারা শাসনসংক্রান্ত কাজে থাকবে তাদের জন্য পৃথক্ করা থাকত, তাতে ছাপমারা থাকত—"সাধারণের ব্যবহারের জন্য নয়,"—সুতরাং তা নিয়ে এখানে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। কিন্তু যেভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যের সীমারেখা ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসতে লাগল, তাতেই বোঝা যায় যে, সামাজিক পরিবর্তন আনতে শিক্ষার ক্ষমতা কতখানি।'

তারপরের ইতিহাসও শিক্ষায় সর্বসুযোগের জাতীয়করণের ইতিহাস। অবশ্য, এ পরিণতি একদিনে হয়নি, ধীরে ধীরে অবশ্যম্ভাবী ক্রমবিবর্তনের ফলে হয়েছে। নানাপ্রকার মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা দেশে গড়ে উঠে ছিল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সর্বব্যাপী শিক্ষা আইন তাদেব একটি সুসংহত ও সুসংবদ্ধ রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। তাতে এই ঠিক হয়েছে যে, ১১ বৎসর বয়স পূর্ণ হলে পবে প্রত্যেক বালকবালিকাকে পরীক্ষা করা হবে। এই পরীক্ষায় যদি সে academic পড়াশুনার মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষালাভের উপযুক্ত বিবেচিত হয় তবে সে গ্রামাব স্কুলে যাবে। এখানকার ছাত্রদের বুদ্ধির শক্তিও অপেক্ষাকৃত বেশি। আবার, যদি কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে বিশেষ আগ্রহ ও সামর্থ্য দেখাতে শিশু সক্ষম হয় তবে সে টেক্‌নিক্যাল স্কুলে বা কারিগবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবে। এছাড়া অন্যরা যাবে সেকেণ্ডারী মডার্ণ স্কুলে। এদেব বুদ্ধির মান অপেক্ষাকৃত কম, এরা সাধারণ বুদ্ধির পর্যায়ে পড়ে।

তাহলে ধনী-দরিদ্রের কথাটা ওঠে কেন, এই হল প্রশ্ন। আমার মনে হয়, তার কারণ নিম্নরূপ। আমি যে দুটি বিদ্যালয়ের কথা বলছি সে দুটি দুই বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত। এক অঞ্চল আর এক অঞ্চলের চেয়ে দরিদ্র হতে পারে। তাছাড়া, দারিদ্র্যে অনেক গুণ বিকশিত হতে পারে না। যদিও ইংল্যাণ্ডের দারিদ্র্য এবং আমাদের দেশের দারিদ্র্য,—এই দুইএর মধ্যে তফাৎ আছে,

কারণ আমাদের দেশের মতো একেবারে নিঃস্ব সর্বহারা ওদেশে বিশেষ নজরে পড়ে নি (অবশ্য, যারা ফুটপাথে দেশলাই বেচার ছলে ভিক্ষা করত তাদের জীবন সম্বন্ধে জানবার সুযোগ হয় নি) তবু, ধনীদরিদ্রের ভেদ ইংল্যাণ্ডে আছে, এবং ধনী ও দরিদ্রের সন্তানের মধ্যেও সে পার্থক্যটি ধরা পড়ে। এবং একথা কে না জানে, দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী। অভাবের সংসারে অনেক সদ্গুণই পূর্ণপ্রস্ফুটিত হতে বাধা পায়। সুতরাং বুদ্ধির পূর্ণবিকাশেও বাধা হওয়া স্বাভাবিক (অবশ্য প্রতিভার কথা স্বতন্ত্র, এখানে সাধারণ বুদ্ধির কথাই বলা হচ্ছে)। জীবনযাত্রার মান আরো উন্নত হলে এবং শিক্ষার ক্রমাগত চর্চা হলে আরো ভালো ফল এই সব ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে আশা করা যেতে পারত। এটাও একটা কারণ বলে আমি মনে করি। তবে, ধনীর সন্তানও সেকেণ্ডারী মডার্ণ স্কুলের জন্য বিবেচিত হলে সেখানে যাবে, এবং দরিদ্রের সন্তানও গ্রামার স্কুলের জন্য বিবেচিত হলে সেখানে যাবে। রাষ্ট্রের তরফ থেকে তার ব্যবস্থা ঠিকই আছে। ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে সকলেব সন্তান যেন বয়স, যোগ্যতা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা পেতে পারে, তার সব সুযোগই আছে। তবে, ধনী দরিদ্রের পার্থক্যটা কমে এলে ছবিটা কি দাঁড়াবে সেইটিই লক্ষ্য করার বিষয়।

বেল ভিউ স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী প্রত্যেক ছাত্রীকে খুব ভালোভাবে চিনতেন। ছাত্রীরা তাঁকে খুব বিশ্বাস করত, তাঁর উপরে নির্ভরও করত। তিনি প্রত্যেক ছাত্রী সম্বন্ধেই পূর্ব-ইতিহাসের রেকর্ড রাখতেন। এই বিদ্যালয়ে কিছু সমস্যা-শিশুর সন্ধান মিলেছিল। দুটো একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি তের চোদ্দ বছরের মেয়ে কিছুতেই মন দিয়ে পড়ত না। সর্বদা মুখে বুড়ো আঙুল পুরে পিছনের বেঞ্চে বসে থাকত আর যত রাজ্যের দুষ্টুমি করত। তার ব্যবহার যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন একদিন আমি

প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে তার বিষয় বলতে বাধ্য হলাম। আমি তার সম্বন্ধে কি রেকর্ড আছে সেটা জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে জানালেন, মেয়েটি অনাথ, পরের বাড়িতে মানুষ হচ্ছে, এবং সেখানে সে খুব সুখী নয়, কারণ তার উপরে ব্যবহার খুব ভালো করা হয় না। তাকে একদিন বলা হয়েছিল, তুমি এত দুষ্টু কেন তার কারণটা লিখে দাও। তার উত্তরটি তিনি আমাকে দেখালেন। সে লিখেছে, যেহেতু আর সকলেরই খেলা করবার জন্য ভাইবোন আছে কিন্তু আমার কেউ নাই, সেইজন্যই আমি এত দুষ্টু। উত্তরটি পড়ার সময়ে দেখলাম ভদ্রমহিলার চোখদুটি জলে ভরে উঠেছে। আমি লক্ষ্য কবেছি, দুষ্টুগুলির উপরেই তাঁর মমতা অধিক ছিল, কারণ তাদের পশ্চাতের বেদনাময় ইতিহাসটুকু তাঁর মতো এমন করে আর তো কেউ দেখে নি! এই মেয়েটির সঙ্গে আমি ক্রমশঃ বেশ বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিয়েছিলাম, এবং প্রধানা শিক্ষয়িত্রী আমাকে জানিয়েছিলেন যে, পড়ায় মনোযোগী হতে নাকি আমার ক্লাসেই তাকে তিনি প্রথম দেখলেন।

আর একটি মেয়ের কথা বলি। এর বয়স বার কি তের। এতটুকু মেয়ের এরকম বৃদ্ধের মতো কুঞ্চিত ললাট আমি অন্য কোথাও দেখি নি। এ সর্বদাই অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করত, তাদের গালি দিত। একবার আমার হাতঘড়িটা চেয়ে একটু পরল। তারপর কথায় কথায় বলল, সে ইংরেজ নয়, জার্মান, এবং আমাকে এমন একটা প্রশ্ন করে বসল যে আমার চক্ষু ছানাবড়া! ক্লাস শেষ হওয়ামাত্র ছুটলাম প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর ঘরে। ইংরেজ হয়ে নিজের জাতীয়তা অস্বীকার করে, এবং ছোট মেয়ে হয়ে শালীনতার সীমা অতিক্রম করে শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে কথা বলে,—এর পশ্চাতে নিশ্চয় গুরুতর কোনো কারণ আছে। এর ইতিহাস আরও করুণ। মহাযুদ্ধের সময়ে এ মেয়েটি বোমা-বিধ্বস্ত লণ্ডন নগরে ছিল। চোখের সামনে বোমার আঘাতে

দুবার মানুষ ছিন্নভিন্ন হতে দেখেছে, এবং মদোন্মত্ত সৈন্যদের দ্বারা অত্যাচারিতও হয়েছে। তখন এ কচি শিশুই ছিল। যুদ্ধের নৃশংসতা একেও রেহাই দেয় নি। ভালোবাসা ও দৃঢ়তা দিয়ে একেও খানিকটা বশ করে এনেছিলাম। আমাকে খুশি করার জন্য এ অনেক ছবি এঁকে দিত। কিন্তু অন্যদের সাথে এর ব্যবহার খুব বদলায় নি। পরে শুনেছিলাম প্রধানা শিক্ষয়িত্রী একে একটা সংশোধনাগারে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এখানকার ছোট ছোট ছাত্রীগুলি আমাকে সহজেই বন্ধুর স্থলাভিষিক্ত করেছিল। ক্লাসে পড়ানো ছাড়াও আমি এদের সঙ্গে খেলা করতাম, এদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করতাম এবং অবসর সময় সিনেমা দেখা ও হৈ হৈ করা ছাড়া আর কি করে কাটানো যায় তাও আলোচনা করতাম। আমাকে উপহার দেবার জন্য সারা স্কুল দিস্তা দিস্তা ছবি এঁকেছিল। কারণ তারা বুঝেছিল, এইতেই আমি সবচেয়ে খুশি হব।

একটা বিষয় লক্ষ্য করে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম। গ্রামার স্কুলে কোনও বিষয় পড়াবার পর প্রশ্ন দিলে ছাত্রীরা সুন্দর করে উত্তর লিখে আনত। এরা কিন্তু মাতৃভাষাটাই ভালো করে লিখতে পারত না। খুব সাধারণ বানানও বোর্ডে লিখে দিতে হত। গুছিয়ে প্রবন্ধাকারে কিছু লেখা এদের ধাতে আসত না। সুতরাং কোনও বিষয়ে পাঠদানের পর আমি সেই বিষয়টিকে অবলম্বন করে ছবি আঁকতে বলতাম। ছবির তলায় দু একটি ক্যাপশন থাকতে পারে। আশ্চর্য যে, সবাই মহা উৎসাহে ছবি আঁকত। সমস্ত স্কুলে শুধু একটি মেয়ে আমাকে বলেছিল যে, সে ছবি আঁকতে পারে না। আর সকলেই আঁকত। আমার মনে হয় ছবি আঁকার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজ।

ভূগোলের ক্লাসে আমি ভারতবর্ষের বিষয়ে পড়াতাম। হাতে

কলমে দেখিয়ে দিয়ে বা গল্পচ্ছলে পড়াতে হত। একটা নির্দিষ্ট বই ধরে পাতার পর পাতা পড়ানো তাদের কাছে নিরর্থক ছিল। ভারতবর্ষের আবহাওয়া, তার সৌন্দর্য, তার প্রাকৃতিক ও শিল্প-সম্পদ, তার জীবনযাত্রা প্রণালী,—সব কিছুই পড়াতাম। ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ইংল্যাণ্ডের অনেক দিনের। কিন্তু খুব কম ইংরেজই আমাদের সম্বন্ধে সঠিক খবরটি জানেন। সাধারণ ইংরেজকে জানানোর অন্যতম উপায় হল সাধারণ ভারতবাসীর সঙ্গে তাদের যোগ। এই ধারণাব উপরে ভিত্তি করে অগ্রসর হতে গেলে ভারতবর্ষেব জীবন সম্বন্ধে তাদের অবহিত করতে হবে। আমি দেখেছি, ছাত্রীরা ভারতবাসীর সাধাবণ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে খুবই উৎসুক। আর এ বিষয়ে অনেক অদ্ভুত ধারণাও তাদের আছে। আমাকে ছাত্রীরা অনেক প্রশ্ন করত। তার কয়েকটি নীচে তুলে দিচ্ছি—

(১) যদিও কয়েক জাতের লোক গঙ্গায় তাদের শবদেহ নিক্ষেপ করে, তবুও ভারতের লোকেরা গঙ্গাস্নান করে কেন? কেউ এটা বারণ করে না কেন? এতে নিশ্চয় জলটা মৃতদেহ-দূষিত হয়ে যায়।

(২) গরীব লোকেরা কি তাদেব শাড়ী নিজেরা তৈরী করে নেয়?

(৩) যারা সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে সমর্থ, তারা তাদের বাচ্চাদের কি স্কুলে ধনী-দরিদ্র উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে বসতে অনুমতি দেয়?

(৪) ভারতবাসীরা যে ষাঁড়গুলোকে বাজারের মধ্যে যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়াতে দেয় ও সব জিনিস নাক দিয়ে শুঁকে বেড়াতে দেয়, সেটা কি ঠিক করে?

(৫) বাচ্চারা কি ধরনের খেলা করে?

(৬) তোমরা কি ধরনের খাবার খাও?

(৭) তোমাদের মেয়েরা কোন বয়সে বিয়ে করে?—ইত্যাদি।

আমার সংস্পর্শে এসে একটা লাভ এই হয়েছিল যে, ক্রমশঃ মেয়েরা ভারতবাসীকে তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে শিখেছিল। লীড্‌সের একাধিক ভারতীয় ছাত্র আমাকে বলেছিলেন, রাস্তায় ছোট ছোট মেয়েরা তাঁদের অভিবাদন করেছে আর বলেছে, 'তুমি ভারতবাসী? তোমাদের দেশের মিস্‌ অমুক আমাদের পড়ান।'

আমার আর একটি কাজ ছিল, সেটা হচ্ছে ওদের গল্প শোনানো। প্রথমে বাচ্চাদের শ্রেণীতে গল্প শোনাতাম। তারপর বড়রাও আগ্রহ প্রকাশ করতে তাদেরও মাঝে মাঝে শোনাতাম। আমাদের দেশের নানাবিধ গল্প, যেমন, শেয়াল-পণ্ডিত, টুনটুনির গল্প, ঠাকুরমার ঝুলির গল্প, এই সব শুনতে ওরা খুব ভালোবাসত।

ক্লাসে পড়ানো ছাড়া আমি কিছু কিছু ক্লাসে অন্যের পাঠদান নজর করতাম। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ওদের প্রধানতঃ সাহিত্যরসাস্বাদ বা অভিনয় করানোর মধ্য দিয়েই পড়ানো হত। মাতৃমঙ্গল শিক্ষার ক্লাস আমার খুব ভালো লাগত। একজন নার্স এসে এ বিষয়টি শেখাতেন। একটা বড় ডল নিয়ে কি ভাবে তাকে স্নান করাতে হয়, তার যত্ন করতে হয়, এই সব মেয়েরা হাতেকলমে শিখত। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট বই ছিল না। একটা ছোট নোটবুকে দরকারী কথাগুলি চুম্বকাকারে লিখিয়ে দেওয়া হত। কাজের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ আলোচনাও চলত। আমার মনে আছে, একবার একটি ছাত্রী গম্ভীর মুখে নার্সকে বলেছিল, 'আপনি তো বলছেন বাচ্চা জন্মালে তাকে স্নান করানোর কথা, কিন্তু আমার মা বলেন, বাচ্চাদের একবছর পর্যন্ত স্নান করাতে নেই;

আমার ভাইএর এখনও একবছর পুরো হয় নি, সে একদিনও স্নান করে নি!'

গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ও সেলাই খুব যত্ন করে শেখানো হত। সংসারে এ বিদ্যার যথেষ্ট প্রয়োজন তো রয়েইছে, তা ছাড়া অনেক ছাত্রী এই বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে দর্জিব কাজ, ধোপার কাজ বা হোটেলে রাঁধুনীর কাজ বৃত্তিহিসাবে গ্রহণ করত, তার একটা ভালো মতো প্রস্তুতিও এখানে হয়ে যেত। বড় মেয়েরা প্রায়ই প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করত। সে আলোচনায় অনেক সময়েই আমিও অংশ গ্রহণ করেছি সে কথা আগেই বলেছি।

কিশোরীর নির্মল মনেব সংস্পর্শে এসে আমার মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠত। দেখেছি, জীবন এদের যেমন নানা দিক দিয়ে বঞ্চিত করেছে, তেমন অন্য অনেক দিকে দুহাত ভবে এমন ঐশ্বর্য দিয়েছে যা থেকে ধনীর দুলালীরা বঞ্চিত। তাদের হৃদয়ের উত্তাপ, বাহ্যিক ভদ্রতা ও আদবকায়দার পরিবর্তে সরল আন্তরিকতা, তাদের নিজস্ব ভঙ্গীতে গ্রথিত জীবন দর্শন, মেহনতী দুনিয়ায় পরিশ্রম করতে পারাই যে মর্যাদার পবিচায়ক এই বোধ আমাকে নিরন্তর মুগ্ধ করেছে। বিদ্যালয় ত্যাগ করার সময় এলে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী একটি বিদায় সভার আয়োজন করলেন। চোখের জলে ভেসে আমাব ছোট্ট বন্ধুরা আমাকে বিদায় দিল। বিদায় উপহার যে কত কী দিয়েছিল! নিজেদের হাতে আঁকা ছবি, রুমাল রাখার থলি, মাথার ছোট্ট ক্লিপ, কাঁচের পাখি, দেশলাইএর বাক্সে ভরা ছোট্ট একটি পুঁতির মালা, যার যা সম্পদ, কোনও বারণ না শুনে আমাকে দিল। আমি স্কুলে রবীন্দ্রনাথের The Crescent Moon (শিশুর অনুবাদ), ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি ও বত্রিশ সিংহাসন (বাংলা) ও একটি পিটার স্কটের আঁকা বড়

বাঁধানো ছবি, হাঁসের সারি সন্ধ্যার ম্লান আকাশে ভেসে চলেছে, এইসব আঁকা—উপহার দিলাম। একটি ছোট বক্তৃতায় এদের আমার প্রাণের আশীর্বাদ জানালাম। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করার কাজে এদের, এই সাধারণ মেয়েগুলির, দান কখনই তুচ্ছ হবে না, কারণ এরা যখন মা হবে তখন এদের সন্তানদের জানাবে, ভারতবর্ষের এমন অনেক কিছু আছে যা শ্রদ্ধেয়, বা বরেণ্য, জানাবে তারা ভারতবাসীর বন্ধু, আগামী দিনের এই আশা তাদের কাছে রেখে আমি বিদায় নিলাম।

শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ—এখন শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজের কথা বলি। পরীক্ষার পর কিছুদিন কাউন্টি কাউন্সিল অব ওয়েস্ট রাইডিং, ইয়র্কশায়ারএর (County Council of West Riding, Yorkshire) শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কাজ করেছিলাম। হাতেকলমে পরিদর্শনের কাজ শেখাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। অফিসের বিভিন্ন বিভাগের কার্যপরিচালনার ব্যাপার খুব বিশদভাবে লক্ষ্য করতে হত। বিভিন্ন পরিদর্শকের সঙ্গে বিদ্যালয় পরিদর্শনেও যেতে হত। যে কয়েকটি বিষয় আমাকে খুব বেশি আকৃষ্ট করেছিল, তারই কথা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করব।

ইংল্যাণ্ডে সাধারণ পরিদর্শক ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ পরিদর্শকও অনেক আছেন। আমি সাধারণ পরিদর্শক ছাড়াও, আর্ট, শারীর শিক্ষা, লাতিন, হস্তশিল্প ও সঙ্গীতেব বিশেষ পরিদর্শকের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে স্কুল দেখেছি। সবাই স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষেরই পরিদর্শক, শিক্ষা-মন্ত্রীদপ্তরের পরিদর্শকের সঙ্গে আমি কাজ করিনি। পরিদর্শকদের নিজস্ব ছোট ছোট মোটর আছে। নিজেরাই চালান। বিলেতে, পথঘাট সর্বত্রই ভালো, একেবারে পল্লীগ্রামেও মোটর যাবার পিচঢালা রাস্তা আছে। এঁরা গিয়ে

নিজস্ব বিষয়টি ভালো করে দেখে নানাবিধ পরামর্শ দেন। ইংল্যাণ্ডের বিদ্যালয়ে আর্টের দিকে খুব নজর দেওয়া হয়। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এর মূল্য অনস্বীকার্য। শিশুর আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে এর ব্যবহার বেল ভিউ স্কুলে দেখেছি, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। স্কুলে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে এখানকার অভিজ্ঞতার আলোকে বারংবার যাচাই করে নিয়েছি।

শিক্ষক আর পরিদর্শকের মধ্যে যে রকম ত্রাসের সম্পর্ক আমাদের দেশে শিশুকাল থেকে দেখে এসেছি, তা ইংল্যাণ্ডে দেখতে পেলাম না। এমন কি, স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পরিচালিত কাউন্টি স্কুলেও প্রধান শিক্ষক প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করেন। তিনি পরিদর্শকের কাছ থেকে সাহায্য ও পরামর্শ সবই গ্রহণ করবেন, কিন্তু তাঁর মতের সঙ্গে মিল না হলে অসঙ্কোচে স্পষ্ট করে সেকথা বলতে তাঁর এক মুহূর্তও বাধে না। প্রধান শিক্ষক হিসাবে তেজী লোক ইংরেজ পছন্দ করে। একবার একটা সেকেণ্ডারী মডার্ণ স্কুল ভালো পরিচালকের অভাবে নষ্ট হতে বসেছিল। তার ঐ অবস্থা আমি নিজে দেখেছি। তার জন্য একজন ভালো প্রধান শিক্ষকের দরকার হওয়াতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। ইণ্টারভিউএর দিন আমি নির্বাচন কমিটিতে (Selection Committee) দর্শকের মতো উপস্থিত ছিলাম। অনেকের মধ্যে একজন গ্রামার স্কুলের শিক্ষক আবেদনকারী ছিলেন। তিনি ইণ্টারভিউএর সময়ে নানাবিষয়ে খুব তর্ক করলেন, এবং শিক্ষা-বিষয়ে দৃঢ়ভাবে কমিটির মেম্বারদের মতের সঙ্গে নিজের মতের অনৈক্য প্রচার করলেন। 'No Sir, I don't think so sir, I don't agree sir' ('না মহাশয়, আমি তা মনে করি না, আমি এ বিষয়ে একমত নই') ইত্যাদি কথাই তাঁর মুখ থেকে বেশি শোনা গেল। আমি মনে ভাবলাম, সাহস তো কম নয়, এমন ভাবে এঁদের মতের বিরুদ্ধে নিজের মত জাহির করছেন ভদ্রলোক,

তাও যে মতগুলি সব খুব যুক্তিসহ তা নয়, এঁকে এঁরা সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করবেন দেখছি। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, এই ভদ্রলোককেই নিয়োগ করা হল, কারণ, এঁর তেজস্বিতা ও দৃঢ়চিত্ততা এঁদের মুগ্ধ করেছিল, নষ্টপ্রায় বিদ্যালয়ের জন্য এরকম শক্ত লোকেরই দরকার।

পরিদর্শকেরা সকলেই খুব পরিশ্রমী। তাঁরা সব সময়েই শিক্ষাবিষয় নিয়ে চিন্তা করেন। এমন কি, অবসর সময়েও ঐ কথা। পরনিন্দা নাই, পরচর্চা নাই, নিজের খাটুনি নিয়ে গর্বমিশ্রিত আক্ষেপ নাই, শুধু এক চিন্তা, কি করে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনকে সর্বাংশে রূপদান করা সম্ভব, কি করে দেশের মঙ্গল হবে। সকলের সমবেত ও নিরলস প্রচেষ্টা না হলে কখনও কোনও জাতি উন্নতি করতে পারে না। ইংরেজদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে, এবং তা কোটপ্যাণ্ট রুজলিপস্টিক নয়, তা হল সমাজচেতনা, অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করা, দেশের কল্যাণকামনার দীপটি অম্লানভাবে জ্বালিয়ে রাখা,—এইসব।

॥ লণ্ডন নগরে ॥

যখন প্রথম লণ্ডন নগরে পদার্পণ করলাম, বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে এক অপরিচিত বাঙালী ভদ্রলোক আমাকে ল্যাণ্ডলেডীর বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। পরে শুনেছি, বন্ধুদের কাছে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'একটা পুঁটলি রেখে এলাম।' গঙ্গাস্নানপুণ্যলোভাতুর অজপল্লীগ্রামবাসীর প্রথম কলকাতা আগমনে যে দশা হয়, এই বিরাট বিশাল সুসজ্জিত দৃঢ়সন্নদ্ধ-হর্ম্যরাজিভূষিত কর্মব্যস্ত এবং তদুপরি সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত নগরে প্রথম এসে আমারও হয়তো তার কাছাকাছি দশাই হয়েছিল। তবে, পুঁটলিত্ব টেম্‌সগর্ভে বিসর্জন দিতে আমার দু-একদিনের বেশি লাগে নি, তাও বলতে পারি। কারণ, এই জটিল যান্ত্রিক সহরে চলাফেরা করা মোটের উপর সহজ। সং যন কলের মতো চলছে। রাস্তা হারালেও ভয় নেই, শীঘ্রই খুঁজে পাবার আশা করা যায়। এ বিষয়ে একটা মজার গল্প বলি। আমার এক বান্ধবী একদিন এক শালপ্রাংশু পুলিশকে সিধে রাস্তা কোন্‌টা জিজ্ঞাসা করাতে সে সেলাম ঠুকে বলল, 'মাদাম, আমি আপনাকে একটি কথা বলি, লণ্ডনে সোজা লোক আর সোজা রাস্তা আপনি পাবেন না।' তাহলেও, মোটের উপর ইংরেজদের আমার সাহায্য করতে উৎসুকই মনে হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, নিজে সাবধানে চলতে জানলে বিপদ এড়ানো যায়।

রাস্তায় ভীড় যথেষ্ট। দেখে মনে হয়, সবাই বুঝি ছুটছে, ট্রেণ বুঝি তাদের ফেল করল বলে। কিন্তু মুখে কারো কথা নেই। বড় বড় স্টেশনও নিস্তব্ধ, ট্রেণের শব্দ ছাড়া শব্দ বিশেষ পাওয়া যায় না।

মাঝে মাঝে ছুটিছাটাতে লণ্ডনে যেতাম, ইণ্ডিয়া হাউস-এর কাজকর্মের ব্যাপারে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে, ভারতীয়

রেস্তোরাঁতে খানা খেতে আর লণ্ডন সহরের রকমারি মজা দেখতে। বহুবিধ বৈচিত্র্যে রাজধানী আমাকে মুগ্ধ, বিস্মিত করত। অবশ্য, বারোমাস থাকার পক্ষে আমার লীড্‌স্‌ই ভালো লাগত, কারণ সেখানে হৈ চৈ কম।

লণ্ডনে যা আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করত, তা হচ্ছে ভূগর্ভস্থ রেলপথ। লণ্ডনের মাটির তলাটা ফোঁপরা করে এই রেলপথ বানানো হয়েছে। বহু টিউব স্টেশন আছে। সেখানে গিয়ে টিকিট নিতে হয়। অনেক জায়গায় আবার কলের মধ্যে পয়সা ফেললে টিকিট বেরিয়ে আসে। (অনেক সময়ে সাহেবদের টিকিট নেবার পর কলটাকে ধন্যবাদ দিতে দেখেছি।) টিকিট কেটে লিফ্‌ট্‌ বা ইলেক্‌ট্রিকের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হয়। এই সিঁড়ির মজা হচ্ছে, দুধারে দুটো সিঁড়ি থাকে, একটা ওঠার, একটা নামার জন্য। তাতে দাঁড়ালে কষ্ট করে সিঁড়ি ভাঙতে হবে না। আপনিই সিঁড়ির সচল ধাপ আমাকে শেষ প্রান্তে নিয়ে যাবে। তারপর নানাবিধ সুড়ঙ্গ। বিভিন্ন সুড়ঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যাট্‌ফর্‌ম্‌। অনবরত বিদ্যুতপরিচালিত ট্রেণ সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ঘোররবে আসছে যাচ্ছে। প্ল্যাট্‌ফর্‌মে দাঁড়ালে দরজা আপনি খোলে, গাড়ি চললে দরজা আপনি বন্ধ হয়। প্ল্যাট্‌ফর্‌মে চকোলেট ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যায়। সুড়ঙ্গে কৃত্রিমভাবে বায়ুসঞ্চালনের ব্যবস্থা থাকায় প্রায়ই বাতাসের ঝট্‌কা আসে। তাহলেও, মাটির নীচেটা উপর থেকে অপেক্ষাকৃত গরম। এই রেলপথে লণ্ডন সহরের সর্বত্র খুব সহজে যাতায়াত করা যায়। যদিও রেলপথটি বেশ জটিল, তবু, সুড়ঙ্গে এমন ভালো দিঙ্‌নির্দেশ আছে, এবং এমন বিস্তৃত ও পরিষ্কার ম্যাপ পাওয়া যায়, যার সাহায্যে এই যাতায়াত খুবই সুবিধাজনক। আমি বাসের চেয়ে এইটিই বেশি পছন্দ করতাম। টিউব ট্রেণের নূতনত্ব আমাকে খুবই মোহিত করত।

এছাড়া যা আমার মনোহরণ করেছিল, তার উল্লেখ আমি এখনই করেছি, তা হল লণ্ডনে অবস্থিত ভারতীয় ভোজনাগারগুলি। দেশে থাকতে কোনদিন খাদ্যদ্রব্যের উপর দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করেছি বলে স্মরণ হয় না। এখানে এসে কিন্তু ভাত ডাল সুক্তো চচ্চড়ির মুখ না দেখে দেখে মনটা অসম্ভব ছটফট্ করত। তাই লণ্ডনে যাবার সময় হলেই ভারতীয় রেস্তোরাঁতে খাওয়া লণ্ডন ভ্রমণ পরিকল্পনার একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হত। হাসি হল্লায়, ভারতীয় ভাষার কথোপকথনে এই ভোজনাগারগুলি গম্‌গম্ করত, এবং এখানে আমরা ইচ্ছে করলে হাতে করে খেতে পারতাম। ভারতপ্রত্যাগত সাহেবমেমরাও মাঝে মাঝে আসতেন। যদিও দাম একটু বেশিই পড়ত, তবু, আপ্যায়নে মনে হত আত্মীয়ের বাড়িতেই বুঝি গিয়েছি। শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'অন্যনগর' নামে উপন্যাসে লণ্ডন সহরের ভারতীয় রেস্তোরাঁর চিত্র বড় সুন্দরভাবে ফুটেছে।

লণ্ডনে দর্শনীয় অনেক কিছু আছে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হৈ চৈ করেই এমনভাবে দিন কাটত যে খুব বেশি কিছু দেখতে সময় পাই নি। রাজরাণীকে আমি লণ্ডনে দেখিনি, ইয়র্কে একবার এক কৃষিপ্রদর্শনীতে দেখেছিলাম।

একবার কয় বন্ধুতে মিলে এখানকার বিজ্ঞানের যাদুঘর দেখতে গেলাম। শিশুদের কোণটা খুব ভালো লাগল। এখানে যানবাহনের ক্রমবিবর্তন, বাতির ক্রমবিবর্তন প্রভৃতি দেখলাম। একটা ঘড়ি ছিল, তাতে জগতের সব সময় দেখা যায়। আকাশ যানের ক্রমবিবর্তনও বেশ সুন্দর। এ্যালব্যাট্রস্ পাখি থেকে আরম্ভ করে সবরকমের উড়োজাহাজ পর্যন্ত আছে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে একটা জার্মান স্বনিয়ন্ত্রিত উড়ুক্কু বোমাছাড়া উড়োজাহাজ এরা ধরেছিল, সেটাও আছে। একটা চোরধরা ঘণ্টা দেখলাম, বাড়িতে চোর এলে আপনিই ঘণ্টাটা বেজে ওঠে।

পৃথিবী যে ঘুরছে তার প্রমাণ এখানে আছে। অনেক উপর থেকে একটা পেণ্ডুলাম ঝুলছে। সেটা জিরোপয়েণ্টে রেখে দেওয়া হয় একটা সময়ে। তারপরে সেটা নড়তে নড়তে সরে যায় তলার মাটি সরে বলে। নকল রামধনু দেখলাম। রঞ্জনরশ্মির মধ্যে হাতের হাড় দেখলাম। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এখানে প্রায়ই আসে। দেখে মনে হয়, কত কিছুই যে আমাদের শেখবার আছে!

লণ্ডনে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার ছাদে এক মস্ত বাগান আছে। সেটা আমাদের বাস্তবিকই খুব আশ্চর্যান্বিত করেছিল। অন্যান্য তলায় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর, ভোজনাগার ইত্যাদি আছে। বাগানটি বাস্তবিক সুন্দর। নানাদেশে নানাপ্রকারের উদ্যানরচনার কায়দা আছে। ফরাসীদের এক ধরন, ইতালীয়দের অন্য ধরন, আবার ইংরেজদের আর এক ধরন। বিভিন্ন প্রকারের উদাহরণ এখানে দেখলাম।

একদিন আমার বান্ধবী ইভা বলল, মোমের পুতুলের একটা একজিবিশন আছে লণ্ডনে, চল্, দেখে আসি। ভাবলাম, নানা-প্রকার খেলার এক্‌জিবিশন নিশ্চয়। দেখেই আসা যাক।

প্রদর্শনীর নাম মাদাম টুসোর প্রদর্শনী। বেশ একটি বড় বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দেখি, একজন দরোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। বান্ধবী জিজ্ঞাসা করতে গেছে, কোন্‌দিকে যাব। আমি তার ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে দেখি ঠোঁট জোড়া। স্থান কাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠেছি, 'ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করিস না, ওটা পুতুল।'

যাক, উপরে উঠে প্রথমে ডান দিক থেকে দেখতে আরম্ভ করলাম। খেলনার এক্‌জিবিশন মোটেই নয়, মোমের তৈরী পুরো মানুষের সাইজের পুতুল। নানা ঐতিহাসিক লোকের মূর্তি ও ঘটনার বিবরণ আছে।

প্রথমেই উইলিয়ম পিট্‌, চেম্বারলেন, গ্ল্যাডস্টোন, ডিসরেলি প্রভৃতি কয়েকজন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে

আলো চকচক করছে, মনে হয়, এখনই বুঝি কথা বলবেন। তারপর ডিউক ও ডাচেস্ অব উইণ্ডসর। তারপর ব্রিটেন ও ডোমিনিয়নের কয়েকজন সেনাপতি। তাঁদের মধ্যে ওয়াভেল সাহেবও আছেন, একটু রোগা মনে হল, ছবিতে যা দেখেছি তার চেয়ে। তার পরে রাজা ষষ্ঠ জর্জ এবং রাজপরিবারের লোকজনদের মূর্তি। রাজকন্যারা খুব সুন্দর পোশাক পরা, গলায় বড় বড় মুক্তোর মালা। রাজা ষষ্ঠ জর্জের মূর্তি একটু আড়ষ্ট লাগল। তার পরে নানা ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি এবং বিমান-বাহিনীর সেনাপতি, তার মধ্যে খুঁজে পেলাম মাউণ্টব্যাটেন সাহেবকে। তারই কাছে একটা টেবিলের চারিধারে বসে ব্রিটেনের শ্রমিক সরকারের দল বোধ হয় কোনও গভীর মন্ত্রণায় ব্যস্ত ছিলেন। তার মধ্যে সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌কে দেখতে পেলাম। ছবিতে যেমন দেখেছি ঠিক তেমনটি, —তেমনি স্মার্ট ও উজ্জ্বল মুখ। এঁদের দলে এট্‌লি সাহেবও ছিলেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে।

সেখান থেকে এসেই হঠাৎ যেন মুহূর্তের জন্য কল্পনার রাজ্যে চলে এলাম। একটি খুব সুন্দরী কন্যা কালো ভেলভেটের পোশাক পরে অঘোরে ঘুমিয়ে আছে। ক্লান্ত মুখে, মুদ্রিত চোখের পাতায় সে কী একান্ত আত্মসমর্পণের প্রশান্তি! একটি হাত বালিশের উপরে, আর একটি পাশেই শিথিলভাবে পড়ে আছে। মুখে খুব পাতলা নেটের ওড়না ঢাকা। সুন্দরীর বুকটি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের তালে তালে উঠছে নামছে। শুনেছি ভার্সাইএর রাজদরবারের একটি মহিলাকে মডেল করে এ মূর্তিটি তৈরী হয়েছে। মাথার কাছে ছোটখাট একটি বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন— তিনিই মাদাম টুসো (Madame Tussaud), এই অপূর্ব প্রদর্শনীটির প্রতিষ্ঠাত্রী। পাশে দাঁড়িয়ে নেপোলিয়ন, তাঁর সমস্ত গৌরব ও মহিমায় দীপ্ত। তিনটি বিচ্ছিন্ন মূর্তি, কিন্তু সমাবেশের

ফলে মনে হচ্ছিল, কোন্ সোনার কাঠি ছুঁইয়ে এ সুন্দরীর ঘুম ভাঙানো হবে নেপোলিয়ন বুঝি তারই প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস। আর একটি বুড়ীর ছদ্মবেশে বুঝি কোনও পরী মেয়েটিকে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছে।

তার পরেই স্বপ্নজাল এক নিমেষে ছিঁড়ে যায় কতগুলি অত্যন্ত বাস্তব মূর্তি দেখে। পার্লামেণ্টের পুরাতন ও বর্তমান কতগুলি বিশিষ্ট সভ্য। এঁদের মধ্যে চার্চিল সাহেবের সাক্ষাৎ মিলল। তারপর কয়েকজন ঐতিহাসিক সেনাপতি ও নৌ-সেনাপতি ছিলেন, তাঁর মধ্যে লর্ড নেলসন ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ নাবিক। তাঁর ডান হাতটি অর্ধেক কাটা ও ডান চোখটি কানা। এর পরেই দাঁড়িয়ে বসে নানা ভঙ্গিতে জমকালো পোশাকে পাদ্রীরা রয়েছেন। এখানে ধর্মসংস্কারক এবং প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্টিন লুথারকে দেখলাম। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট এবং বড় বড় রাজনীতিবিদ্‌রা এলেন তারপর। এঁদের মধ্যে আব্রাহাম লিঙ্কন, রুজভেল্ট, ওয়াশিংটন, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন প্রভৃতি রয়েছেন। তার পর বিভিন্ন দেশের কয়েকজন বিখ্যাত লোক আছেন। তার মধ্যে স্ট্যালিন, মলোটভ, আবিসিনিয়ার রাজা হেলসেলাসি, চিয়াং কাইশেক, স্পেনের ডিক্টেটার ফ্রাঙ্কো রয়েছেন। ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীর মূর্তি দেখে সেই তলার সব দেখা শেষ করলাম।

উপরের তলার প্রথম ঘরে প্রথমেই নজরে পড়ে সাহিত্যিক-বৃন্দের মূর্তি। এখানে কিন্তু খুব কম সাহিত্যিকের মূর্তি আছে। সেদিক থেকে সংগ্রহটি খুবই অসম্পূর্ণ মনে হল। কেবলমাত্র নিম্নলিখিত কয়েকজন স্থান পেয়েছেন,—কিপলিং, এইচ. জি. ওয়েল্‌স্, শেক্সপীয়ার, লর্ড বেকন, সার্ জে. এম. ব্যারি, টমাস হার্ডি, বার্নার্ড শ, চসার, রবার্ট বার্নস্, স্কট্, ডিকেন্স, হুগো, মিল্‌টন, বায়রন, লর্ড মেকলে এবং উইলিয়াম ক্যাক্সটন, যাঁর বর্ণনা আছে

প্রথম ইংরেজ মুদ্রাকর এবং প্রকাশক বলে। কৈশোরের স্বপ্নরাজ্যের অনেকগুলি প্রিয় পরিচিত মুখ না দেখতে পেয়ে বড়ই ক্ষুন্ন হলাম।

এর পর এলেন ফরাসী ঐতিহাসিক নরনারী। ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই ও রাণী মেরী অ্যান্টয়নেট বসে, তাঁদের ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে। রাণীর কী অপরূপ সৌন্দর্য! এঁরা সবাই ফরাসী-বিপ্লবের বলি। ভল্‌টেয়ার এক পাশে আছেন, আর মাঝখানে একটা টুলের উপর বীরাঙ্গনা জোয়ান অব আর্কের কী শৌর্যমণ্ডিত চেহারা। নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁকে আমার প্রণাম নিবেদন করলাম।

স্কটল্যাণ্ডের মোহিনী রাণী মেরীর শিরশ্ছেদের দৃশ্যটি এল তারপর। সে যে কী হৃদয়বিদারক! হাড়িকাঠে মাথা দিয়ে রাণী মেরী উপুড় হয়ে আছেন, রাজহাঁসের মতো ধবধবে গ্রীবা, লাল ভেলভেটের পোশাক। দু ধারে হাতে খাঁড়া নিয়ে চোখে কালো চশমা পরে জহ্লাদ। হাতে ক্রশ নিয়ে পাদ্রী দাঁড়িয়ে। অনেক লোকজন। কয়েকটি মেয়ে কাঁদছে, অসহ বেদনায় বুক চেপে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানকার আলো খুব প্রখর নয়, অন্ধকারতরল আবছায়া। মনে হয় একটি অত্যন্ত বিষাদবিহ্বল মুহূর্ত যেন থমকে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

তারপর দেখলাম, নেপোলিয়নের মৃতদেহ। অত বড় মানুষ অসহায় হয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত। অল্প অল্প আলো। দিগ্বিজয়ীর এই পরিণাম দেখলে বুকের ভিতর কেমন করে।

তার পাশেই ১৮০৫ সনের ট্রাফালগারের যুদ্ধে নেলসনের মৃত্যু রূপায়িত রয়েছে। উঃ, সে কী ভয়ানক! সাদা কাপড়ে নেলসনের গা ঢাকা। চোখ কপালে উঠেছে। আশেপাশে অনেক লোকজন, বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি, কেউ কেউ অশ্রু বিসর্জন করছে। চিকিৎসক হতাশ মুখে নাড়ী টিপে আছে। একজন

লণ্ঠন হাতে নিয়ে মুখে আলো ফেলছে। পাশে একটা গামলায় রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। অন্ধকার ঘুরঘুট্টি রাত।

এর পর যা জিনিস দেখলাম, জীবনে ভুলব না। এগুলি কিন্তু মোমের তৈরী নয়, আসল জিনিস। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে দখল করা নেপোলিয়নের গাড়ির খানিকটা ভাঙা অংশ। তার পাশে বাস্তিলের প্রধান ফটকের চাবি, এবং ফরাসী-বিপ্লবে ব্যবহৃত গিলোটিন করার আসল খাঁড়াটি, যা দিয়ে ষোড়শ লুইয়ের পরিবার এবং ফ্রান্সের বহু লোককে কোতল করা হয়েছিল। সমস্ত ফরাসী-বিপ্লবটা যেন চোখের উপর ভাসতে লাগল।

গাই ফক্‌স্‌কে টেনে হিঁচড়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটিও বড় অমানুষিক। অন্ধকার রাত, মশাল হাতে লোকেরা,—সবসুদ্ধ মিলিয়ে একটা ভূতুড়ে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে।

বুকে চাপানো পাষাণভার থেকে একটু মুক্তির শ্বাস ফেললাম শিশুদেব জন্য রচিত নার্শারির গল্প ও ছড়াগুলির রূপায়ণ দেখে। এখানে রেড রাইডিং হুড প্রভৃতি চিরপ্রিয় গল্পগুলির সুন্দর প্রতিমূর্তি আছে।

তার পরে আরও কয়েকটি মূর্তি পেরিয়ে মহাত্মা গান্ধীতে এসে চোখ আটকে গেল। পরিচয়—Indian politician and mystic—ভারতীয় রাজনীতিক ও যোগী। খুব বিশ্রী মূর্তি, মোটেই যথাযথ হয় নি। কতগুলি আবিষ্কারক আছেন, যেমন লিভিংস্টোন ও ক্যাপ্টেন স্কট। স্কট সাহেব আপাদমস্তক লোমের পোশাকে ঢাকা। বয়-স্কাউটের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন-পাওয়েলও আছেন।

তারপর কতগুলি চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রী ইত্যাদি আছেন। চার্লি চ্যাপলিন, সুন্দরী নর্মা শিয়ারার প্রভৃতি তার মধ্যে রয়েছেন। খেলাধুলায় বিখ্যাত কয়েকজনকে দেখা গেল। তার মধ্যে জো লুই এবং ব্রাড্‌ম্যান আছেন। সিঁড়িতে কয়েকজন

নাজিবীরের ভয়ঙ্কর চেহারা—রিবেনট্রপ, গোয়েরিং, হিটলার, গোয়েবেল্‌স্ ইত্যাদি। গোয়েরিংকে দেখলে আতঙ্ক জাগে। মুসোলিনিও রয়েছেন।

এসব দেখার পর সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাজাদের ঘরে গেলাম। এখানে ইংল্যাণ্ডের সব রাজাদের মূর্তি আছে। বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন বংশের রাজা-রাণীর মূর্তি ঐতিহাসিকভাবে সাজানো আছে। 'কেশরী-হৃদয়' রাজা প্রথম রিচার্ড ও ব্ল্যাকপ্রিন্সকে দেখে সুখী হলাম। হাউস অব টিউডরে রাজা অষ্টম হেনরি রয়েছেন—যেমন লম্বা তেমন মোটা, আশেপাশে ছটি রাণী নানা ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বা বসে রয়েছেন। রাণী এলিজাবেথও কাছাকাছি আছেন। হাউস অব স্টুয়ার্টে স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী, যাঁর বধ্যভূমির বিবরণ আগে দিয়েছি, তাঁকে দেখতে পেলাম। অপূর্ব প্রভা-তরল মূর্তি। রাজা সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড, রাণী আলেকজান্দ্রা এবং রাজা পঞ্চম জর্জ একটা বাগানে রয়েছেন। তার পটভূমিকা বড় সুন্দর, রাত হয়েছে, পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, বাড়িঘরের জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। স্বপ্নময় পরিবেশ।

এই সব দেখা হয়ে গেলে সাত পেনি অতিরিক্ত গাঁটের কড়ি খরচ করে বেস্‌মেণ্টে নেমে চেম্বার অব হররস্ বা বিভীষিকার কুঠিতে ঢুকে যে বীভৎস ও আতঙ্কিত অভিজ্ঞতার আস্বাদ লাভ করলাম তা ভাষায় বর্ণনা করা বাস্তবিকই শক্ত। যাঁরা চোখে দেখেছেন তাঁরাই শুধু এর ভয়াল ক্রূরতা অনুভব করতে পারবেন। কী দেখলাম, মোটামুটি ভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করব মাত্র।

সামনেই দেখি, জেলখানার জানালা ধরে এক উদ্‌ভ্রান্তমূর্তি রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখে পাগলের দৃষ্টি। ইনি একজন কাউণ্ট, বাস্তিলের দুর্গে ত্রিশ বছর ধরে বন্দী ছিলেন।

তার পর বেস্‌মেণ্টে ঢুকলাম। অদ্ভুত পরিবেশ। পাথরের জেলখানা, গুমোট ভ্যাপসা ভাব। পাথরের সিঁড়ি, তার গায়ে

মশাল জ্বলছে (অবশ্য বিদ্যুতে জ্বলে)। মধ্যে বহু খুনীর মূর্তি। অনেকেই স্ত্রীকে খুন করার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। কেউ কেউ অনেক লোক মেরেছে। অনেকেরই মুখ দেখলে কিন্তু খুনী বলে বোঝা যায় না, দিব্য প্রশান্ত ভাব। অবশ্য কারো কারো চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত হিংস্র।

ফ্রান্সের ষোড়শ লুই ও মেরী অ্যান্টয়নেট, যাঁদের উপরে দেখলাম, তাঁদের রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ডের প্রতিমূর্তি রয়েছে। এরকম রক্তমাখা মুণ্ড আরও কয়েকটি আছে। এক জায়গায় বসে কয়েকটি লোক টাকা জাল করছে। সে কী সন্ত্রস্ত উল্লাসের ভাব তাদের চোখে মুখে! মধ্যযুগের ইউরোপে যত রকম নির্যাতনের বিধি প্রচলিত ছিল, তার সব প্রকারের উদাহরণ ছোট ছোট মডেল করে দেখানো হয়েছে। এক কথায়, নারকীয়। প্রথম যাকে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে মারা হয়েছিল তার মূর্তি আছে। একটা জায়গা পর্দা দিয়ে ঘেরা, লেখা আছে,—'কেবল বয়স্কদের জন্য'। পর্দার পিছনে একজন লোককে হুকে বেঁধানো আছে, তার নাকমুখ দিয়ে, মাথার চুল দিয়ে টপ্‌টপ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

মানুষ যে কত নৃশংস হতে পারে, আর মানুষ যে মানুষকে কত বিচিত্র উপায়ে কষ্ট দিতে পারে তা এখানে এলে দেখা যায়। এসব দেখলে মনে হয়, সভ্যতা বুঝি মানুষের বাইরের একটা আল্‌গা আবরণ মাত্র, ওভার কোটের মতো ইচ্ছে করলেই সেটা খুলে রাখা যায়। আর, তার ভিতরটা এত ক্রূর এত বীভৎস এবং নিষ্ঠুর যে, দুনিয়ার কোনও কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা করা চলে না।

বিষণ্ণ মনে উপরে এসে খোলা হাওয়ায় যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এতক্ষণ যে সুসভ্য লণ্ডন নগরীতে ছিলাম তা মনেই হচ্ছিল না। কিছু একটা নিতান্তই করা দরকার মনে করে দুই বন্ধুতে একটি ভারতীয় রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ খাবার জন্য ঢুকে পড়লাম।

লণ্ডনের বন্ধুবান্ধবদের পরিধিটা মস্ত বড়। আমার পরিচিত একজন হয়তো তাঁর পরিচিত আর পাঁচজনকে নিয়ে এলেন। এইভাবে আমাদের পরিচয়ের সীমা বিস্তৃততর হত। এত রকমের লোক দেখেছি যে, সহরটাকে আমার একটা আজব চিড়িয়াখানার মতো বোধ হত। পরিচয়, আলাপ, পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো,—এইতেই দিনগুলি সাধারণতঃ কাটত। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের গণ্ডীটি অবশ্য ছোটই ছিল। তবে, আলাপ পরিচয়ের সীমা বড় হওয়া একাধারে শিক্ষাপ্রদ এবং কৌতুকপ্রদ। একটু নমুনা দেওয়া যাক্। অনেক ভারতীয় ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা নিজেদের সমাজসমুদ্রমন্থন করা অমৃতের সঙ্গে তুলনা দিতেন। এঁদের ব্যবহারে কিন্তু বৈপরীত্যই সূচিত হত। মদ্যপানকে অনেকে সভ্যতার অত্যাবশ্যক চিহ্নরূপে গণ্য করতেন। কেউ কেউ নিজেদের পারিবারিক এবং আর্থিক অবস্থা লুকিয়ে নানাবিধ বড়াই করতেন। বিবাহিত হয়েও ইংরেজ-তরুণীদের কাছে অবিবাহিত বলে পরিচয় দেওয়া, অন্যের মোটরগাড়িতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন এমন ফোটো দেখিয়ে নিজের গাড়ি বলে চালানো প্রভৃতি নজরে পড়েছে। কেউ দেশে অত্যন্ত নৈষ্ঠিক জীবন যাপন করে এসে এখানে তার শোধ তুলছেন, কারো মধ্যে আবার শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের 'আগুন নিয়ে খেলা'র নায়কের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছি।

টিকির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছিলাম। এক ভারতীয় ভদ্রলোক একবার ইতালীর একটা ভোজনাগারে ঢুকে খাবার পরে বিল মেটাতে গিয়ে দেখেন, ব্যাগটা পকেটে নাই। অথচ ঢোকার সময়ে যে ছিল, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তখন তিনি ব্যাগটা ফেরত দিতে সেই ঘরের লোকদের অনুরোধ জানালেন। কেউ দিল না, অনেকে খাপ্পা হয়ে উঠল। তখন নাকি তিনি মাথা থেকে প্রকাণ্ড টিকিটি আকর্ষণ করে

বললেন, আমি একজন হিন্দু যোগী, আমার টিকির ক্ষমতা অসীম। যদি এখুনি আমি ব্যাগটা ফেরত না পাই তবে যে নিয়েছে আমার টিকি তার চোখ অন্ধ করে দেবে। তখন নাকি একজন লোক বিনা বাক্যব্যয়ে মণিব্যাগটা তাঁর টেবিলে রাখল। তিনি গুণে দেখলেন, পয়সা ঠিকই আছে। গল্পটি আমরা খুব উপভোগ করেছিলাম, যদিও এর সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ ছিল।

একবার একটি মাদ্রাজী মহিলা সাংঘাতিক ঝাল দিয়ে রান্না করেছিলেন। একটি ইংরেজ মেয়ে সখ করে চাখতে গিয়ে নাকের জলে চোখের জলে একাকার। আমরা তাই দেখে ভাবলাম, ইংরেজকে Quit India (ভারত ত্যাগ) করানোর এই একটা সহজ পন্থা ছিল। নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেই হত। তাই শুনে এক সাহেব ভদ্রলোক বললেন, 'মোটেই না, যে ইংরেজরা ভারতে থেকেছে, তাদের মধ্যে যারা ভারতীয় খানার আস্বাদ পেয়েছে, তাদের ক্রমশঃ ঝালমশলা খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে যায়, এবং খেতে ভালই লাগে, যেমন আমার হয়েছে।' তখন আমরা জব্দ হয়ে গেলাম। এই রকম হাসিতে গল্পে দিনগুলি কাটত।

আমি লণ্ডনে গেলে ল্যাণ্ডলেডীদের বাড়িতেই উঠতাম। বিলেতে অনেক ভদ্রমহিলা বাড়িতে থাকা খাওয়ার খরচ নিয়ে অতিথি রাখেন। অনেক ক্ষেত্রে এটাই তাঁদের সংসারযাত্রা নির্বাহের প্রধান উপায়। এই ল্যাণ্ডলেডীদের সংস্পর্শে এসে আমাদের বহুবিধ অভিজ্ঞতা হত। ল্যাণ্ডলেডীর গল্প আমাদের কথোপকথনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করত। কারো ল্যাণ্ডলেডী বেজায় খাপ্পা, উগ্রচণ্ডী, কারো বা খুব মাতৃস্নেহপরায়ণা, কারো খুব কৃপণ, কারো কপালে আবার ব্ল্যাকমার্কেটে কেনা ডিম-খাওয়ানো, ক্ষীর-ননী-খাওয়ানো ল্যাণ্ডলেডীও জুটত। এক ভারতীয় মুসলমান ভদ্রলোকের ল্যাণ্ডলেডীর গল্পটা

উল্লেখযোগ্য। উক্ত ভদ্রমহিলার স্বামী দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে হাঁসপাতালে ছিলেন। একদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে ভদ্রলোক তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেলেন। তার মিনিটকতকের মধ্যেই বৈকালিক জলযোগের ঘণ্টা পড়ল। তিনি একটু আশ্চর্য হলেন, শোকের বাড়ি, আবার খাবার ঘণ্টা—ব্যাপার কি? মৃতদেহ তো হাঁসপাতাল থেকে আনাও হয় নি। যাই হোক, খাবার টেবিলে গিয়ে দেখেন, সকলেই রোজকার মতো যথারীতি সেজেগুজে চায়ের টেবিলে এসেছে। কেউ কোনও কান্নাকাটিও করল না, চা কেক ইত্যাদি খেয়ে উঠে মৃতদেহ আনবার জন্য প্রস্তুত হতে গেল। ভারতীয় ভদ্রলোকটির কিন্তু গলা দিয়ে খাবার গল্‌ল না।

আমি যে ল্যাণ্ডলেডীদের বাড়িতে ছিলাম, তাঁদের একজনের গল্প বলেই লণ্ডনের গল্প শেষ করব। ইনি একটু অদ্ভুত ছিলেন, কিঞ্চিৎ ছিটগ্রস্ত। অবিবাহিতা, বৃদ্ধা। আমরা নামকরণ করেছিলাম বুড়িয়া। শুনেছি ইনি নাকি এম্. এ. পাশ। এঁর একটা খুব সাজানো গোছানো লাইব্রেরী ঘর ছিল। অবশ্য এঁকে কোনও দিন লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করতে দেখি নি। সাধারণতঃ এটা একটা দ্বিতীয় বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহার করা হত। এক আমিই যা বইটই ঘাঁটতাম। তাতে তিনি কিছুই বলতেন না। বই পড়লে খুশিই হতেন। নানা দোষগুণের অদ্ভুত সংমিশ্রণ এঁর মধ্যে দেখেছি। খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে বেশ কার্পণ্য করতেন। যে কম খাবে, বুড়িয়ার কাছে সেই প্রিয়। একদিন খাবার টেবিলে কন্টিনেন্টের প্রাতরাশের সুখ্যাতি করাতে আমি যেই বলেছি, ওতে আমার পেট ভরত না, আমাকে ডবল খানা খেতে হত, অমনি ভদ্রমহিলা চটে লাল। তবে অসুখবিসুখ করলে বেশ যত্নই করতেন। তাঁর বাড়িতে প্রথম এসে কি কি নিয়মকানুন আছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'একটাই আছে,—Consideration for others, অপরের অসুবিধা না হয় এটুকু দেখা।'

আমার মনে হয়, যেখানে অনেকে মিলে থাকি, সেখানে ওই একটা কথাতেই সব কিছু বোঝায়।

এঁর একটা পোষা বিড়াল ছিল, তার নাম কুইনি। আমরা সবাই তাকে খুব আদর করতাম। একদিন শুনি কুইনির বাচ্চা হয়েছে। সবাই তো ছুটে বাচ্চা দেখতে গেছি। কয়লার ঘরে কাঠের বাক্সের মধ্যে ক্ষীণ কণ্ঠে মিউ মিউ শুনে দেখি, ওমা! একটা মোটে ছানা! তখনও চোখ্ ফোটে নি। বিড়ালের তো একটা বাচ্চা হতে দেখিনি কখনও। অন্যগুলো হল কি? কেউ আর কিছু জবাব দেয় না। শেষে তদন্ত করে পরিচারিকার কাছ থেকে জানা গেল, অন্য বাচ্চাগুলোকে জন্মানো মাত্র গরম জলে চুবিয়ে মারা হয়েছে। শুনে তো আমরা বেজায় চটে গেলাম। কতদিন ধরে আশা করে আছি, বিড়াল বাচ্চাগুলো হলে মনের সাধে ঘাঁটবো, আর তার বদলে কি না এই নিদারুণ নিষ্ঠুরতার সংবাদ। ল্যাণ্ডলেডী ব্যাপার দেখে লুকিয়ে রইলেন। হাতের কাছে পরিচারিকাকেই পেয়ে খুব তম্বি করলাম, বললাম, 'এ যদি ভারতবর্ষ হত তো ঐ বিড়ালের বাচ্চা মারলে তোমাকে ঐ পরিমাণ সোনা দান করতে হত।' সে বেচারী মুখ কাঁচুমাচু করে বলল যে, এখানে এই রকমই করা হয়, তা না হলে বিড়ালের জ্বালায় টেঁকা দায়। আমরা সারাদিন বাচ্চাগুলোর জন্যে শোক করলাম, একজন নানারকম অমঙ্গলের ভয় করতে লাগল, একজন কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে ফেলল।

এই ল্যাণ্ডলেডীর বাড়িতে ইনি, এঁর অতিবৃদ্ধা বাতে পঙ্গু কানে খাটো মা ও পরিচারিকা ছাড়া কেউ থাকত না। ইনি মায়ের খুবই যত্ন করতেন। এঁর মা প্রায়ই স্কার্ফ জড়িয়ে চুপ করে আগুনের ধারে বসে থাকতেন। পায়ের কাছে কুইনি গুটিশুটি হয়ে থাকত। আমরা কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে খুব বিস্ময় বোধ করতাম। মায়ের শরীর প্রায়ই ভাল থাকত না।

কারো সাহায্য ছাড়া তো হাঁটতেও কষ্ট হত। কিন্তু সব সময়েই এই বৃদ্ধার মুখে একটি অদ্ভুত প্রশান্তির ভাব লক্ষ্য করেছি। দেখে মনে হত, সুখতুঃখময় জীবনের আস্বাদ ইনি পরিপূর্ণভাবে পেয়েছেন, সংসারের কর্তব্যশেষে এখন নিশ্চিন্ত ভাবে মরণের প্রতীক্ষা করছেন, কিছু চাওয়া পাওয়া এঁর বাকি নেই। তাঁর মেয়েও বৃদ্ধা, কিন্তু তাঁর কুঞ্চিত ললাটে, তাঁর ওষ্ঠাধরের কোণে বঞ্চিতের ক্ষোভের আভাস। কী যেন পাওয়া বাকি আছে, কী যেন হওয়া উচিত ছিল অথচ হয় নি, এম্‌নি ভাব।

একদিন ল্যাণ্ডলেডী আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি নাকি সংস্কৃত পড়তে পারো?' সবিনয়ে স্বীকার করাতে 'তুমি আমাকে একটু পড়ে শোনাবে?' বলে একটি অভিজ্ঞানশকুন্তলা এগিয়ে দিলেন। তাঁর হাতে এই বই দেখে খুবই চমৎকৃত হলাম। যাই হোক সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর ঘরে বসে তাঁকে শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কটি পড়ে শোনালাম। শার্সির বাইরে হিমেল হাওয়ায় গাছের ডালপালা নড়ছে, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে, ঘরের মধ্যে অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে বিদেশিনীকে কালিদাস পড়ে শোনাতে শোনাতে মনটা কোথায় চলে গেল, রোমান্টিক শকুন্তলাকে আরো বেশি রোমান্টিক বলে মনে হতে লাগল।

শকুন্তলা ছলছল চোখে পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নিয়ে রাজধানীর উদ্দেশে বনপথ ধরে যাত্রা শুরু করলে পড়া বন্ধ করলাম। খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে এসো।' লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে দেখালেন এক কোণায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু বই রয়েছে। আমি এতদিন এ ঘরে বই ঘাঁটি, কিন্তু এ কোণাটাতে কোনদিন নজর পড়ে নি। বই দেখতে দেখতে সহসা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখি বৃদ্ধার সমস্ত মুখ অস্বাভাবিক প্রভায় জ্বলজ্বল করছে, চোখ তুটিতে সুদূরের স্বপ্ন। ভাঙা গলায় তিনি বললেন, এসব বই এক ভারতীয় বন্ধু তাঁকে

দিয়েছেন, যাঁর কাছে তাঁর ঋণের সীমা নেই। শ্রাবণ রজনীতে আকাশের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত চকিত বিদ্যুতের আলোকলেখা যেমন নিমেষের জন্য অন্ধকার অরণ্যকে উদ্ভাসিত করে দেয়, ঠিক তেম্‌নি করে এই মুহূর্তে তাঁর আচরণের অনেক কিছুই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর, এই মুহূর্তেই আমি তাঁর অনেক কিছুই ক্ষমা করতে পারলাম।

———

॥ মরকত দ্বীপে ॥

১৯৪৭ সালে ঈস্টারের লম্বা ছুটিতে হস্টেল বন্ধ হয়ে গেলে কোথায় যাব সেই ভাবনা খুবই প্রবল হয়েছিল। এমন সময়ে এল ডাবলিন থেকে ছুটি কাটাবার আমন্ত্রণ। অনেকদিন হল ভারতবর্ষ ছাড়লেও; তখন পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড ছাড়া অন্য কোনও দেশ দেখবার সুযোগ হয় নি। সুতরাং আয়ার্ল্যাণ্ড দেখার আহ্বান উপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করলাম না।

টমাস কুকের কাছে গিয়ে সব ব্যবস্থা করলাম। আয়ার্ল্যাণ্ডে যাবার জন্য স্বতন্ত্র পাসপোর্ট বা ভিসা লাগে না। শেষ মুহূর্তে জাহাজের বার্থের জন্য চেষ্টা করাতে বিফল-মনোরথ হতে হল। তবে একটু ভরসা পেলাম যে, জাহাজে চড়ে চেষ্টা করলে বার্থ পাওয়া যেতেও পারে।

এপ্রিলের প্রথমদিকে লীড্‌স্ থেকে লিভারপুল রওনা হলাম। বৈচিত্র্যহীন যান্ত্রিক শিল্প ও সভ্যতার দেশ ইংল্যাণ্ডের পথে কয়েক ঘণ্টার অনুল্লেখ্য ভ্রমণ। সেখানে দুজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল, তাঁরাও একই জাহাজে ডাব্‌লিন যাবেন। ডকে দুটি ভাগ আছে, একদিকে বেলফাষ্ট্‌গামী যাত্রীর ভীড়, অপরদিকে ডাব্‌লিনের যাত্রীর সমাবেশ। কাষ্টম্‌সে বিশেষ কিছু প্রশ্ন করল না, শুধু খাবার জিনিস কতটা সঙ্গে নিয়েছি জানতে চাইল।

জাহাজে উঠেই ভাল করে ডিনার খেয়ে নিলাম. বার্থের জন্য চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার পরে এসে বহু ভদ্রলোক ও মহিলা শাবার জায়গা পেলেন, অথচ চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি পেলাম না। এ রহস্যটা যুগপৎ আমার কৌতুক ও বিরক্তি উৎপাদন করল।

লাউঞ্জে একটি সোফা দখল করে ঘুমাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। রাতে বড়ই কষ্ট হয়েছিল। সমস্ত জানালা বন্ধ, সিগারের ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় বাতাস ভারাক্রান্ত, কেউ নাক ডাকছে, কেউ তার অনুকরণ করছে। দুঃসহ পরিবেশে সে এক বিরক্তিকর

ঐক্যতান! রাত আড়াইটায় দস্তুরমতো সামুদ্রিক পীড়া অনুভব করলাম। এত সমুদ্র পার হয়ে শেষে আইরিশ সমুদ্রের কাছে পরাজিত হয়ে বড়ই লজ্জিত বোধ করলাম।

ভোরবেলা ডাব্লিনের ডকে জাহাজ পৌঁছল। ম্লান প্রভাত, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে। বন্ধুর দেখা পেলাম না। ট্যাক্সি করে জেনারেল পোষ্ট অফিসের কাছে এলাম। সেখান থেকে ডান্লিয়ারের (Dun Laoghaire) ট্রাম ধরলাম। আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রথম পদার্পণ করেই একটি মজার অভিজ্ঞতা হল। একটি ছোট ছেলে খবরের কাগজ বিক্রী করছিল। সে কাছে এসে চুপি চুপি প্রশ্ন করল, কাপড়ের কুপন চাই কিনা, এবং কাগজের মধ্যে লুকিয়ে কুপন বিক্রী করতে চাইল। সে খুব ব্যগ্রতা দেখালেও তাকে আমল দিলাম না। এরকম কালোবাজারী ব্যবসা এখানে পথে ঘাটে খুব চলে দেখলাম।

সমুদ্রের ধার দিয়ে ট্রাম চলল। ডাব্লিনের উপকণ্ঠস্থিত জায়গাগুলিকে (Co-Dublin) বা কাউন্টি ডাব্লিন (County Dublin) বলে। ডানলিয়ারে এইরকম কো-ডাব্লিন অঞ্চলে পড়ে। এটি আইরিশ নাম। এর ইংরেজী নাম কিংস্টাউন (Kingstown)। আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংরেজী ও আইরিশ (গেলীক) ভাষা প্রচলিত। রাস্তার নাম, ইস্তাহার প্রভৃতি এই দুই ভাষাতেই লেখা। সাধারণতঃ ইংরেজী ভাষাই লোকে বলে বেশি। আইরিশ ভাষার হরফ ইংরেজীর হরফের মতো নয়। বিদ্যালয়ে দুটি ভাষাই আবশ্যিক।

ডানলিয়ারের বাড়িতে এসে দেখি, প্রাতরাশের আয়োজন হয়েছে, আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন সবাই। সবশুদ্ধ পাঁচটি ভারতীয়া মহিলা এই বাড়ীতে থাকেন, ডাব্লিনের কলেজের ছাত্রী। বাড়ীটি সমুদ্র থেকে এত কাছে যে, জানালা থেকে নীল জলরাশি চোখে পড়ে। অতি শান্ত পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় মন স্নিগ্ধ হয়ে যায়।

ডানলিয়ারের কাছাকাছি বেড়াবার মতো জায়গা অনেক আছে। লণ্ডন থেকে কয়েকজন বন্ধু আমাদের বাড়ির কাছেই একটা হোটেলে উঠেছিলেন। আমরা সবাই দল বেঁধে বেড়াতাম।

একদিন লাঞ্চ খাওয়ার পর বেড়াতে গেলাম। ডেকের ধারে বাসের জন্য অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ। দিনটি বড় সুন্দর। উপরে স্বচ্ছ নীল নির্মেঘ আকাশ, নীচে সমুদ্রের গাঢ় নীল ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় সোনালী রোদ পড়ে চিক্‌চিক্ করছিল। কিলায়নি (Killiney)র বাস এলে তাতে উঠে পড়লাম। খুব দূর নয়, মোটে দু পেনি টিকিট। আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংল্যাণ্ডের মুদ্রা চলে। আইরিশ মুদ্রাও আছে, তারও পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স ইত্যাদি আছে, শুধু সেগুলির ছাপ আলাদা। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু আইরিশ মুদ্রা চলে না।

বাস পাড়াগাঁয়ের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু পথ ধরে চলল। চারিদিকের দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। কিলায়নিতে এসে গাড়ী থামল। নেমে দেখি সামনেই এক পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে পার্ক। তখন পাহাড়ে ওঠা শুরু হল। খানিক দূর উঠে দেখি, পাশ দিয়ে দেয়াল আছে, দেয়ালের বাইরে উঁকি দিলে নীচে সমুদ্র দেখা যায়। সমুদ্রের ধারে অনেক হোটেল।

পাহাড়ের মাথায় একটি সুন্দর বিশ্রামের জায়গা আছে। সেখান থেকে ডান্‌লিয়ারের বন্দরটি স্পষ্ট দেখা যায়। কেমন করে সমুদ্রের মধ্যে পোতাশ্রয় তৈরী হয়েছে তা বেশ বোঝা যায়। তারপর পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলাম। যেদিকে উঠেছিলাম, সেদিক দিয়ে না নেমে অন্য একটি জঙ্গলে-ঢাকা পাহাড় দিয়ে নামলাম। আরম্ভ হল বনের মধ্য দিয়ে পথ চলা। বন্ধুর পথ, উপল-আস্তৃত। গাছের পাতায় আলো-ছায়ার অলঙ্করণ। ছোট ছোট কণ্টকগুল্ম অজস্র হলদে ফুলে ঢেকে আছে। মনে হয়, রোদের সোনালী রঙ চুরি করেছে বুঝি ফুলগুলি। গাছপালা

ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে পাখির অবিশ্রান্ত কূজন চলেছে। গাছের ডালপালা ও ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে এখানে সেখানে সমুদ্রের নীলিমার আভাস চোখে পড়ে। এখানে এলে মন শান্ত হয়ে যায়, কথা আপনি স্তব্ধ হয়ে যায়, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে সমগ্র পরিবেশের সৌন্দর্য ও মাধুর্য অনুভব করা ছাড়া অন্য কাজ থাকে না।

এভাবে অনেকটা পথ হেঁটে ঠিক হল নিকটবর্তী স্টেশনে গিয়ে ব্রে (Bray) নামে আর একটা জায়গায় যাব। স্টেশনের পথে যেতে যেতে একটা ছোট্ট বাড়ি নজরে পড়ল তাতে লেখা আছে 'টি' (Tea)। ঘুরে ঘুরে সকলেরই বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল, সুতরাং দরজায় হানা দেওয়া গেল। একটা কালো লোমশ কুকুর অনেক দূর থেকে আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল, সেও দরজা অবধি এল।

বাড়ির উঠানে ছোট্ট বাগান, তাতে অজস্র ফুল। এক আধটা সব্জীর গাছও আছে মনে হল। একটি আলুলায়িতকুন্তলা কিশোরী, একেবারে গ্রাম্য, অতি সরল হাবভাব, আমাদের ডেকে নিয়ে বসাল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, বাড়িতে তৈরী রুটি, মাখন, জ্যাম, ডিমসিদ্ধ আর চা পাওয়া যাবে। যে ঘরে বসলাম, সেটি খুবই পুরানো। দেয়ালে কতকগুলি অস্পষ্ট, অদ্ভুত ধরণের ফোটো একটা তাকের উপর ঝিনুকের তৈরী খেলার নৌকা। একটা প্রকাণ্ড বিড়াল জানালার বাইরে থেকে লোলুপ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। গ্রামের টাটকা খাবার খুবই ভালো, জনপিছু ২ শিলিং করে খরচ পড়ল। খাওয়া হলে মেয়েরা মিলে বাড়ির মধ্যেটা একটু ঘুরে দেখে এলাম। বসবার ঘরটি খুব পুরানো ধাঁচের অগ্নিকুণ্ড, পিতলের ভারী বাসনপত্র, পুরানো সোফা ইত্যাদিতে সাজান। এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধা আগুনের ধারে বসে পশম বুনছেন, তাঁর পায়ের কাছে বিড়ালছানা খেলা করছে। সব দেখে শুনে মনে হল, হঠাৎ কি রকম করে যেন আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে গেছি।

জলযোগ ও চা-পানের পর সমুদ্রের ধার দিয়ে চললাম। আমার খুব ইচ্ছা করছিল একেবারে কিনারে যেতে, যেখানে ঢেউ ভেঙে পড়ছে, কিন্তু দলের সঙ্গে যাচ্ছি বলে নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাটা প্রকাশ করা গেল না। এমন স্থানে এসেও আমার সঙ্গীরা নানা বিষয়ে আলোচনা করতে করতে পথ চলছিলেন। আমি চুপ করে সমগ্র চেতনা দিয়ে শুধু সৌন্দর্য উপভোগেই ব্যস্ত ছিলাম।

স্টেশনে এসে ব্রে-র টিকিট কিনে ট্রেণের জন্য মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করলাম। এর পরের স্টেশনই আমাদের গন্তব্য স্থান। পথের দৃশ্য বড় মনোরম। একদিকে সমুদ্র, একদিকে শস্যশ্যামল গ্রাম। ক্ষেতে চাষীরা ঘোড়া দিয়ে হাল চষছে। হৃষ্টপুষ্ট গরুগুলি নিশ্চিন্তে চরে বেড়াচ্ছে।

ব্রে-তে পৌঁছে খানিকদূর গিয়েই একদম সমুদ্রের ধারে এসে পড়লাম। ঈস্টারের ছুটি ছিল বলে ভীড় খুব। এক ধারে সমুদ্র স্নানের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। তার পাশের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম। আরও নীচে পাথরে ঢাকা জমি। বেশ মসৃণ ও রঙিন পাথর। আমি কিছু উপলখণ্ড সংগ্রহ করলাম। আমার সঙ্গীরা সেই প্রস্তরাকীর্ণ পথ দিয়ে চলতে লাগলেন। আমি লোভ সংবরণ করতে পারলাম না, আরও নেমে ভিজে বালুর উপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। পায়ে রবার-সোল জুতো ছিল, কিন্তু কাপড়-চোপড় একটু ভিজে গেল। সে-সব কে তখন গ্রাহ্য করে!

একেবারে সমুদ্রের কিনারে এসে দাঁড়ালাম। বালুর উপর দিয়ে কুল্‌কুল্‌ করে জলধারা বইছে। দুরন্ত শিশুর মতো ঢেউগুলি ছুটে এসে তীরের উপর ভেঙে পড়ছে, মাঝে মাঝে প্রস্তরখণ্ডে প্রচণ্ড বেগে আছাড় খাচ্ছে। কী তার গর্জন! একবার একটা ঢেউ একেবারে আমার পায়ের কাছে এসে ভেঙে পড়ল অজস্র ফেনার ফুলঝুরি হয়ে। লাফিয়ে সরে গেলাম, নয়তো উচ্ছ্বসিত

বেগে ছুটে এসে কুটি কুটি হয়ে ভেঙে পড়া ঢেউ দিত সব ভিজিয়ে। সাগরের এই আপনভোলা চপল দুষ্টুমি খুবই মিষ্টি লাগল।

সমুদ্রের এক ধারে অরণ্য-আবৃত পাহাড় উঠে গেছে। তার পাদদেশে সারি সারি হোটেল। বালুর উপর ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। ঝিনুক বেশি পেলাম না, দু একটা কুড়ালাম। আরও কিছুক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু সঙ্গীরা এগিয়ে গেছেন দেখে তাড়াতাড়ি পা চালাতে হল।

পাহাড়টায় ওঠা আরম্ভ করলাম। সুন্দর পথ, সমুদ্রের দিকে দেয়ালগাঁথা। উঁকি মেরে দেখলাম, পাহাড়ের পাদদেশে চলেছে ঢেউ আর পাথরের অবিরাম ফেনিলোচ্ছল কলহ।

পাহাড়ের উপরে উঠবার পথ সব জায়গায় ভাল ছিল না। এক জায়গায় তো খুবই কাদা আর পিছল ছিল। কোনমতে পার হলাম। দুজন ভদ্রলোক আর চড়াই-এ উঠতে না পেরে ঘাসের উপর বসলেন। তাঁরা বললেন, ফেরার সময়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। পথের ধারে বন্যগোলাপের ঝোপ, এখনও ফুল ধরে নি। তার ফাঁকে ফাঁকে নাম-না-জানা পাখির গান শুনতে শুনতে উপরে উঠতে লাগলাম।

এক জায়গায় লেখা আছে, ঈগল্‌স্ নেস্ট্‌এ (Eagle's Nest) যাবার রাস্তা। এটা বাস্তবিক ঈগল পাখির বাসা নয়, একটা সরাইখানা। বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে খাড়া উঠতে হয়। একদম মাথায় উঠে দেখি 'Eagle's Nest' একটা ঘাসে-ছাওয়া কুটীর। তার পাশে একটা লম্বা ঢাকা বারান্দা আছে, কাচের জানালা-দেওয়া। সেটা নাকি নাচঘর (ballroom)। সেখানে খানিক্ষণ বিশ্রাম করলাম। সেখান থেকে নীচের দৃশ্য খুব ভাল দেখায়। দূরে পাহাড়ের সারি। কোন কোন পাহাড়ের বরফ সবটা এখনও গলে নি, তার উপরে বিকেলের পড়ন্ত রোদ ঝকমক করছে। নীচে সহর, সারি সারি বাড়িঘর, ছোট্ট ছোট্ট মোটর চলছে। ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেণ

যাচ্ছে। উপর থেকে ট্রেণটা অদ্ভুত রকমের ছোট দেখাচ্ছে। দূরে কিলায়নির পাহাড়। তার পাশে সমুদ্র, তার খানিকটা দূর ফেনময়, তারপর অসীম নীল জল ঢেউয়ের দোলায় উঠছে, নামছে। আকাশে সাগর-কপোতের ঝাঁক।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর নামতে আরম্ভ করলাম। নামতে বেশি সময় লাগল না। খানিক দূর এসে সেই দুজন ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম।

নীচে ডানলিয়ারেগামী বাস অপেক্ষা করছিল তাতে চড়লাম। বাসের সামনে বসলাম, কারণ তাতে চারধারের দৃশ্য বেশ দেখা যায়। আবার পল্লীগ্রামের রাস্তা। খানিক পর সূর্যাস্তের অপূর্ব শোভায় মন মুগ্ধ হয়ে গেল। লাল মেঘের আড়াল থেকে ঘন লাল সূর্য দেখা গেল। পাহাড়ের সারির মাথায় অনেক দূর পর্যন্ত একটা রক্তিম রেখা। লতাজটিল ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে সূর্য দেখতে দেখতে চললাম।

ক্রমশঃ বাস পরিচিত জায়গায় এল। ডকে এসে থামল। তখন দেখি, দিনের শেষে ঘাটে জাহাজ এসে লেগেছে।

ডানলিয়ারের কাছে হাউথ (Howth) নামে একটি দ্বীপ আছে। একদিন সেখানে যাওয়ার কথা হল। দুপুরবেলা ডানলিয়ারে থেকে ট্রামে করে ডাবলিন গেলাম। সেখানে হাউথগামী বাসের জন্য লম্বা 'কিউ'-এ দাঁড়াতে হল। দিনটা খুব পরিষ্কার, কিন্তু হাওয়ার জোর খুব। সুন্দর সাজানো-গোছানো শহরের মধ্য দিয়ে বাস চলল। সমুদ্রের ধারে এসে গেলাম। হাউথ ঠিক দ্বীপ নয়—উপদ্বীপ, একদিকে ভূখণ্ডের সঙ্গে খুব সরু যোগ আছে। তার দুধারে সমুদ্র থাকতে যোজকের মত সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডের ফালিটা সেতুর মত মনে হল। আমাদের হাউথে পৌঁছে দিয়ে বাস বিদায় নিল।

সেখানে ট্রামের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। খুব সুন্দর জায়গায় রেল স্টেশন। আমি গেটের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র

দেখতে লাগলাম। প্রকাণ্ড বালির চড়া, তাতে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা ধরণের সামুদ্রিক পাখি আসর জমিয়ে বসেছে। কত রকম তাদের অবোধ্য কূজন, আলাপ আর দেহ ও গ্রীবাভঙ্গী। বালির উপর জমে-থাকা অগভীর জলে তাদের ছায়া পড়েছে। উপরে নীল আকাশ, সমুদ্রে বিচিত্র রঙের ইন্দ্রজাল। মনে হয় যেন পিটার স্কট-এর আঁকা একখানি মনোমুগ্ধকর ছবি।

হু-হু করে হাওয়া বয়ে চলেছে। বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল। তারই মধ্যে আবার আমার সঙ্গীদের আইসক্রীম খাবার সখ জাগল। কোট নষ্ট হবার ভয়ে খুব সাবধানে খেতে হল, কারো কারো কোট নষ্ট হলও। শীর্ণদেহ এক ভদ্রলোক তো 'উড়ে যাচ্ছি, উড়ে যাচ্ছি' বলে হাওয়ার চোটে বেশ কিছুদূর চলে গেছেন।

ট্রাম এলে দোতলায় চড়লাম। তার মাথাটা খোলা। এতে দৃশ্য ভালো দেখা যায় বটে, কিন্তু ভীষণ শীত করে। সমস্ত গরম জামা ভেদ করে ঠাণ্ডা হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে দিল। দুধারের দৃশ্য অতি চমৎকার। পাহাড়, বন, সমুদ্র। হাল্কা কুয়াশা আর মেঘে মেশামেশি। একটু বৃষ্টি এসে আরও শীত বাড়িয়ে দিল।

ট্রাম থামলে হাঁটা আরম্ভ করলাম। সে কী হাওয়া! সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। সিল্কের শাড়ী কোনমতে সামলে নিয়ে চললাম। কিছুদূরে ছোট একটা গোলঘরের মত ছিল, তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে একটু আশ্রয় নিলাম।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে রোদ উঠল। তখন আমরা পাহাড় বেয়ে চলতে লাগলাম সমুদ্রের কাছে যাব বলে। হাওয়া ঠেলে যাওয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। একজন আইরিশ ভদ্রলোক আমাদের দলে ছিলেন, তিনি মাঝে মাঝে পিছন ফিরে হেঁটে চলতে লাগলেন। আমি পরে পরীক্ষা করে দেখেছি, ওতে হাওয়ার প্রকোপ কম লাগে।

ক্রমে খুব সুন্দর দৃশ্য এসে গেল। শ্যামল তৃণ-তরুলতায় ঢাকা পাহাড় সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে। সামুদ্রিক পাখিগুলি পাহাড়ের ফাটলে বসে আছে। দূরে দেখা যাচ্ছে হাউথের বাড়িঘর। কুয়াশার আবরণের মধ্য দিয়ে কিলায়নির পাহাড় একটু একটু দেখা যায়। বিপরীত দিকে গেলে ডানলিয়ারে দেখতে পাওয়া যায়।

বিকেল হয়ে এল। পরিশ্রান্তও লাগছিল এতটা হেঁটে। তখন ফেরার পালা। খানিকদূর গিয়ে দেখি এক ভদ্রলোক হারিয়ে গেছেন। খোঁজ পড়ে গেল তাঁর। দোষের মধ্যে তিনি কিঞ্চিৎ স্থূল এবং সহজেই পরিশ্রান্ত হন। এক বন্ধু বললেন, 'গড়িয়ে জলে পড়ে যায়নি তো?'

যিনি নিখোঁজ, তাঁর মামাত বোন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। একথা শুনে বেচারী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। এক-একজন এক-একদিকে খুঁজতে ছুটলেন। খানিক পরে দেখি, তিনি গম্ভীর চালে আসছেন। তখন সবাইকে জড় করা আর এক ব্যাপার। জানা গেল, একটা সোজা রাস্তা দিয়ে তিনি আমাদের আগেই এসে একটা চায়ের দোকানে বিশ্রাম করছিলেন! এই নিয়ে খুব একচোট হাসাহাসি হল। ট্রামে করে সেই স্টেশনে ফিরে এলাম। সেখান থেকে ট্রেণে করে ডাবলিন।

বন্ধুরা মিলে ঠিক করলাম ডি ভ্যালেরা মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি সে সময়ে কার্যব্যপদেশে ডাবলিনের বাইরে গিয়েছিলেন বলে ইচ্ছাটা আর পূর্ণ হয়নি।

ডাবলিন শহরটি আমার এ পর্যন্ত দেখা হয়নি বিশেষ। তাই একদিন এক বান্ধবীর সঙ্গে শহরটা ভাল করে দেখতে চললাম। প্রথমে গ্রাফ্টন স্ট্রীটে (Grafton Street) টমাস্ কুকের অফিসে গিয়ে বার্থ রিজার্ভের ব্যবস্থা করে এলাম ফেরার জন্য। তারপর সহর দেখলাম।

ডাবলিন খুব সুন্দর সহর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ ও প্রশস্ত রাজপথ এর একটি বৈশিষ্ট্য। লিফে (Liffey) বলে একটি নদী আছে। ও'কনেল স্ট্রীট (O'conell Street) ডাবলিনের প্রধান রাজপথ। আয়ার্ল্যাণ্ডের "মুক্তিদাতা" ("The Liberator") নেতা ড্যানিয়েল ও'কনেল-এর নামে এর নাম হয়েছে। এই রাস্তায় তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ আছে, বড় চমৎকার। নেলসনের স্তম্ভ, পারনেল (Parnell) স্তম্ভ ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর স্তম্ভ এই রাজপথটির শোভাবর্ধন করছে।

স্টিফেন্স গ্রীন (Stephens Green) নামে একটি সুন্দর উদ্যান আছে। তার দীঘিতে হাঁস সাঁতার দিচ্ছে। কতগুলি সামুদ্রিক পাখিও তাদের সঙ্গে জটলা করছে। পার্কটা খুব বড় না হলেও ভারী চমৎকারভাবে সাজানো।

সেখান থেকে বেরিয়ে ট্রিনিটি কলেজ (Trinity College) দেখতে গেলাম। তার কাছেই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আছে, সেটা আইরিশ। ট্রিনিটি কলেজ ব্রিটেনের রাণী এলিজাবেথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনত্বের চিহ্ন এতে খুব স্পষ্ট। কলেজের সামনেই গোল্ডস্মিথ ও বার্কের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। কলেজের ভিতরে অসমান পাথর বাঁধানো পথ, বহু পুরাতন। প্রাচীনত্ব রক্ষার জন্য এ রাস্তা এরকমই রাখা হয়েছে। গ্রন্থাগারটি দেখলাম। লম্বা ধরনের আকৃতি। ভিতরটি গীর্জার মতো। কতগুলি পুরাতন জিনিসের সংগ্রহও আছে, পাটনার খোদাবক্স লাইব্রেরীর মতো। কবি শেলীর নিজের হাতের লেখা চিঠি দেখলাম, 'Affectionately Yours' (তোমার স্নেহের) বলে সই-করা। একখানি সংস্কৃত পুঁথিও দেখলাম, চিত্রশোভিত, তাতে মহিষাসুরমর্দিনীর স্তোত্র রয়েছে। দেখে আমার খুবই ভাল লাগল।

ট্রিনিটি কলেজটি এমনিতে বেশ। কিন্তু আমার বন্ধুদের কাছে এর বিষয় এত শুনেছিলাম যে, আরও বেশি কিছু দেখব

বলে আশা করেছিলাম। সেদিক দিয়ে নিরাশ হয়েছি বলতে বাধ্য হব।

ট্রিনিটি থেকে একটা হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ খেলাম। তারপর ৯নং বাসে চড়ে ফিনিক্স পার্কে (Phœnix Park) গেলাম। এ বাগানটি খুবই বড়। মধ্যে দীঘি আছে। একটি জায়গা আমার কাছে বড়ই সুন্দর লাগল। পুকুর, তার উঁচু পাড় ঘাসে ছাওয়া, তার উপর বড় বড় গাছ নত হয়ে পড়েছে। প্রথম বসন্তে কোন কোন গাছে নবীন কিশলয়ের সমারোহে স্নিগ্ধ পাটল রং ধরেছে। মাঝে মাঝে পীত ড্যাফোডিল ফুলের ঝাড়। রঙের বাহারই অপূর্ব। পার্কটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম, অনেক ছেলেমেয়ে খেলা করছিল।

পার্কের পাশেই চিড়িয়াখানা। ভাবলাম, এটাই বা বাকি থাকে কেন? ঢুকলাম, এক শিলিং করে টিকিট লাগল। খুব বড় না হলেও মন্দ নয়। দীঘিতে নানা জাতীয় পাখি সাঁতার দিচ্ছে, কিন্তু তার জল এক হাঁটু মাত্র। তবু স্রোত আছে। তীরে একটা পেঙ্গুইন পাখি গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়েছিল। বাঘ দেখতে পেলাম না, সিংহ-সিংহীর জন্য পাথরে তৈরী গুহা, সামনে খোলা জায়গা। তার সামনে একটি ছোট পরিখা। ভারতবর্ষ থেকে আমদানী-করা ভালুক খেলা করছিল। তাদের রকম দেখে মনে হ'ল, 'ভালুক জানে বাসতে ভাল'। কতগুলি জন্তুর শীতকালীন নিদ্রা তখনও শেষ হয়নি।

বাঁদরের খাঁচার সামনে এসে খুব কৌতুক অনুভব করলাম। খাঁচাটা প্রকাণ্ড, বাঁদরে ভর্তি। একটি মেয়ের দস্তানা নিয়ে একটা ছোট বাঁদর ছুট্ দিল। অনেকে তাদের ছবি তুলছিল।

একটা হাতী দেখলাম, তবে তার মহিমা বিশেষ নেই। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা হাতীর পিঠে চড়ছিল, তাকে খাওয়াচ্ছিল। হাতীটা দেখলাম ছেলেপিলে ভালোবাসে। একটা জেব্রা দেখলাম,

কতগুলি ছেলে তার মাথায় হাত বুলোচ্ছিল। একটি বেঁটে মোটা পাদ্রী সাহেব হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললেন, 'হাত দিও না, কামড়ে দেবে।' ভদ্রলোক ছেলের পাল সামলে নিয়ে চিড়িয়াখানা ঘুরছেন। স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডের গরু ছিল, এত বিশ্রী দেখতে, প্রথমে ভেবেছিলাম বাইসনের বংশধর বুঝি। মাঝে মাঝে সামান্য বৃষ্টি হয়ে রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরি খেলা বড় উপভোগ্য লাগছিল। দিনটি ভালোই কাটল।

শুনলাম, এনিস কেরী (Ennis Kerry) নামে একটি সুন্দর জায়গা আছে ব্রে-র কাছে, সেখানে ভাইকাউণ্ট পাওয়ার্স কোর্ট-এর (Viscount Powerscourt) বিস্তৃত জমি আছে, তার দৃশ্য বড়ই সুন্দর এবং পাওয়ার্স কোর্ট ঝরণার জন্যও বেড়াবার পক্ষে লোভনীয়। একদিন একজন বন্ধুর সঙ্গে এনিস কেরীতে চললাম। ব্রে পর্যন্ত বাসে এলাম। বাস্ থেকে নেমে খোঁজ করলাম, কোথায় যেতে হবে, কতদূর যেতে হবে। মাইল তিনেক নাকি হাঁটতে হবে, ট্যাক্সি করে যাওয়াই ভালো। মাইল তিনেক তো বেশি দূর নয়। সঙ্গিনীর মুখের দিকে তাকালাম। তিনিও বললেন, হেঁটেই যাওয়া যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে শীঘ্রই ভাইকাউণ্টের জমির কাছে এসে পড়লাম। সেখানে গেটে টিকিট লাগে। পার্কের মতো জায়গা, তবে উদ্যানের মতো মানুষের হাতে-তৈরী নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে মাত্র। দেখে মনে হয়, আমাদের দেশে কত সুন্দর জায়গা আছে, সেগুলি যদি সাধারণের বেড়াবার জন্য এমনি যত্ন করে রক্ষা করা হয় তো কত ভালো হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ যে মানুষের জীবনের পরিপূর্ণতার কত বড় সহায়ক, কবে যে আমরা ভালোভাবে তা উপলব্ধি করব!

এনিস কেরীর দৃশ্য চমৎকার। ঢেউ-খেলানো পাহাড়, পাইনের বন, একটি স্বচ্ছতোয়া নদী ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে,

তার জলের উপর ফুলে-ভরা ডালগুলি নুয়ে পড়েছে। পাখি ডাকছে, শান্ত নীল আকাশ বন্ধুর প্রসন্ন দৃষ্টির মতো স্নিগ্ধ, মধুর। বনের ভিতর দিয়ে ঘোরানো পথ। মাঝে মাঝে নিশানা দেওয়া আছে, কোন্ দিকে যেতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে বেলা গড়িয়ে গেল, পথ আর ফুরোয় না। নিরাশ হয়ে গান জুড়ে দিলাম—'শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে পথের শেষে।'

যেতে যেতে বনের মধ্যে লতায় পাতায় ঘেরা ছোট্ট কুটীর নজরে পড়ল। গিয়ে দেখি, কেউ নেই। আরও খানিকদূর গিয়ে আর একটি কুটীর দেখতে পেলাম। এবার গাছের আড়াল থেকে ধোঁয়া উঠছে দেখা গেল। প্রথমে ভাবলাম, কোনও বন্য অধিবাসী নয়তো! যাই হোক, সাহসে ভর করে কাছে গিয়ে দেখি, নিতান্ত নিরীহ স্কাউট ছেলেরা ক্যাম্পিং-এ এসেছে। আমি যেতেই সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করল, কি চাই এবং সাহায্যের প্রয়োজন কি না। আমি শুধু জানতে চাইলাম, ঝরণা আর কতদূর? তারা বলল, ঝরণাটা সেখান থেকে আরও আড়াই মাইলের পথ। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই অনেকদূর হেঁটেছিলাম। নিশ্চয় ঘোরা-পথে এসেছি, এতক্ষণ মিথ্যে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েছি। যাই হোক, তখন আরও আড়াই মাইল যাবার সময় বা উৎসাহ কোনটাই ছিল না। সঙ্গিনীর আবার শরীরও বিশেষ ভালো ছিল না। হেরে গিয়ে খুবই নিরুৎসাহ লাগছিল। গাছের তলায় বসে খেজুর ও কমলালেবু খেলাম। তারপর ফেরার পালা। ক্রমে বনের মধ্যে সন্ধ্যা নেমে এল। গাছের মাথায় নীড়ে-ফেরা পাখিদের কলরব। রোদের তেজ কমার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাড়তে লাগলো। দুজনে দুটি গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে লাঠির মতো করে পথ চলতে লাগলাম। চড়াই-উৎরাইয়ে পরিশ্রমও বেশ হল। কোথায় একটা ফার্ম ছিল, তাতে গরুগুলি বিকট রবে সমস্বরে ডাকছিল,

আর তারই প্রতিধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে শোনা যাচ্ছিল। যখন পার্কের গেটের কাছে এলাম, আটটা বাজে প্রায়। গাছের তলায় পা ছড়িয়ে একটুখানি বিশ্রাম করে আটটার বাস ধরে ডানলিয়ারে চলে এলাম হতাশ ভগ্নহৃদয়ে।

এরকমভাবে পরাজিত হয়ে আমাদের জেদ চেপে গেল। তার পর দিন দুটো ট্যাক্সি করে দলশুদ্ধ গেলাম। এবার অতি সহজেই পৌঁছলাম। কিছু দূর থেকেই ঝরণার শব্দ শোনা গেল। ঝরণাটি সুন্দর, চারশ ফুট উঁচু থেকে পড়ছে। কিন্তু রাঁচির হুড্রু ইত্যাদির তুলনায় এমন কিছু নয়। তবু মন্দও নয়। একজন ভদ্রলোক তো যেখান থেকে জল পড়ছে, সেখানে চড়লেন। আমরা নীচেই ছিলাম, পাথরে পাথরে লাফালাফি করতে লাগলাম। কুলকুল করে উপলখণ্ডের উপর দিয়ে নদী বইছে, য়্যাম্বার রঙের। সে জলধারা মিল্টনের কোমাস (Comus) বইএর সুন্দরী সেব্রিণার বর্ণনা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে সেব্রিণা শীতল স্বচ্ছ জলে বসে কুমুদ ফুল জড়িয়ে বেণী রচনা করছেন, সিক্ত কেশ থেকে বিন্দু বিন্দু করে ঝরছে য়্যাম্বার রঙের জল।

তৃষ্ণা পেয়েছিল, অঞ্জলি ভরে শীতল জল আকণ্ঠ পান করলাম। শুনেছিলাম হরিণের পাল আছে এ বনে, কিন্তু জীবন্ত হরিণ দেখা হল না। পাথরের খাঁজে একটা মৃত হরিণের দেহ দেখতে পেলাম।

ফেরার পথে পাইন বনে নেমে খানিকক্ষণ বেড়ালাম। পাইন গাছের মধ্য দিয়ে হাওয়া বইলে শন্‌শন্‌ শব্দ হয়। সে দিন তাড়াতাড়িই বাড়ী ফিরে আসা সম্ভব হল।

দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডে অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক। এদের আবার নানা সম্প্রদায় আছে। বহু মঠ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এরা পরিচালনা করে। উত্তর অংশে কিন্তু রোমান ক্যাথলিকের সংখ্যা বেশি নয়। আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকগুলি

বেশ মিশুক। ভারতীয়দের সঙ্গে এদের মনের যোগও আছে। আমার তো অনেকের সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছিল। মাঝে মাঝে আমরা আইরিশ বন্ধুদের শাড়ী পরাতাম। চুলের রং গাঢ় বাদামী বা কালো হলে শাড়ীতে এদের চমৎকার মানায়। সাধারণতঃ আইরিশরা বেশ দেখতে। ইংরেজদের থেকে তফাৎ বেশ বোঝা যায়। সুগঠিত নাক, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চোখ, ঘন চুল, দীর্ঘ বলিষ্ঠ গড়ন এদের বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রায়ই এক এক বাড়িতে ৯।১০টি করে ভাইবোন দেখা যায়। ইংল্যাণ্ডের পরিবার ছোট, সাধারণতঃ ২।৩টি করে সন্তানই দেখেছি, যদিও এর ব্যতিক্রমও আছে। দরিদ্র লোক আয়ার্ল্যাণ্ডে বেশি চোখে পড়ে। ছোট ছোট ছেলেরা দেখলাম কাগজ বেচা, হাল্কা মোট বওয়া ইত্যাদি করে। ইংল্যাণ্ডে শিশু-শ্রমিকদের (child labour) খাটানো একদম নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

আয়ার্ল্যাণ্ডে খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা খুব। ইংল্যাণ্ড থেকে গিয়ে এটি খুব চোখে পড়ে। পথে ফলের দোকানে ফল ভর্তি। বাদাম পেস্তা, আখরোট ইত্যাদি মেওয়া প্রচুর। ডিমের প্রাচুর্য অনেক ইংরেজের লোভ জন্মায়। জিনিসপত্রও পাওয়া যায় যথেষ্ট। ক্যামেরা ও তৎসম্পর্কিত জিনিসপত্রও প্রচুর। মেয়েদের টয়লেটের সামগ্রীও ইংল্যাণ্ড থেকে সস্তা। যদিও কাস্টম্‌সের খুব কড়াকড়ি, তবু প্রতি বছর ছুটির সময়ে আয়ার্ল্যাণ্ড বাইরের লোকে ভর্তি হয়ে যায়। সৌন্দর্যের দিক থেকেও এর আকর্ষণ কম নয়।

এত সুবিধা সত্ত্বেও কিন্তু একটি অসুবিধা খুবই ভোগ করতে হয়। এখানে কয়লা কম। সাধারণতঃ একরকম ঘাসের চাপড়া (Turf) জ্বালিয়ে ঘর গরম করা হয়। তাতে উত্তাপ অপেক্ষা ধোঁয়াই বেশি হয়। সকাল বেলা রান্না করার জন্য বাড়ি বাড়ি খানিকটা গ্যাস সরবরাহ করা হয়, সেটুকু প্রায়ই যথেষ্ট হয় না।

আমাদের বাড়িতে কেবলমাত্র লাউঞ্জেই আগুন দিত, শোবার ঘরগুলি হিমশীতল। জল গরম করার সুবিধাও বেশি ছিল না। তাই স্নানের জন্য খুবই বেগ পেতে হত।

এর উপর আবার মাঝে মাঝে ভারতীয় খাবার রান্না করার উৎকট সখ চাপত। বন থেকে শুকনো কাঠি, পাতা ইত্যাদি কুড়িয়ে এনে রাঁধতে হত। একবার ঠিক হল, ভাত আর কপির ডাঁটার চচ্চড়ি খেতে হবে। একটি আইরিশ মেয়ের কাছে কিছু আমেরিকা থেকে আনানো চাল ছিল, তারই খানিকটা আমাদের দিয়েছিল মেয়েটি। অন্যান্য জিনিসপত্রের কিছু অভাব হয় নাই। ঘরের মধ্যের উনানে (fire-place-এ) খড়পাতার আগুনে অপূর্ব উপায়ে রান্না-করা চচ্চড়ি ভাত দিয়ে সবাই মিলে যা সুন্দর 'বন ভোজন' হয়েছিল, তার কথা বহুদিন মনে থাকবে।

আমার বাসভবনটি সমুদ্রের খুব কাছেই ছিল বলেছি। আমি প্রায়ই দুপুরে খাওয়ার পর সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতাম। একলা একলা সমুদ্রের বাঁধানো জায়গা ধরে ধরে অনেক দূরে চলে যেতাম। একটি বাতিঘর ছিল, তার কাছে বসে থাকতাম। কত সামুদ্রিক পাখি সারাদিন ধরে খেলা করত, তাদের সঙ্গে আমার একটা অন্তরঙ্গতা জন্মে গিয়েছিল। তাদের পাখায় নাচত মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণ, কাকলীতে পেতাম অসীমের আমন্ত্রণ।

এমনি করে যাবার দিন ঘনিয়ে এল। কিন্তু যাবার দুদিন আগে থেকে সুরু হল ঝোড়ো হাওয়া। আশা ছিল, যাবার দিন অপেক্ষাকৃত শান্ত হবে। কিন্তু সেদিন সকালে দেখি সাংঘাতিক অবস্থা। গাছপালা পাগলের মত করছে। সমুদ্রের ধারে গেলাম। এই কি সেই সমুদ্র! যে সমুদ্র প্রিয়বন্ধুর মতো আলাপ করেছে আমার সঙ্গে, সারাদিন ধরে শুনেছি যার কল্লোল, দুচোখ ভরে দেখেছি যার বিচিত্র রঙের খেলা! তার এরকম সর্বনাশা রূপ তো আমার কল্পনায়ও ছিল না! ধারাগুলি সব জলে ডুবে

গেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ এসে মাতামাতি করছে, ফেনায় ফেনায় অসীম জলরাশি একাকার। মাথার উপরে আকাশ ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে আছে, বাতাসের এত জোর যে, ভয় হয়, উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

আমার সত্যিই ভাবনা হল। একেই তো আইরিশ সমুদ্রের অত্যন্ত বদনাম আছে, তার ওপর এই মূর্তি! টমাস্ কুকের আপিসে গেলাম যাত্রা স্থগিত রাখতে। কিন্তু তারা বলল, আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে তাহলে, কারণ তার আগে কোনও বার্থ পাওয়া যাবে না। ছদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে যাবে বলে আমার পক্ষে সাত দিন অপেক্ষা করা সম্ভবপর হল না।

অতএব সেইদিনই বিকাল বেলা যাওয়া স্থির হল। আমার বন্ধুরা ডাবলিনের ডক পর্যন্ত এসেছিলেন। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বড়ই বিরক্তি লাগছিল। কাস্টম্‌সে জিজ্ঞাসাবাদ করেই ছেড়ে দিল।

জাহাজে চড়লাম। আমার বিছানাটা বেশ। বাইরে পরিচিত দৃশ্য ঝড় বৃষ্টি কুয়াশার জন্য রহস্যময় লাগে। জাহাজ ছাড়বামাত্র সব মেমসাহেব সামুদ্রিক পীড়ায় কাতর হয়ে পড়লেন। আমি তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম। বিছানা পেলাম বলে আমার সামুদ্রিক পীড়া হয় নি। ঘুমোলামও বেশ। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে দেখি সমুদ্র শান্ত হয়ে গেছে, জাহাজ লিভারপুলের ডকে লেগেছে, শান্ত মেঘলা আকাশে জলচর পাখির ঝাঁক।

লিভারপুলে কাস্টম্‌সের বড় কড়াকড়ি। আমার কম্বলের পুঁটলি খুলে, কতগুলি উত্তমরূপে মোড়ক করা জিনিস পেয়ে অফিসার মহা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। খুব শিকার ধরেছেন এমন ভাব করে খুলে দেখেন, একটাতে ঝিনুক ও শামুক, একটাতে নুড়ি পাথর ও আর একটাতে পাইনের ডাল। কোন্ মহামূল্য সম্পত্তি! তখন সে অফিসারের মুখটা দেখবার মতো হয়েছিল।

লিভারপুল ডক থেকে বাসে করে স্টেশনে এলাম। এখান থেকে এক ঘণ্টা পরে লীড্‌সের গাড়ি ধরলাম। যখন লীড্‌সে পৌঁছলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

এযাত্রা জলপরীদের প্রবাল দ্বীপে আতিথ্যের নিমন্ত্রণ কোনমতে অস্বীকার করতে পেরেছি বলে খুবই খুশি লাগছিল। লীড্‌সের রোমান ক্যাথলিক বন্ধু সব শুনে বলল যে, আমার কাছে সেণ্ট অ্যাণ্টনির ডাবলিনে কেনা যে ছোট্ট মূর্তিটি আছে, সেটিই আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। ওরা এটা খুব বিশ্বাস করে। যাই হোক্, নিরাপদে আসাটা যে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, তা আমি খুব উপলব্ধি করেছি।

'মরকত দ্বীপ' আয়ার্ল্যাণ্ড আমাকে এখনও টানে। আবার কোন দিন হয়তো ডাক এড়াতে না পেরে রওনা হয়ে যাব, কে জানে!



॥ চেকোশ্লোভাকিয়ায় ॥

ইউরোপে গ্রীষ্মের ছুটি অত্যন্ত উপভোগ্য সময়। শীতের শেষে তুষার যখন গলতে শুরু করে, ক্রমশঃ ফুলে ফুলে ভরে ওঠে সেদেশের আনাচ-কানাচ। শীত কিন্তু যাই-যাই করে যেন যেতে চায় না। তারপরে যখন পূর্ণ গ্রাষ্মকাল আসে, পল্লবদলে সুশোভিত, ফলে-ফুলে আনমিত বৃক্ষদলে, পাখির গানে একটি পরিপূর্ণতার আভাস পাওয়া যায়। সে সময়ে সকল কাজের বোঝা ফেলে রেখে মন চায় ঘুরে বেড়াতে। নীল আকাশে সোনালী আলোর সমারোহ, ধরণী বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত। দ্যুলোক-ভূলোকের গুণ্ঠন-মোচনের স্বল্প অবসরটুকুর মাধুর্যে হৃদয়মন ভরে নেবার জন্য এই গ্রীষ্মাবকাশ।

১৯৪৭ সালে পরীক্ষার পর জুলাই মাসে লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি হয়ে গেল। এক আলো-ঝিলিমিলি দুপুরে সেণ্ট ক্যাথারিন্সের বাগানে ফুল-বিছানো হর্সচেস্টনাট গাছের ছায়ায় বসে কোথায় যাওয়া যায় সে সম্বন্ধে বান্ধবীদের সঙ্গে আলোচনা চলল। চেকোশ্লোভাকিয়াতে নিখিল যুব উৎসবের পক্ষ থেকে ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সাদর নিমন্ত্রণ এসেছিল। অতএব, ভারতীয় ডেলিগেট হয়ে লীড্‌স্‌ থেকে অনেকেই যাচ্ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যাওয়াই শেষ পর্যন্ত স্থির হল।

উৎসবের কার্যসূচী দেখে ২৫শে জুলাই ইংল্যাণ্ড থেকে রওনা হওয়া ঠিক করলাম। কী উন্মাদনার মধ্যে সে দিনগুলি কেটেছে! অনেক বিবেচনা করে মালপত্র নিতে হল। শুনেছিলাম কন্টিনেন্টে সব জায়গায় ঠিকমত কুলি পাওয়া যায় না সুতরাং দরকার হলে নিজের জিনিসপত্র নিজেকেই বহন করতে হবে।

২৩শে জুলাইও পাসপোর্ট এসে পৌঁছাল না। টিকিট কিন্তু আগেই এসে গেছে। তখন ঠিক করলাম, রাতের ট্রেণে লণ্ডন যাব, ২৪শে তারিখে ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করতেই হবে। সেই

রাতেও হষ্টেলের বান্ধবীরা স্টেশনে এসে বিদায় দিল। তাদের মধ্যে বান্ধবী স্তেনিয়া ছিল, তার দেশের কাছাকাছি যাব বলে তার নয়ন বার-বার অশ্রুসজল হয়ে উঠছিল। আমার কানে সে একটি বাসনা জানাল—যদি পোল্যাণ্ডে যাবার সুযোগ হয়, তবে যেন সেখানকার একটু মাটি নিয়ে আসি।

গাড়িতে অনেক লোক ছিল। অধিকাংশই সৈন্য। আমাদের মনে হল, দেশে এ-রকম গোরা সৈন্যভর্তি কামরাতে রাতে ভ্রমণ করা কল্পনাতীত ছিল। এখানে কিন্তু কিছুই ভয় করে না, কারণ ভদ্রব্যবহার করতে এরা বাধ্য। পরিবেশের পরিবর্তনে কি অদ্ভুত পরিবর্তন হয় মানুষের !

সারাদিনের ক্লান্তির পর উষ্ণশয্যার মোহ ত্যাগ করা অসম্ভব বলে ইংল্যাণ্ডে রাতের আকাশ দেখার সুযোগ বিশেষ হয় নি। সে রাতের ট্রেণে বসে দেখলাম। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ এক টুকরো। দু একটি তারা। তারি নীচে স্বপ্নাতুর পৃথিবী। চকিতে কোথাও দেখা যায় ক্লান্ত দীপের আলো।

ভোর পাঁচটার সময়ে লণ্ডনের সেণ্ট প্যানক্রাস্ স্টেশনে ট্রেণ থামল। মেয়েদের ওয়েটিং রুমের বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে ঘণ্টা দেড়েক ঘুম দেওয়া গেল। তন্দ্রার মধ্যে হাতের স্পর্শে চোখ খুলে দেখি, একটি অচেনা ইংরেজ মেয়ে নিজের ওভারকোটটি আমার গায়ে সস্নেহে চাপা দিয়ে দিচ্ছে। ইংরেজ মেয়ে সাধারণতঃ বেশি কথা বলে না, অপরিচিতদের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপও করে না। কিন্তু আমার গায়ে কম্বল নেই, শেষরাতে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘুমোবার চেষ্টা করছি দেখে অপরিচিতার স্নেহসিন্ধু উদ্বেল হয়ে উঠল। অচেনা জগতকে চিনবার জন্য, মানুষের সঙ্গে পরিচয় গভীরতর করবার সেণ্ট ক্যাথারিন্সের গৃহকোণটি ছেড়ে বের হয়েছি। পথে-ঘাটে অচেনা অজানা মানুষের মধ্যে মানুষের দেবতার আসন পাতা আছে দেখে মুগ্ধ হলাম।

স্টেশনের দোকানে কফি ও কেক খেয়ে টিউবে করে এক্সিটর স্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস ব্যুরোতে গেলাম ৯টার সময়ে।

জিনিসপত্র রেখে পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে বার হলাম। আমার ছাড়পত্র এসেছে, কিন্তু সঙ্গিনীর তখনও আসে নি। ছাড়পত্র নিয়ে লয়েড্স্ ব্যাঙ্কে গেলাম। তারা জানাল, বিদেশী মুদ্রা নিতে গেলে অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টার নোটিশ লাগে। অগত্যা কেবলমাত্র ট্রাভলার্স্ চেক নিয়েই ক্ষান্ত হলাম।

সেদিন ভাগ্যে ভারতীয় খানা জুটেছিল। পরোটা, কোপ্তা, মহীশূরের ডাল, মহারাষ্ট্রের দই, সন্দেশ।

সুইজারল্যাণ্ডে যাবার ইচ্ছা থাকাতে সুইস্ ট্যুরিস্ট ট্র্যাফিক ফেডারেশনে একবার যেতে হল। পথে তৃষ্ণা অনুভব করাতে একটা হোটেলে গিয়ে লেমনেড খেলাম। সেখানে একটি বৃদ্ধ সাহেব বসে ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে অভিবাদন করে বললেন, 'তোমার জন্মের আগে আমি ভারতবর্ষে গিয়েছিলাম, চৌদ্দ বছর ছিলাম। বাঁশি বাজান ছিল আমার কাজ। শুনবে, কি সুর বাজাতাম?' বলে গান গেয়ে খানিকটা সুর শোনালেন। বিদায় নেবার সময়ে বললেন, 'তোমার দেশ আমার এখান থেকে বেশি ভাল লাগে।' বাঁশিওয়ালা বৃদ্ধের সরল হাসিমাখা প্রসন্ন মুখখানি আজও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই।

বিকালবেলা অনেক বন্ধুবান্ধব এসে পড়লেন। গানে, গল্পে, হাসিতে সময়টা অত্যন্ত আনন্দে কাটল। তারপর হৈ-চৈ করে সবাই মিলে ভারতীয় রান্না খেতে গেলাম। পরোটা, ভুরকম ডাল, নিরামিষ তরকারী, চিংড়িমাছের কালিয়া, দই।

পরদিন ২৫শে ভোর পৌনে ছটায় ঘুম ভাঙল। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে ৭টার সময়ে বাসে করে সদলবলে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে গেলাম। সেখানে মালপত্র সব একস্থানে রেখে খেতে গেলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রাতরাশ এল—অত্যন্ত তিতো

কফি, বেকন ও সসেজ। তাই কিছুটা গলাধঃকরণ করে উঠলাম। আড়াই শিলিং বিল হল, তার উপর ছয় পেনি বকশিস।

প্রত্যেকের নাম দেখে দেখে ট্রেণে উঠতে দিল। কতগুলি কামরা ভারতীয় ডেলিগেটদের জন্য রিজার্ভ করা ছিল।

পৌনে নটায় গাড়ি ছাড়ল। গ্রীষ্মকালে পল্লীগ্রামের দৃশ্য খুব সুন্দর। কোথাও আপেলের বাগান, কোথাও আঙুরের ক্ষেত। শস্যক্ষেত্রে ভূমিলক্ষ্মীর স্বর্ণাঞ্চল বিস্তৃত। বন্য চেরির সাদা ফুলে বিছানো পথ, আরণ্য-গোলাপের কাঁটাভরা ডালগুলি হাত বাড়িয়ে রয়েছে। রূপালী বার্চের নবীন পত্রসুষমা, ওকের সুমহান গাম্ভীর্য, থ্রসল পাখির ডাক, হনিসাক্‌লের সৌরভ,—সব-কিছু মিলিয়ে আনন্দভরা হৃদয়ে একটি পরিপূর্ণ ঐক্যতানের মতো বোধ হল।

সাড়ে দশটার গাড়ি ফোক্‌স্টোন বন্দরে এল। তখন চিরাচরিত প্রথায় কাস্টম্‌সে ছাড়পত্র পরীক্ষা ইত্যাদি চলল। মালপত্রে দাগ দিয়ে দিল, দেখল না কিছুই। শুধু জিজ্ঞাসা করল, অলঙ্কার নিচ্ছি নাকি! হাতের একগাছা চুড়ি সম্বল দেখে ছেড়ে দিল।

ফোকস্টোন থেকে জাহাজে করে ফ্রান্সে যেতে হবে। জাহাজের নাম 'এস-এস ক্যান্টারবেরি'। জাহাজে উঠেই ভালো করে লাঞ্চ খেয়ে নিলাম।

জাহাজের হাল খারাপ হয়ে যাওয়াতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেইখানে অপেক্ষা করতে হল। সামনেই সমুদ্র। বালুতে স্নানার্থীর ভিড়। ছেলে-মেয়েরা কুকুরের সঙ্গে খেলা করছে। আকাশে, জলে সিন্ধুপাখির ঝাঁক।

জাহাজে এক অদ্ভুত বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর নাম ভুলে গিয়েছি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'দেশ কোথায়?' বললেন, 'জন্মেছি বেলজিয়ামে, কিন্তু বিশ্বই আমার দেশ।'

জাতীয়তাবাদের গণ্ডী এঁকে বাঁধতে পারে নি। এসপারেন্টো বা বিশ্বজনীন ভাষায় ইনি সুদক্ষ। সমস্ত পৃথিবী ঘুরেছেন। ভারতবর্ষেও কন্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর। শান্তিনিকেতনে ছিলেন, কবিগুরুর সঙ্গে আলাপ ছিল। বললেন, 'Very fine man' (অতি চমৎকার লোক)! আর একজনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখলাম, তিনি মহাত্মা গান্ধী। বারবার বললেন, 'তিনি আমার প্রণম্য।' ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে এঁর জ্ঞান গভীর। এক ভারতীয় সাধুর শিষ্য হয়ে ইনি অদ্বৈতবাদ চর্চা করেছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এঁর ধারণা এই যে, এদেশ জগতকে এমন কিছু দিয়েছে ও দিতে পারে, যা অন্য কোনও দেশের পক্ষে সম্ভব নয়।

চারটার সময়ে জাহাজ ছাড়ল। ছটার সময়ে বুলোঁতে পৌঁছলাম। কাস্টম্‌সে কত টাকা নিয়েছি জিজ্ঞাসা করল। ছাড়পত্রের মধ্যে কিছু ফ্রান্সের রুটির কুপন দিয়ে দিল। আমার মোট আমাকেই বইতে হল। জাহাজ পৌঁছাতে দেরী হবে বলে বুলোঁতে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। আমাদের জন্য একটি স্পেশ্যাল ট্রেণ অপেক্ষা করছিল।

ফরাসী দেশে ঘড়ি এক ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হল, কারণ ইংল্যাণ্ডে ডাব্‌ল্‌ সামার টাইম। রাত নয়টা নাগাদ প্যারিসে পৌঁছলাম। রাতের অন্ধকারে খালি মনে হচ্ছিল—এই প্যারিস্! পথে অনেক লোক জটলা করে গান গাইছিল। মালপত্র বাসে চাপিয়ে নিজেরা হেঁটে আর একটা স্টেশনে গেলাম। প্যারিসেও ভূগর্ভাবস্থিত ট্রেণ আছে।

বাস থেকে মালপত্র সবে নামাতে আরম্ভ করা হয়েছে, এমন সময়ে অনেকগুলি ফরাসী কুলি এসে 'কুইক্, কুইক্, ট্রেণ স্তার্ত' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে এক-একটি করে মোট নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে গাড়িতে তুলল। আমরাও তাদের পিছনে প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম। সে কী ভীড়, তাড়াহুড়ো আর গোলমাল!

কোনক্রমে ঢুকলাম। ট্রেণ ছেড়ে দিলে দেখি সব ছিট্‌কে পড়েছি। ওসব দেশে ট্রেণে এক কামরা দিয়ে অন্য কামরায় যাতায়াত করা যায়। খুঁজে খুঁজে নিজেদের মালপত্র ও বন্ধুবান্ধব আবিষ্কার করা গেল।

এই ট্রেণ প্যারিস থেকে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে যাবে। বুলোঁ থেকে যে ট্রেণ প্যারিস এসেছিল, সেটা বাইরে থেকে খুব সুদর্শন না হলেও মোটের উপর আরামদায়ক ছিল। এ ট্রেণটা কিন্তু বিশেষ ভাল নয়। রাতে একটু ঠাণ্ডা ছিল বলে কম্বল ব্যবহার করতে হল। ২৬শে সকালে উঠে দেখি, নানা অসুবিধা। এককোঁটা জল নেই যে হাত-মুখ ধোব। বাথরুমের অবস্থা শোচনীয়। ইঞ্জিনের কালি ও ময়লাতে চেহারার যা শ্রী হয়েছে!

বেলা হলে একজন লোক অদ্ভুত ভাবভঙ্গী করে বুঝিয়ে দিল, জার্মানীতে গাড়ি ঢুকবে বলে ছাড়পত্র চাই। জার্মানীর সীমানা পার হলে তা ফেরৎ পাব। সব ছাড়পত্র একত্র করে তার জিম্মা করে দেওয়া হল।

আমাদের ৪৮ ঘণ্টার রসদ সঙ্গে নিতে বলা হয়েছিল। আমি একটা বড় কেক ও চকোলেট নিয়েছিলাম। ইণ্ডিয়ান স্টুডেণ্টস্ ব্যুরো থেকে সবাই-এর জন্য রুটি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল। মাঝে মাঝে খাওয়া এবং প্রত্যেক স্টেশনে জল নেওয়া হচ্ছিল। অসম্ভব গরম, একেবারে আমাদের দেশের মতো।

জার্মানীর প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর। ইংল্যাণ্ডেরও সুন্দর, তবে বিরাটত্ব এখানে বেশি। রাইন নদীর উপর দিয়ে ট্রেণ চলল। রাইন নদীর সৌন্দর্য বাস্তবিকই ইংল্যাণ্ডের যে-কোনও নদীর থেকে বেশি মনে হল। রাইনল্যাণ্ডও চমৎকার। পাহাড় ও বনশ্রী অপরূপ। বিরল জনবসতি। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, তার মধ্যে একটা করে গীর্জার চূড়া দেখা যায়। বলদে বা

ঘোড়ায় হাল চষে, গাড়ি টানে। দুধারে বার্লি, আঙুরের ক্ষেত। কোথাও কৃষক-কন্যা আঁচলে শস্য নিয়ে চলতি ট্রেণকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানায়। আপেল গাছের অত প্রাচুর্য আমি ইংল্যাণ্ডে দেখি নাই।

জার্মাণীর অতি দৈন্য দশা। অধিকাংশ স্টেশনই বোমায় নষ্ট হয়েছে, জ্বলে পুড়ে গেছে। নুরেনবার্গে বিরাট ধ্বংসস্তূপ দেখে মন আতঙ্কে পূর্ণ হয়। লোকগুলির মুখে দারিদ্র্য ও হতাশার ছাপ, পায়ে জুতো নেই।

আমাদের ট্রেণে অনেক ফরাসী যাত্রী ছিল। তারা খুব আমুদে। গানে-গল্পে সারা রাস্তা খুব জমিয়ে রেখেছিল। স্টেশনে নেমে হাত ধরাধরি করে নাচতে লাগল। সন্ধ্যার সময়ে এক জায়গায় গাড়ি কিছুক্ষণ থামল। সেটা ঠিক স্টেশন নয়। বনকুসুমে মাঠ আলো হয়ে রয়েছে। সবাই নেমে ফুলপাতা তুলে ট্রেণ সাজাল। জার্মানীর স্বচ্ছ নীল আকাশ, অরণ্যশীর্ষে চাঁদ উঠেছে, ধ্যানগম্ভীর পাহাড়ে মৌন শান্তি।

রাতে সামান্য কিছু খাওয়া হল। তারপর সবাই মিলে খুব গানের ঘটা, 'জনগণমন' 'বন্দে মাতরম্' ইত্যাদি। 'পিয়া মিলনকা জানা'ও বাদ পড়েনি।

মাঝ রাতে জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমানায় গাড়ি এল। তখন ঘুম ভাঙিয়ে ছাড়পত্র ফেরৎ দেওয়া হল। অত রাতে সে এক মহা হৈ হৈ ব্যাপার। সেখানে জার্মান ছেলেরা বিয়ারের বদলে সিগারেট চাইছিল।

২৭ তারিখে সকাল ১১টায় গাড়ি প্রাগে এল। গাড়ি স্টেশনে এলে নানাভাষায় ডেলিগেটদের স্বাগত জানিয়ে রেকর্ড বাজানো হল। ট্রেণ থেকে নেমে ঠিকঠাক হওয়া এক বিরাট কাণ্ড। যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাদের জন্য একটি বিশেষ গাড়ি এসেছিল, সেটা হাসপাতালে যাবে। যারা ক্লান্ত, তাদের জন্যও একটি গাড়ি

ছিল। মালপত্র একটা বড় গাড়িতে তুলে দিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম। যারা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল, তারা প্রস্তাব করল খুব কাছে একটা রেস্তোরাঁ আছে, আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। আমরা এত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত ছিলাম যে, খাওয়ার কথায় মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। খাওয়া কিন্তু কপালে ছিল না। এদের দূরত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নেই। বেশ খানিকদূর হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখি রেস্তোরাঁ বন্ধ, বোধ হয় রবিবার বলে। তখন ভগ্নহৃদয়ে ক্লান্তচরণে হেঁটে ল্যাজারাস্কা জিমনেশিয়াম বলে একটা স্কুল বাড়িতে যেতে হল।

প্রকাণ্ড প্রাসাদ। সেখানে কিউএ ঘণ্টা তিনেক দাঁড়াতে হল। একবার জল খেতে পেলাম, কিন্তু ধাক্কা লেগে ফ্লাস্কটা গেল ভেঙে। যত ডেলিগেট সেদিন এসেছিল তাদের নাম রেজিস্ট্রি করা হচ্ছিল। এতে প্রচুর সময় গেল।

বিকালে ছাড়া পেলাম। এই স্কুল বাড়ি এখন বন্ধ আছে, তাই আমাদের থাকবার জন্য ঠিক করা হয়েছে। এক ঘরে বোধ হয় গোটা পঞ্চাশ বিছানা। শক্ত খড়ের বালিশ। বিছানার চাদরটা অপরিষ্কার মনে হওয়ায় সরিয়ে রেখে একটা শাড়ীই তুপাট করে পাতলাম। স্নানের ঘরে ঢুকে দেখি অবাক কাণ্ড! প্রকাণ্ড ঘর, সারি সারি ধারাযন্ত্র। ইউরোপের নানা জায়গা থেকে মেয়েরা এসেছে, সবাই সম্পুর্ণ নিরাবরণ হয়ে অসঙ্কোচে এক সঙ্গে স্নান করছে। কোনমতে স্নান সারলাম। স্নানের পর একটা ক্যান্টিনে খেতে গেলাম। যুব-উৎসবের পক্ষ থেকেই এখানে খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নানা দেশের পতাকা দিয়ে সাজান ঘর। খাবার টেবিলে শসার প্রাচুর্য। এটা ইংল্যাণ্ডে দেখি নাই। খাওয়ার পর অনুভব করলাম সাংঘাতিক ক্লান্তি।

নিখিল যুব-উৎসবের প্রকাণ্ড কার্যসূচী। রোজই সব সময়েই কিছু না কিছু থাকে। সেদিন একটা ইতালীয়ান ব্যালে ছিল।

সন্ধ্যাবেলায় সেটা দেখার প্রস্তাব হওয়াতে বন্ধুদের সঙ্গে বের হলাম, কিন্তু জায়গা না চেনাতে শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হয়ে উঠল না। অনেক ইতালীয়ানের সঙ্গে আলাপ হল। সেদিন তাদের একটা প্যারেড ছিল। বর্মপরা যোদ্ধার বেশে তারা এসেছিল। তাদের সঙ্গে ভারতীয়েরা মিলে ছবি তোলান হল।

এইখানে প্রসঙ্গতঃ নিখিল যুব উৎসবের সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। বিশ্বের পটভূমিকায় নিজের স্থান নির্ধারণ করে সকলকে বুঝতে চেষ্টা করা বিশ্বশান্তির পথ সুগম করে। তাই এই উৎসবে নানা দেশের লোক এসেছিল, তাদের জাতীয় কৃষ্টিসম্পদ নিয়ে। বাহাত্তরটি বিভিন্ন জাতি এই উৎসবে যোগ দিয়েছিল। ইউ এন ও এবং ইউনেস্কোর সঙ্গে এর যোগ আছে। একটি গ্রন্থাগার সাজানো হয়েছিল, সেখানে যে কেউ নিজের দেশের একটি বই দান করতে পারে এবং তার পরিবর্তে বেছে নিতে পারে অন্য দেশের অন্য কারো দেওয়া একটি বই। বইএর ভিতরে দাতার নাম, ঠিকানা এবং একটি অভিনন্দন বার্তা থাকে। কয়েকটি প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে গ্রেটবৃটেন, চীন, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, ইতালী, ভিয়েৎনাম ও ভারতবর্ষ যোগদান করেছিল। এগুলি খুবই শিক্ষাপ্রদ। এর মধ্যে তিনটি প্রদর্শনী ইউনেস্কো প্রেরিত। ইউ এন ও এবং ইউনেস্কোর প্রতিনিধিরা বক্তৃতাও দিতেন। ফিল্ম, প্রদর্শনী, ক্যাম্পফায়ার, কর্মীসংঘ কর্তৃক আলোচনা গোষ্ঠী স্থাপন, লোকনৃত্য অভিনয়, নাচগান, খেলাধূলা, প্যারেড, ঐক্যতান, ভ্রমণ চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত স্থান দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে কর্মসূচী বিভক্ত। অনেকগুলি বড় বাড়ি থিয়েটার হল, স্টেডিয়াম, মাঠ ইত্যাদি এজন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।

বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে তাঁদের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা ও মর্জির উপর এত নির্ভর করে থাকতে হয় যে, দ্বিতীয় দিন

থেকেই আমি স্বতন্ত্র পথ ধরলাম। একাই বার হতাম, যেখানে যাবার, একাই যেতাম। ল্যাজারাস্কাতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল। তাই সব ভারতীয়রা কয়েকদিন পরে অন্য একটা বাড়িতে উঠে এলেন। এটা একটা কলেজের হস্টেল, গ্রীষ্মের ছুটির জন্য বন্ধ ছিল। আমার ভাগ্যে তেতলায় একটি সম্পূর্ণ ঘর জুটেছিল। তার সঙ্গে লাগানো স্নানের ঘর। অত্যন্ত আরামে ছিলাম। সকালে উঠে ক্যান্টিনে ব্রেকফাস্ট খেতাম। তাতে কিন্তু পেট ভরত না। কন্টিনেন্টের লোক সকালে বিশেষ কিছু খায় না। আমাকে তো রোজই ফল কিনে পেট ভরাতে হত। রোজ খাবার সময়ে কালো অদ্ভুত স্বাদযুক্ত এক রকম জলীয় পদার্থ 'কফি' বলে দেওয়া হত। একবার আমি একটি চেক ছেলেকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'তোমরা এই কফি কিভাবে তৈরী কর ?' চটপট জবাব এল, 'সব কিছু মিশিয়ে।' সব কিছুটা যে কি, তা আর জিজ্ঞাসা করতে আমার সাহসে কুলায় নি।

দুপুর বেলাতেও ক্যান্টিনে গিয়ে খাওয়া। চেকদের রন্ধন-প্রণালী ইংরেজদের থেকে আলাদা। চেকরা এক রকম পিঠে তৈরী করত, তার মধ্যে এত স্পিরিটের গন্ধ যে কোনদিন মুখে দিতে পারি নাই। ছোট ছোট শশা ভিনিগারে ভিজিয়ে এক অদ্ভুত খাবার তৈরী করত, তা সবাই খুব সুস্বাদু বলে খেত, আমার কিন্তু ভালো লাগত না। একবার আঝাল পাহাড়ী লঙ্কার তরকারী খেয়েছিলাম, সেটা আমার বেশ লেগেছিল। প্রতিবারই খাবার সঙ্গে বিয়ার দিত। তার বদল জল চাইলে বলত, 'জল খেলে টাইফয়েড হবে।' প্রথম দিন একথা শুনে ম্লান মুখে বসে আছি দেখে এক ইতালীয়ান বৃষস্কন্ধ সাহেব বলল, 'বিয়ারটা খাবে না ?' আমি মাথা নাড়তেই 'আমাকে দাও' বলে সেই প্রকাণ্ড মগটা এক চুমুকে সাবাড় করে দিল। অনেক ভারতীয় ভদ্রলোকই যে কি পরিমাণ বিয়ার উদরস্থ করতে পারেন তা প্রাগে আসার আগে

আমার জানা ছিল না। কোন কোন মহিলাও বাদ যেতেন না দেখেছি। আমি জল বা মদের পরিবর্তে লিমোনাদ (লেমোনেড) চাইতাম, তা প্রচুর মিলত।

সন্ধ্যা হতে না হতে, রাত্রের ডিনার খেয়ে নাচগান অভিনয় কিছু একটা দেখা যায়। একদিন সন্ধ্যাবেলা খেতে বসে একটি লালিমা পাল (পুং) মার্কা ভারতীয় ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। আমি এতদিন বিলেতে এসেও বলনাচ দেখি নাই শুনে অকৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তখন আমারও জীবনে ধিক্কার এল। ভাবলাম, এমন জিনিসটা এতদিন দেখি নি ? এক সন্ধ্যায় দেখতে গেলাম। সত্যি বলতে কি, বলনাচ দেখে আমি হতাশ হয়েছি। স্ত্রী-পুরুষে একসঙ্গে লোকনৃত্য করে, নানা দেশের লোকনৃত্য প্রাগে এসেই আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। খুবই উপভোগ করেছি সেগুলি। কিন্তু এ নাচে কোনও শ্রী আমি পেলাম না। কেন যে এ নিয়ে লোকে এত হৈ হৈ করে বুঝলাম না।

প্রথম দিনের ইতালীয়ান ব্যালে না দেখতে পাওয়ার দুঃখ আর একদিন মিটিয়ে ছিলাম। ভিনোহ্রাদি থিয়েটার (Vinohrady Theatre) ইতালীয়ান ব্যালে ও অপেরা হল। এ দুটির মধ্যে তফাৎ হল এই যে, ব্যালেতে মূক নাচের ভঙ্গীতে গল্পটি অভিনয় করা হয়, আর অপেরাতে গান গেয়ে। ব্যালের গল্পটা এই— একটি মেয়ে পুরুষের ছদ্মবেশে এক নাইটকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল। সে নাইট আবার খুব যিশুভক্ত। যুদ্ধে মেয়েটি চরম আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়ল। তখন নাইট তার শিরস্ত্রাণ খুলে জল এনে মুমূর্ষুর মুখের বর্ম খুলল। খুলতেই নারীসুলভ কেশগুচ্ছ বেরিয়ে পড়ল। তখন বেচারী ভয়ানক ঘাবড়ে গেল। যাই হোক, শেষ মুহূর্তে সে মেয়েটিকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করল এবং মেয়েটিও তার পাপ স্বীকার করে (যদিও, কি পাপ বুঝলাম না) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। একটি পুরোদস্তুর মধ্যযুগীয় গল্প

অপেরার গল্পটা মজার। একজন বয়স্ক অবিবাহিত ভদ্রলোকের একটি সুন্দরী ঝি ও একটি চাকর ছিল। ঝির মতলব ছিল ভদ্রলোককে বিয়ে করা। তাই সে চাকরের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে একটা সেপাই সাজাল। তারপরে এমন ভাব দেখাল যে, সে সেপাইটিকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু সেপাইটি তাকে যন্ত্রণা দেয়। ভদ্রলোকটি সেপাইএর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য তাকে বিয়ে করতে প্রতিজ্ঞা করলেন। তখন মেয়েটি চাকরের নকল গোঁপদাড়ি টান মেরে খুলে দিল। ভদ্রলোকটি চটে গেলেও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন।

প্রায়ই সকাল দশটায় সোকোলোভনার (Sokolvna) ছোট হলে লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা হত। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, ফ্রান্স, রুমানিয়া, আলবেনিয়া, স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ভিয়েৎনাম, কোরিয়া, ভারতবর্ষ, সিংহল, যুগোশ্লাভিয়া, প্যালেষ্টাইন, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি বহু বিভিন্ন দেশের লোকনৃত্য দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের লোকনৃত্যের মধ্যে অনেক সময়েই একটা মিল দেখা যায়। কাঠিনৃত্য, ফসল কাটার নৃত্য, ফসল তোলার নৃত্য ইত্যাদি অনেক দেশেই আছে। এটা খুবই স্বাভাবিক। সাধারণ কৃষকদের নৃত্যে তাদের জীবনযাত্রা যে রূপায়িত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! পোল্যাণ্ডের ফসল কাটার একটি নৃত্য বড় মজার লেগেছিল। মাঠে দুপুরবেলায় যখন কৃষকরা বিশ্রাম করছিল তখন তাদের স্ত্রীরা বড় বড় কাঠের চামচ দিয়ে তাদের খাইয়ে দিচ্ছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার রেলগাড়ি নৃত্যটি অপরূপ হয়েছিল। বুলগেরিয়ার লোকেরা দস্যু কর্তৃক রাজকুমারী হরণ ও তার উদ্ধারমূলক একটি গল্প নৃত্যে রূপায়িত করল। গুজরাটি গর্বা নৃত্য এখানে খুব আদৃত হয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলায় নানাদেশের ঐক্যতানবাদন ও নৃত্যে নয়ন-মন পরিতৃপ্ত হত। মঙ্গোলীয়ানদের নাচ অত্যন্ত সুন্দর হয়েছিল।

ওরা যে এত উঁচুদরের নৃত্য শিল্পী তা আগে জানতাম না। অনুরূপ উপভোগ করেছিলাম রাশিয়ান ব্যালে। এ জিনিস জগদ্বিখ্যাত। সেদিন হলে তিলধারণের স্থান ছিল না। সাধারণতঃ খানিকটা রাত হলেই আমি বাড়ি চলে যেতাম কিন্তু সেদিন কি করে যে সময় কেটে গেল টের পেলাম না। যখন আসর ভাঙল, ভীড় ঠেলে নীচে এসে দেখি, অনেক রাত হয়ে গেছে। বাড়ি ফেরা মুস্কিল। খানিক দূর হেঁটে ট্রাম পাব ভাবলাম, কিন্তু ততক্ষণে ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। জনবিরল রাস্তায় খানিকটা হাঁটাহাঁটি করে শেষে উৎসবের একটা অফিসে গিয়ে অসুবিধা জানালাম। তারা বলল, ট্যাক্সি করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে খুব খরচ পড়বে। বাড়ি তো যেতেই হবে, সুতরাং তারা ট্যাক্সি ডেকে চেক-ভাষায় সব বুঝিয়ে দিল। ট্যাক্সিওয়ালা একবর্ণ ইংরেজী জানে না। রাতদুপুরে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছলাম। ভারতবর্ষ হলে অত রাতে একলা ট্যাক্সি চড়তে সাহসই হত না।

একদিন কয়েকজন ভারতীয় মিলে এখানকার ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট দেখতে গেলাম। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর লেসনি বঙ্গভাষা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। প্রতিষ্ঠানটি খুব সুন্দর সাজান। একটি চেক ছাত্র গ্রন্থাগারটি দেখালেন। এখানে সংস্কৃত বই দেখে অত্যন্ত আহ্লাদ হল। অলঙ্কার, দণ্ডনীতি, স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বহু বই আছে। দেশছাড়ার পর এত সংস্কৃত বই এই প্রথম একসঙ্গে দেখলাম। লণ্ডনের স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজটির ভিতরে ঢুকে দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। আগ্রহভরে সংস্কৃত বই দেখছি দেখে চেক ছাত্রটি জানালেন তিনি সংস্কৃত তন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করছেন।

প্রফেসর লেসনির ঘর বুদ্ধমূর্তি প্রভৃতি প্রাচ্যশিল্পকলায় ভূষিত। কে কোন্ প্রদেশ থেকে এসেছি জিজ্ঞাসা করলেন। বাংলাদেশ থেকে আসছি শুনে বাংলাভাষায় কিছু কথা বললেন। উনি

ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাঁদের ছাত্রী শুনে বৃদ্ধ অত্যন্ত খুশি হলেন। শ্রীনন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীদিলীপকুমার রায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সম্বন্ধে 'মণ্টু' 'মণ্টু' করে উল্লেখ করলেন। রবীন্দ্রনাথের লিপিকা, মুক্তধারা প্রভৃতি ইনি চেক ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এখান থেকে আমাদের দেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার কয়েক কপি উপহার পেলাম। ভূরিভোজনে তৃপ্ত হয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলাম।

প্রাগের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে আমার ভালো লাগত। খুব সুন্দর প্রাসাদ-শোভিত নগরী। স্থানীয় লোকেরা খুব অতিথি-পরায়ণ। ইংল্যাণ্ড থেকে কন্টিনেণ্টে এসে প্রথম প্রথম তাদের ভাব করবার আগ্রহ দেখে আশ্চর্য বোধ হত। আমাদের সব কিছুই এদের কাছে একটা বিস্ময়ের বস্তু। শাড়ী সম্বন্ধে কত শ্লাভ তরুণী যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে! দাক্ষিণাত্যের বান্ধবীদের সঙ্গে প্রায়ই আমরা একটা ফুলের দোকানে যেতাম। ফুলওয়ালা মহাসমারোহে আয়না সুতো ও বিভিন্ন বর্ণের ফুল এনে দিত। মদ্রদেশীয়ারা বাস্তবিক ফুলের সদ্ব্যবহার জানেন। তাঁদের কেশে পুষ্পবিন্যাস একটা লক্ষণীয় বস্তু।

এখানে পথেঘাটে সবাই সাহায্য করতে ব্যগ্র। কিন্তু কাউকে একটা কিছু জিজ্ঞাসা করলেই রাস্তায় যা ভীড় জমে যায়! সবাই মিলে কিচ্‌মিচ্‌ করে, একবর্ণও বুঝি না। চেকভাষা ছাড়া অনেকেই ফরাসীভাষা জানে। দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার শুনি, 'পার্লে ভূ ফ্রাঁসে?' অর্থাৎ, 'ফ্রেঞ্চ বলতে পার?' জার্মান প্রায় সবাই জানে, কিন্তু জার্মানীর অধীনে থেকে বহু দুঃখভোগ করেছে বলে এরা জার্মান ভাষা সহজে বলতে চায় না। ইংরেজী ভাষা খুব

দেখি আমাদের ঘিরে একটি ছোটখাট ভীড় জমে গেছে। একটি স্থূলাঙ্গিনী বৃদ্ধা একটা বড় কাটা তরমুজ আমার হাতে তুলে দিয়ে ইসারায় বললেন, 'খাও'। আমি বাংলায় বললাম, 'এখন কিনে নিয়ে যাই, বাড়িতে গিয়ে খাব।' তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। অনেক কিচিরমিচিরের মধ্যে এইটুকু আন্দাজ করলাম যে, এই তরমুজ উনি আমাকে কিনে দিলেন এবং সবাই চায় যে, আমি তাদের সামনেই এটা খাই। আমার তো অবস্থা শোচনীয়! বহুদিন পরে আমার দেশের জিনিস দেখে স্থানকাল ভুলে ট্রাম থেকে নেমে পড়ে যে কি মুস্কিলেই পড়লাম! যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রাস্তায় খেতে আমার ঐকান্তিক অনিচ্ছাটা তারা হৃদয়ঙ্গম করল। বুড়ীমাকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। তিনি আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিজের ভাষায় কত যে আশীর্বাদ করলেন। বহুদিনের ঘরছাড়া পথিক আমি, মাতৃহৃদয়ের সরল স্নেহের অভিব্যক্তি আমার সমস্ত অন্তর মাধুর্যে অভিষিক্ত করল।

এক চেক গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি তাঁর বিয়ের আংটি দেখিয়ে বললেন, 'হাসব্যান্দ ইংলিশ।' বলে স্বামীকে ধরে আনলেন। ভদ্রলোক অতি সামান্য ইংরেজী বলতে পারেন। 'মহাঋষি রামকৃষ্ণ' ও 'বিবেকানন্দের' ভক্ত। চেকভাষায় অনূদিত এঁদের সম্বন্ধে বই পড়েছেন। বললেন, 'এত বড় দর্শন আমি পৃথিবীতে আর কোথাও দেখি নাই।' মহাত্মা গান্ধী ও সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে এঁর পড়াশুনা যথেষ্ট। উপনিষদের চেক অনুবাদও পড়েছেন। তিনি আমাকে অনুরোধ জানালেন ভারতীয় ভাষায় কিছু বলতে। আমি বাংলাভাষায় প্রাগকে অভিনন্দন জানিয়ে বললাম যে, এটা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাষা। ভদ্রলোক খুশি হয়ে জানালেন যে, তাঁর বহুদিনকার একটি সাধ আমি পূর্ণ করেছি।

কতরকম লোকই যে উৎসবে দেখলাম। চেক তো আছেই, তা ছাড়া ইতালীয়া, হাঙ্গারিয়া, অষ্ট্রিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, প্যালেস্টাইন,

কোরিয়া, আফ্রিকা, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া, পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড—সব জায়গার লোক এসে হাত বাড়িয়ে অভিবাদন জানায়, ফোটো তোলে। অপরিচিত লোককে দেখে নমস্কার জানাই। তাদের কাউকে অপরিচিত লাগে না। বিশ্বের সব লোক যেন এই প্রাগের প্রাঙ্গণে জড় হয়েছে, তারা যেন সব আপনার। বন্ধনমুক্ত মনের তন্ত্রীতে বিশ্বকবির বিশ্বজনীন সুরে বাঁধা পংক্তি ক'টি ঝঙ্কার তোলে—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।"

প্রতিদিন যেন প্রিয়বন্ধুর চিঠির মতো রহস্যমধুর লাগে। আমার যে একটি বৃহত্তর সত্তা আছে, সে কথা এই যুব উৎসবে এসে বারবার উপলব্ধি করেছি।

আমাদের মনে একটা বিষয়ে দুঃখ ছিল। ব্রিটিশ কন্টিন্‌জেন্ট্ (British Contingent) হিসাবেই ভারতীয় ডেলিগেটরা গিয়েছিল। ভারতীয় পতাকা অন্যান্য পতাকার সঙ্গে স্থান পায়নি। সে দুঃখ ঘুচলো পনরই আগস্ট, ১৯৪৭-এ। এই দিনটি আমাদের চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এদিন অন্যান্য দেশের ডেলিগেটদের প্রতিনিধিদের একটা ভোজ দেওয়ার ব্যবস্থা হল। আমি প্রস্তাব করলাম, ভারতীয় পদ্ধতিতে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান হোক। প্রথমে কেউ কেউ আপত্তি করলেও অভিনবত্বের খাতিরে শেষ পর্যন্ত সবাই রাজি হল। আল্পনা দেওয়ার ইচ্ছা সফল হল না, কারণ এক হোটেলে ভোজের আয়োজন হয়েছিল। ভারত ও পাকিস্থানের পতাকা উড়ল, স্বাধীন দেশের পতাকার সঙ্গে স্থান পেল। সারাদিন আমোদ-আহ্লাদে কাটল। বিকালে নিমন্ত্রিতরা এলেন। চন্দনের অভাবে সিঁদুরের টিপ দিয়ে, ফুল দিয়ে, আতর স্প্রে করে ভারতীয় রীতিতে হাত জোড় করে নমস্কার করে তাঁদের অভ্যর্থনা করা

হল। তাঁরা সবাই মহাখুশি। রাতে ভারতীয়দের বিশেষ প্রোগ্রাম ছিল।

মাঝে মাঝে জনাকীর্ণ উৎসবমুখর রাজপথ থেকে সরে গিয়ে প্রকৃতির আশীর্বাদে মন ভরে নেবার ইচ্ছা হত। আমাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে ছিল ভল্‌তাভা নদী। তার তীরে একটি হলদে ফুলে ভরা ঝোপ ছিল আমার বড় প্রিয়। আমি তারই ছায়ায় চুপ করে বসে থাকতাম। নদীর ধারে উইলো গাছের সারি, জলের উপর ডালগুলি নুয়ে পড়েছে। গাছগুলি দেখে বারবার মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবের রতিবিলাপের দৃশ্যটি মনে হত—

'বসুধালিঙ্গিতধূসরস্তনী বিললাপ
বিকীর্ণমূর্ধজা।'

গাছের ফাঁকে ফাঁকে খেয়া নৌকার মাঝির ছোট্ট কুটীর। ছোট ছোট অর্ধনগ্ন শিশুরা প্রজাপতি ধরতে ব্যস্ত। সুনীল আকাশ। নদীতরঙ্গে আকাশের, গাছের ছায়া, রোদের ঝিলিমিলি। সবশুদ্ধ মিলিয়ে একটি অখণ্ড কবিতার মতো বোধ হত। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে চুপ করে বসে কাটিয়ে দিতাম। বন্ধুরা অনুযোগ করতেন, মাঝে মাঝে আমি কোথায় উধাও হয়ে যাই। অনেকে অনেকরকম আন্দাজও করতেন, কিন্তু হৈ চৈ করলে সেই শান্ত পরিবেশটির স্নিগ্ধশ্রী ক্ষুণ্ণ হবে মনে করে কাউকে আমি সে স্থানের সন্ধান দিই নাই।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় ভালো ভালো জায়গাগুলি দেখবার জন্য ভ্রমণের ব্যবস্থা করা নিখিল যুব উৎসবের কর্মসূচীর অঙ্গ ছিল। পূর্ব বোহিমিয়া ও ক্রকনোজ পাহাড় দেখতে যাবার জন্য একটি ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়েছিল। ৭০০ ক্রাউন চাঁদা লেগেছিল এজন্য। ভারতীয়দের মধ্যে আমি একলাই ছিলাম। আর একজন সিংহলী ভদ্রলোক ছাড়া এশিয়ার কেউ ছিলেন না। যাত্রার দিন

ভোরবেলায় একটা ছোট্ট স্নুটকেশে একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ওপলেতালা রাস্তার অফিসে গেলাম। সকাল সাড়ে সাতটায় বাস ছাড়বে বলে প্রাতরাশ খাওয়া হল না। পথে দোকানের দরজা সবে খুলছিল। কিছু বিস্কুট কিনে নিলাম। দোকানদার কিছুতেই পয়সা নিতে চাচ্ছিল না। শেষে বিস্কুটের ঠোঙাটি নিতে অস্বীকার করায় পয়সা নিতে বাধ্য হল।

ঠিক সাড়ে সাতটায় বাস ছাড়ল। প্রাগ পার হয়ে পাড়া-গাঁয়ের মধ্যে পড়লাম। মেঘলা দিন। দুধারে ক্ষেতে গরু ও ঘোড়া দিয়ে হাল চষা হচ্ছে। পাইন ও অন্যান্য গাছের বনও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। বেলা এগারটা নাগাদ হ্রাদেক ক্রালোভ (Hradec Kralove) নামে এক জায়গায় এলাম। এটা নাকি একটা আধুনিক মফঃস্বল সহর। আধুনিকত্ব অবশ্য বিশেষ কিছু নজরে পড়ল না। কফি ও কেক খেলাম, সঙ্গে আইসক্রীম। প্রাতরাশ না খাওয়ায় খিদেটা সাংঘাতিক হয়েছিল। এক ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলেন। ইনিও রামকৃষ্ণের ভক্ত। দক্ষিণেশ্বরের কথা খুব খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। এখানে দুটি গীর্জা দেখলাম। খুব মূর্তি দিয়ে সাজানো। একটি যাদুঘর আছে। একটি নদী, নাম লেবা। এখানকার লেসের কাজ খুব সুন্দর।

১টা নাগাদ চেস্কা স্কেলিস্এ (Ceska Skalice) এলাম। ছোট জায়গা, তিন হাজার লোকের বাস। বাংলা দেশের পল্লী গ্রামের মতো খোলা জায়গায় হাট বসেছে। হোটেলে লাঞ্চ খেলাম। এ হোটেলে আমিই নাকি প্রথম ভারতীয়। গাঁয়ের মাতব্বররা এসে দেখাশুনা করলেন। তারপর বেড়াতে বার হলাম। বোজেনা নেমকোভ ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত মহিলা লেখিকা। ভিয়েনায় তাঁর জন্ম হয়। বহু বই ইনি লিখেছেন। তাঁর 'বাবিচ্কা' বা 'ঠাকুরমা' সব চেয়ে বিখ্যাত বই। ১৫টি ভাষায় এ বই অনূদিত

হয়েছে, চেক ভাষায় এর ১৭০টি সংস্করণ হয়েছে। এঁর বহু স্মৃতিচিহ্ন এখানে রক্ষিত আছে। ঘন বনের মধ্য দিয়ে কাস্‌ল্‌ বলে একটি জায়গায় গেলাম, সেখানে কিছু পুরাতন ঐতিহাসিক জিনিস আছে। বাগানে ঠাকুরমা ও তাঁর নাতি-নাতনী—তাদের মূর্তি। বাচ্চাগুলি দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের কাছে কুকুর, ঠাকুরমা পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের আকাশের তারা দেখাচ্ছেন। দুধারে পাহাড়, ঘন বন, নদী বইছে, গাছ নুয়ে পড়েছে, তারি ফাঁকে ছোট্ট কুটীর, চারিদিকে সবুজের আস্তরণ—রোমান্টিক উপন্যাসের উপযুক্ত পটভূমিকাই বটে।

বিকালে আমাদের গাড়ি নাখোদে এল। এখানে একটি চমৎকার দুর্গ আছে। একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায় দুর্গ, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। দুধারে ঘন জঙ্গল। উঠতে বেশ কষ্ট হয়। দুর্গটি প্রস্তর নির্মিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৈরী হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে এর সংস্কার সাধন করা হয়। কয়েকবার হাতফেরতা হয়ে এখন অবশ্য এটি রাষ্ট্রের সম্পত্তি। এ দুর্গটি এককালে বিলাস-ব্যসনের একটি কেন্দ্রস্থল ছিল, বেশ বোঝা যায়। চতুর্দিক দামী দামী জিনিসপত্রে ভর্তি,—ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। খাবার ঘরে ট্যাপেস্ট্রির কাজ করা বিরাট বিরাট ছবি ঝুলছে। একটা ছবিতে শিকার করে মারা মস্ত হরিণ, শূকর, ময়ূর, হাঁস, মুরগী ইত্যাদির দৃশ্য। খাবার ঘরে ঐ রক্তমাখা বীভৎস ছবি যে কি করে ক্ষুধার উদ্রেক করে তা বুঝি না। ঐ দুর্গের শেষ অধিকারী নাকি ভারী নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁর প্রকাণ্ড ছবি আছে। তাঁর ছেলেমেয়েদের খেলাঘর অপূর্ব। একটি পুতুল আছে তার মধ্যে, মস্ত বড়। বিয়ের কনে সাজানো। মুখে এমন সুন্দর একটি হাসি! অমন চমৎকার পুতুল আমি জীবনে দেখি নাই। তারপর কোষাগার ও অস্ত্রাগার দেখলাম। অস্ত্রাগারে বহু দেশ-বিদেশের অস্ত্রের সংগ্রহ আছে। জার্মান, ডাচ্‌ ও চেক্‌ শিল্পীদের আঁকা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

ছবি চারদিকে টাঙানো। একটি চ্যাপেল আছে, তাতে মোমবাতি জ্বালা, গাইড সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো এবং গ্রামোফোনের মতো সুর করে সব ইতিহাস মুখস্থ বলে গেল।

দুর্গের ভিতরকার সব কিছু দেখা হলে বাইরে একটা ছোট্ট গাড়ি-বারান্দা আছে, সেখানে গেলাম। নীচে বিরাট দৃশ্য। একদিকে পাহাড়ের সারি, কোলে বাড়িঘর গ্রাম। আর একদিকে ঘন অরণ্য। সন্ধ্যা নামছে মেঘলা দিনের পরে। কী অপরূপ সবুজের স্রোত, কী ম্লান মধুর সন্ধ্যা! এত রাজৈশ্বর্যের বাহার, এত হিংসার হানাহানি, এত মদোন্মত্ততা,—সব কিছুর স্মৃতি যেন মুছে গেল এই সন্ধ্যার রূপে, কবির ভাষায় গুঞ্জন করে বললাম—

"অয়ি সন্ধ্যে, অনন্ত আকাশতলে বসে একাকিনী,
কেশ এলাইয়া
মৃদু মৃদু ওকী কথা কহিস আপন মনে
গান গেয়ে গেয়ে,
নিখিলের মুখপানে চেয়ে।"

মধ্যযুগীয় ইউরোপের দুর্গের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এত পড়েছি, চোখের সামনে তার চিহ্নও প্রচুর দেখলাম, কিন্তু এই বারান্দাটিতে দাঁড়িয়ে ঐ বনের দিকে তাকিয়ে থাকার লোভেই আমি এখানে থাকতে রাজী হতে পারি। ঘরের মধ্যে তো মানুষের কারিকুরি কত দেখলাম, সোনায়, রূপায়, রঙে বেরঙে। কিন্তু এই যে ওক বীচ পাইনের বন, ছোট ছোট ঝোপে বন্য বেরী পেকে লাল, হলদে, বেগুনী হয়ে আছে, ফার্ণের সমারোহ, এই যে নীড়ে-ফেরা ক্লান্ত পাখির শেষ রাগিণী, এই যে ঘনিয়ে আসা আঁধার,—বিধাতার হাতে গড়া এই সৌন্দর্যের প্রশান্তি যেমন মনকে মুগ্ধ করে, তেমনি তো মানুষের হাতের কাজ করে না!

তৃপ্ত মনে, শ্রান্ত শরীরে হোটেলে ফিরে এলাম। খুব ভালো খাওয়া দিল—পাতিলেবুর টুকরো, স্যুপ, লেবুর রসে ভিজানো শসা,

কাটলেট, আলুসেদ্ধ, লেমনেড। থাকার একটি সম্পূর্ণ আলাদা ঘর, আরামদায়ক বিছানা। শোবামাত্র ঘুম।

পরদিন ভোর সাড়ে পাঁচটার সময়ে মোরগের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে প্রশান্তিতে মন ভরে উঠল। একদিকে পাহাড়ের গায়ে ঘন বন। ছোট্ট শিল্পপ্রধান সহর। শ্রমিকরা সার বেঁধে কাজে যাচ্ছে। প্রথম উষার আলো, শীতল বাতাস।

সকালে প্রাতরাশ খাওয়ার পর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। আমাদের গাইডটি বিশেষ সুবিধার নয়। পথঘাট সম্বন্ধে কিছুই অভিজ্ঞতা নেই। প্রাহা (প্রাগ) ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্র, কুড়ি বাইশ বছর বয়স, খাঁটি চেক যুবক, অর্থাৎ উল্টানো চুল, অত্যন্ত নরম চলাফেরা, গায়ে ক্রশ স্টিচের ফুলতোলা চুড়িদার সার্ট, মিন্‌মিনে কথাবার্তা, মুখে ভাঙা ভাঙা ইংরেজী কথা, না আছে সময়ের জ্ঞান, না আছে দূরত্বের জ্ঞান। শুধু শুধু বসিয়ে রেখে দেরী করে দেওয়ার জন্য পরে ভুগতে হল।

নাখোদ থেকে কিছু দূর গিয়ে বাস থামল। খারাপ আবহাওয়ার দরুণ কালকের কার্যসূচী কিছুটা বাকি ছিল। তাই আজ হ্রোনোভ-এ যাওয়া হল প্রথমে। এখানে নাকি এমেচার থিয়েটার গ্রুপের জন্য ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা আছে। সেই থিয়েটারের স্টেজ দেখতে গেলাম। আর যায় কোথায়! দেখতে দেখতে পিলপিল করে লোক জমল। গাঁয়ের মাতব্বর এসে যেই শুনলো একজন ভারতীয়ের আগমন হয়েছে, অম্‌নি সবাইকে ডেকে ডেকে ইণ্ডিচ্‌কা বলে আমাকে দেখাল। সমাদরের ঠেলায় আমি তো মহা বিব্রত! তারা বলল, 'একবার উপরে উঠে দেখো, কি রকম ব্যবস্থা।' আমি নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কোন মতে প্রাণ হাতে করে উঠলাম। নেমে এসে বাঁচি।

এই সহরে Alois Jirasek নামে এক বিখ্যাত চেক লেখকের জন্ম হয়। তাঁর লেখা নাটক অভিনয় আরম্ভ থেকেই এখানে

অভিনয়ের ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৫১ সালে এঁর জন্ম এবং মৃত্যু ১৯৩০ সালে। এঁর বসতবাড়ি দেখলাম। তারপর এঁর গোরস্থান দেখতে গেলাম। সে জায়গাটি খুব সুন্দর সাজানো। প্রত্যেক কবরেই ফুলের গাছ। এই লেখকের কবরের গাছে প্রকাণ্ড বড় সিঁদুর রঙের গোলাপ ফুটেছে। এরকম গোলাপ আমি আগে দেখি নাই। কবরে একটি মূর্তি আছে। এখানে চেকদের সঙ্গে আমার ফটো তোলা হল। গ্রামের বৃদ্ধেরা অনেক কথা বললেন, 'মহাত্মা গান্ধী' ছাড়া কিছু বুঝলাম না।

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে এডার্সব্যাচ্ (Adersbach) বলে একটা জায়গার উদ্দেশে রওনা হলাম। পথে দুধারে পাহাড়, বন, গ্রাম। গ্রামে ক্ষেত, কুটীর, পুকুরে হাঁসের কলরব। গরুবাছুর বিশেষ চরতে দেখা গেল না। জার্মানীরা চেকোশ্লোভাকিয়ার গোধন হরণ করেছিল। এদের ছেলেমেয়েরা পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ খেতে পায় না বলেই বোধ হয় ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ছেলেমেয়েদের তুলনায় রোগা।

এক জায়গায় রাস্তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। আমরা খানিক দূর একটা পথ ধরে যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম, এপথ পোল্যাণ্ডে গেছে, আমরা ভুল করেছি। তখন গাড়ি ফেরানো হল। গাড়ি ব্যাক করার সময়ে চাষীদের ছেলেমেয়েরা ভীড় করে দাঁড়াল। তাদের চোখে কৌতূহল ও বিস্ময়, মুখে আধো আধো শ্লাভ বুলি, কোলে হাঁস মুরগী চেপে ধরা, চারদিকে পোষা কুকুর ও ছাগলছানা।

Adersbach-এ এসে গাড়ি থামল। পোল্যাণ্ড এখান থেকে মাত্র পনের মিনিটের পথ। এখান থেকে আর গাড়ি যাবে না, আমাদের এবার হাঁটতে হবে। চারদিকে প্রকাণ্ড ন্যাড়া পাহাড়, নানা আকৃতির পাথরের চাঁই। এ অঞ্চলটা আগে সমুদ্রের তলায় ছিল। পায়ের তলায় বালুর আস্তরণ। পাইন এবং অন্যান্য ঝাউ-জাতীয় গাছই বেশি। এ অঞ্চলটাকে বলে দৈত্যরাজের অঞ্চল। পাথরের আকৃতি হিসাবে নানারকম নাম আছে, কোনটা

পিগমি, কোনটা পিরামিড, কোনটা দৈত্যরাজ্যের সিংহাসন, কোনটা রাণীমার সিংহাসন, কোনটা ফটক, কোনটা দুর্গ, কোনটা জেলখানা,—এইসব। এক একটা পাথর তলায় সরু, মাথা মোটা, —ভয় হয় মাথায় ভেঙে পড়বে। ফটক পেরিয়ে দৈত্যরাজের খাস রাজধানীতে ঢুকলাম। পথ কোথাও সরু, কোথাও প্রশস্ত, কোথাও সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। পায়ের তলায় নরম বালুর কার্পেট, পথের ধারে ঝোপঝাড়ে বন্য রাস্পবেরী পেকে রয়েছে, একটি ছোট্ট নদী সমানে ঝিরিঝিরি করে বইছে পথের পাশে পাশে, নদীর ধারে নতুন শ্যাওলা মেঘভাঙা রোদে মরকতমণির মতো জ্বলছে। রাস্পবেরী তুলে খেতে খেতে আমরা অগ্রসর হলাম।

এক জায়গায় একটা গুহা আছে। তার মধ্যে ঢুকে দেখি, পাশে একটা ছোট্ট জলপ্রপাত। চারদিকে ঘেরা, উপরে আকাশ দেখা যাচ্ছে, নীচে একটা খোলা জায়গা দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। ঝর্ণাটা খুবই শীর্ণ। হঠাৎ সেটা ফেঁপে ফুলে উঠল, হুড়মুড় করে জল পড়ে আমাদের দিল ভিজিয়ে। তখন কী তার গর্জন! এটা যেন দৈত্যরাজের রসিকতা হল অতিথিদের সঙ্গে।

সেই গুহা পার হয়ে পাহাড়ের গায়ে কাঠ বিছিয়ে তৈরী নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে খুব উঁচুতে উঠলাম। সবুজ পাতায় বুনো ফুলে, গুচ্ছ গুচ্ছ বেরীতে পার্বত্যশ্রী বড় সুন্দর। নামার সময়ে অন্য রাস্তা ধরলাম। নেমে দেখি, পাহাড় আর বনে ঘেরা ছোট্ট একটি হ্রদ, তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের মতো আছে। সেখানে নৌকায় চড়ে বেড়ানো হল। হ্রদের জলে পাহাড় ও বনের ছায়া টলমল করছে, গাছের ডালে নাম-না-জানা পাখির কূজন। চারিদিকে বিদেশী ভাষায় কিচিরমিচির, আমার কিন্তু মন চলে গিয়েছিল উত্তরচরিতের গোদাবরীর বর্ণনায়—

"গোদাবর্যাঃ পয়সি বিততশ্যামলানোকহশ্রী
-রন্তঃকূজন্মুখরশকুনো যত্র রম্যো বনান্তঃ।"

খানিক পরে আবার যাত্রা। বাসে ফিরে অনুভব করলাম পেটে অগ্নিদেবের তাণ্ডব-নৃত্য। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। বাসে একটি ইংরেজ ভদ্রলোক আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'কেমন লাগছে?' 'বড্ড খিদে'—সংক্ষিপ্ত উত্তর। 'আমারও। এখন কর্ণবীফ ছাড়া আর কিছু ভাবতে ভাল লাগছে না।' বেচারী সারা ফিরতি পথ কর্ণবীফের স্বপ্ন দেখতে দেখতে চললেন।

নাখোদে পৌঁছে বেলা তিনটের সময়ে লাঞ্চ খেলাম। তারপর আবার যাত্রা। জ্যান্স্কে লেজনি (Janske Lazne) বলে একটা জায়গায় এলাম। এখানে একটি কুণ্ড আছে, তার জল নাকি নানা রোগ সারায়। একটা সাজানো বাগান, তাতে বাজনা বাজছে, স্বাস্থ্যান্বেষীর ভীড়, সকলে পয়সা দিয়ে গেলাস গেলাস জল কিনে খাচ্ছে। আমার রোগ সারানোর প্রয়োজন ছিল না, আমি লেমনেড ও চমৎকার আইসক্রীম খেলাম।

সেখানে একটা তারে ঝোলা রেলগাড়ি আছে, তাতে চড়ে পাহাড়ের মাথায় যাওয়া যায়। আমরা সিঁড়ি দিয়ে স্টেশনে চড়লাম। সেখানে আবার সিঁড়ি আছে, তাতে গাড়ি এসে লাগে। ইলেকট্রিকের তার ক্রমাগত কাঁপছিল। ট্রেণ এল, ছোট্ট ট্রামের মতো দেখতে। চড়ার পর কনডাক্টার চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করল। ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শীত করতে লাগল। কোট পরতে হল। মাঝে মাঝে থাম আছে। ক্রমশঃ গাড়ি ওপরে উঠতে লাগল। নীচে ঘন পাইনের বনে ঢাকা পাহাড়, মাঝে মাঝে পায়ে চলা সরু পথ। পাহাড়ের গায়ে কোথাও কুয়াশার আবরণ, কোথাও রোদ, কোথাও বন, কোথাও ক্ষেত, কোথাও ঝোপ, কোথাও বনস্পতি।

পাহাড়ের নাম কার্ণা হোরা (Cerna Hora), তার শিখরদেশে একটা হোটেল। চারিদিকে কুয়াশা ও মেঘ। সেখানে বিকালের রুটি ও কফি খাওয়া হল, তখন সন্ধ্যা আটটা। অবশ্য, তখনও আকাশে আলো ছিল।

ঝোলানো ট্রেণে চড়ে নামাটা খুব উপভোগ্য হল। ততক্ষণে সূর্য অস্ত গিয়েছিল। গোলাপী আকাশ। কালো পাইন বনে সন্ধ্যা নামছে।

বাসে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা নটা। ফিরতি পথে ঘন অন্ধকার। মেঘের ফাঁকে সপ্তর্ষির দেখা পেলাম। বহুদিন পরে যেমন বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বহুদিনের ছেড়ে আসা বাংলাদেশের গৃহকোণে আমার বাতায়নটির কথা মনে পড়ল।

প্রাগে যখন বাস পৌঁছল তখন রাত চারটে। হেঁটেই বাকি পথ যেতে হল। বাড়ি দূরে হওয়ায় সঙ্গীদের সঙ্গে একটা অন্য হস্টেলেই গেলাম। রাস্তায় দু-একটা মাতাল ছাড়া কেউ নেই। যখন গন্তব্য স্থানে পৌঁছলাম, তখন ভোর পাঁচটা, আকাশে আলো ফুটছে।

এর পরে আর একদিন আমরা আর একটা ভ্রমণে গিয়েছিলাম। তাতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল, সেডলেক (Sedlec) বলে একটা জায়গায় একটি গীর্জা। এখানকার এক অংশ মনুষ্যকঙ্কালে সুসজ্জিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন একটি যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মৃত সৈনিকদের হাড় দিয়ে নানাভাবে ভিতরটা সাজানো, দেখলে সভ্যতার প্রতি বিতৃষ্ণা এসে যায়।

এম্‌নি করে দিন কাটিয়ে সুন্দরী প্রাহার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে এল। টুকিটাকি অনেক জিনিস সংগ্রহ করেছিলাম। প্রাগ খুব ভালো শপিং-সেণ্টার। হাতে কাজ করা ব্লাউস, পলকাটা ফুলতোলা কাঁচের বাসন, কাঁচের খেলনা, ছবি, এলবাম ইত্যাদিতে বাক্স ভরে উঠল। প্রাগ থেকে প্যারিসে যাওয়ার কর্মসূচী থাকায় এক বিকালে উৎসবমুখরা নগরীকে পিছনে ফেলে আবার যাত্রা শুরু করলাম সুদূরের টানে।

॥ ফ্রান্সে ও সুইজারল্যাণ্ডে ॥

প্রাগ থেকে যখন প্যারিসে পৌঁছলাম তখন রাত সাড়ে বারটা। যে ঠিকানায় আমাদের যাবার কথা ছিল সেটা কোনদিকে, সেখানে কিভাবে এত রাতে যাওয়া যায়, এইসব আলোচনা করতে করতে একটা বেজে গেল। তখন সভয়ে দেখি স্টেশনের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। শুনলাম, এই নাকি নিয়ম। ভাবলাম, ওয়েটিংরুমে রাত কাটানো যাবে। কিন্তু তারও দরজায় তালা পড়ল। আমাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা দেখে স্টেশনমাস্টার এগিয়ে এসে বললেন, 'প্ল্যাট্‌ফর্‌মে একটা খালি ট্রেণ দাঁড়িয়ে আছে, তাতে শুয়ে থাকুন, ভোর ছটায় স্টেশন খুলব, তখন সঙ্গে লোক দেব, পথ দেখিয়ে দেবে।' আমাদের দলে পাঁচজন ভদ্রলোক ও তিনজন মহিলা। ভদ্রলোকরা আমাদের নিরাপত্তাসূচক নানা কথা বলে আশ্বস্ত করার বৃথা চেষ্টা করে প্ল্যাট্‌ফর্‌মে শুলেন। আমরা মেয়েরা ট্রেণের একটা খালি কামরায় শুয়ে সমস্ত রাত গজ্‌গজ্‌ করতে লাগলাম, একফোঁটাও ঘুমোতে পারি নি। অমন অস্বস্তিকর পরিবেশে ঘুম আসে কখনও। ভোর পাঁচটায় উঠে হাতমুখ ধুলাম।

তারপরে বহু হাঙ্গামা করে সকাল সাড়ে আটটায় প্যারিসের উপকণ্ঠে এক ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে পৌঁছলাম। সেখানে মস্ত বড় জায়গা জুড়ে অনেকগুলি তাঁবু ফেলা আছে। আমাদের নাকি এখানে শিবিরজীবন যাপন করার ব্যবস্থা হয়েছে। যারা এই ব্যবস্থা করেছে, মনে মনে তাদের কিঞ্চিৎ মুণ্ডপাত করলাম, অবশ্য এর পরেও সারাদিন ধরে তাদের আরও পঞ্চাশবার গর্দানা নেবার মতো ঘটনা ঘটেছে।

শিবিরের কর্মকর্তারা খুব প্রশান্তবদনে বললেন, সত্য বটে এখানেই জায়গা ঠিক হয়েছিল, কিন্তু আজ সকালেই এক পাল

স্কুলের বাচ্চারা ক্যাম্পিং করতে এসে পড়েছে বলে এখন জায়গা দেওয়া অসম্ভব, তার জন্য এরা খুবই দুঃখিত কিন্তু নিরুপায়... ইত্যাদি। যখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'টেলিগ্রাম পেয়েছেন কি না', একবার এদিকে একবার ওদিকে ঘাড় নাড়ে। অবশেষে অনেক বেলায় অতি কুচ্ছিৎ চেহারার কোকো ও গোয়াবাগানের উড়ের দোকানের লেড়ি বিস্কুটের মতো শক্ত রুটি একটুকরো করে দিল।

আমরা তখন খুব চেঁচোমেচি করাতে ওরা দন্তবিকশিত করে হাসতে হাসতে বলল, 'দুপুর বেলায় একটা বাস আসবে তাতে চড়ে তোমরা প্যারিসে ফেরত যেও।' বেলা সাড়ে এগারটা পর্যন্ত গাছের তলায় বসে রইলাম। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলি ক্ষুদে বাঁদরের মতো এদিক ওদিক লাফাতে লাগল। এক একবার এসে আমাদের দেখেও গেল, যেন কি আজব জানোয়ার আমরা। কাঠকুটোর আগুনে আলু গাজর মুরগীর ঠ্যাং সেদ্ধ হতে লাগল মাঠের মধ্যে, আমাদেরই নাকের সামনে।

সাড়ে এগারটায় বাস এলে সেই নির্লজ্জদের আস্তানা ছেড়ে আমরা প্যারিসে রওনা হলাম। রাস্তার দৃশ্য মোটামুটি ভালোই, যদিও দেখবার আগ্রহ তখন বিশেষ ছিল না। এর মধ্যে আবার হঠাৎ ঘ্যাঁচ্ করে বাস থেমে গেল। সকলের সমস্বরে চীৎকার। দেখি একজন লোক নেমে দৌড়োতে লাগল, এবং একটু পরে একটা ইয়া বড় ছাইরঙের হুলো বিড়ালকে দুহাতে বাগিয়ে ধরে নিয়ে এল। বুঝলাম, তার গিন্নীর বেতের ঝাঁপির মধ্যে বিড়ালটা বন্ধ করা ছিল। বন্দীদশা পছন্দ না হওয়ায় বুড়িয়ার নিদ্রাকর্ষণের সুযোগ নিয়ে সে ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড় মেরেছিল। আবার বন্দী হয়ে সে বিকটস্বরে অনেকক্ষণ ধরে ম্যাও ম্যাও করে আপত্তি জানাতে লাগল। বাসের লোকেরা এই ব্যাপার নিয়ে খুব হাসাহাসি করল, আর বিড়ালের মালিকনী মিঠে মিঠে ফরাসী ভাষায়

খুব সম্ভব নানাবিধ সোহাগসূচক কথা বিড়ালটাকে শোনাতে লাগল।

যুব উৎসবের ডেলিগেটরা ফ্রান্সে গেলে যাদের ব্যবস্থা করার কথা, প্যারিসে তাদের অফিসে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা তিনটে। সেখানকার লোকগুলির ব্যবহারও পূর্ববৎ। তারা বলল, 'আমরা কিছু জানি না, ওদেরই আপনাদের জায়গা দেবার কথা।' টেলিগ্রামের কথা এরা স্রেফ অস্বীকার করল। তখন ধৈর্যের শেষ সীমায় আমরা পৌঁছে গেছি। আমি বললাম, 'জানি না বললে হবে না। দোষ আর যারই হোক, আমাদের নয়। আমরা সেজন্য কষ্ট পাব কেন? আর, কষ্ট সহ্য করারও একটা সীমা আছে। হয় একটা হোটেল খুঁজে দিন, নয়তো আপনাদের অফিসের এই বাড়িতেই আমরা থাকবো।' তারা যখন দেখল সত্যিই আমরা তাদের অফিসে আড্ডা গাড়ার মতলব করেছি, তখন বাধ্য হয়ে একটা হোটেল ঠিক করে দিল।

অসম্ভব গরম, ট্রেণের কালি, ক্লান্তি, না ঘুম, ও না খাওয়া, সব মিলে মনে হচ্ছিল বুঝি দফা শেষ করে দেবে। হোটেলে গিয়ে স্নান করে এক পেট খেলাম। খাবারের দাম অবশ্য খুব বেশি নিয়েছিল। তাহলেও, খাবার পরে মনে হল সমস্ত শরীর বেয়ে আরামের স্রোত নামছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের ঋষিবাক্য 'অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ' কথাটা অত্যন্ত ঠিক। তাজা বোধ করে অন্যদিকে নজর দিলাম। দেখি, সাধারণ হোটেল, কিন্তু ব্যবস্থায় বিলাসিতার চূড়ান্ত। ঘরের চতুর্দিকে আয়না দেওয়া, যেন মোগল নবাবদের শিশমহল। নরম কার্পেটে মোড়া মেঝে, মস্ত গদিওয়ালা পালঙ্ক। খুব ঘুমিয়ে সব ক্লান্তি দূর হল।

পরদিন সারাদিন ধরে প্যারিস দেখলাম। এভাবে রোজই ভ্রমণকারীদের দেখাবার ব্যবস্থা থাকে। অবশ্য আমার মনে হয় বড্ড তাড়াহুড়ো করে দেখানো হয় এতে। সকালে আধুনিক

প্যারিস, বিকালে ঐতিহাসিক ভার্সাই। অবশ্য, আধুনিক প্যারিসেও ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য অনেক কিছু আছে। ইফেল টাওয়ার, মৃত বীরদের স্মৃতিতে আর্ক অব ট্রায়াম্ফ, সীন নদীর সেতু, কংকর্ড প্লেস, অপেরা হাউস, টাউন হল, ম্যাদ্‌লীন চার্চ প্রভৃতি অনেক কিছু বিদ্যুদ্বেগে দেখানো হল। নোতর্‌দামের গীর্জাটি আমার খুব ভালো লেগেছিল। লুভ্‌ মিউজিয়াম এবং নেপো-লিয়নের সমাধিক্ষেত্র সেদিন বন্ধ ছিল বলে দেখা যায় নি। সেই বাস্তিলের দুর্গের কথা, সেই ফরাসী বিপ্লবের রক্তাক্ত দিনগুলি, সেই দুই সহরের গল্প (A Tale of Two Cities), সেই ডুমার বইগুলি—সব মনের মধ্যে ভীড় করে এল। ভার্সাইএ সুন্দরী রাণী মেরী অ্যান্টয়নেট যে ঘরে থাকতেন, রাজাদের বিলাসসমৃদ্ধ রাজপ্রাসাদ, যে সিঁড়ি দিয়ে উঠে রাজপরিবারকে বিদ্রোহীরা বন্দী করেছিল, সব দেখলাম। ভার্সাইতে ফরাসীদের উদ্যানরচনার বহু নিদর্শন আছে।

প্যারিসের ভাস্কর্য অপূর্ব। আমি ইতালীতে যাই নি, শুনেছি, সেখানকার কাজও জগদ্বিখ্যাত। প্যারিসের এক একটি পাথরের মূর্তি এমন জীবন্ত, মনে হয় এই বুঝি কথা কয়ে উঠবে। তবে, রাস্তাঘাট খুব বিবর্ণ মনে হল। লোকরা এত হৈচৈ করে, দেখে জীবন সম্বন্ধে বেপরোয়া মনে হয়।

সন্ধ্যাবেলায় হোটেলের ম্যানেজার 'ফলি বার্জেয়ার' নামে একটি থিয়েটার হলের টিকিট কেটে দিল, এটির অনুষ্ঠান নাকি খুবই ভালো আর বিখ্যাত। স্টেজ সাজানোর খুব বাহাদুরি আছে, জাঁকজমকও খুব। এমন কায়দা অন্যত্র দেখি নি। তবে এছাড়া আরও অনেক কিছু দেখাল, প্যারিসের নৈশজীবনের সঙ্গে যার যথেষ্ট মিল আছে। এই জন্যই হয়তো ম্যানেজার মহাশয়ের এত ভালো লেগেছিল।

দিনের প্যারিসের সঙ্গে রাতের প্যারিসের পার্থক্য যথেষ্ট। দিনের প্যারিস বর্ণহীন, স্বাদহীন, যাকে বলে dull, লোকগুলি

নিরর্থক হৈচৈ করছে। রাতের প্যারিস আলোকমালায় সুসজ্জিত, বহু রাত পর্যন্ত রাস্তা তখন সরগরম, সুবেশ নরনারীর হাসি কোলাহলে মুখরিত, জীবনের উৎকট আনন্দের শেষ বিন্দুটুকুও তীব্র সুরার মতোই পান করে সব যেন উন্মত্ত। চতুর্দিকে কৃত্রিমতার চূড়ান্ত প্রকাশ। আর্টিফিশিয়ালিটিকে আর্টএর পর্যায়ে উন্নীত করাই যেন এদের সাধনা। থুত্থুরে বৃদ্ধাকেও দেখেছি ষোড়শী তরুণীর সাজে সজ্জিতা। বার্দ্ধক্যের যে একটি শান্ত সমাহিত সৌন্দর্য থাকে, সেটা নজরে পড়ল না। এক বৃদ্ধার মাথায় দেখেছিলাম একটা জাহাজের বেশ বড়সড় মডেল টুপি হিসাবে পরা। সেটা পরার শারীরিক কষ্ট সৌন্দর্যের খাতিরেই বেচারীকে সহ্য করতে হয়েছে। আর একজনের মাথার টুপিটা দেখেছি পাখির বাসার মতো, তাতে একটি খেলার পাখি ডিমে তা দিচ্ছে। উৎকৃষ্ট পুষ্পাসারের বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, উৎকৃষ্টতর ফরাসী সুরা এবং তার চেয়েও মাদকতাময়ী সুন্দরীর অভাব প্যারিসে নেই। অল্পই দেখেছি প্যারিসকে, তবে যতটুকু দেখেছি, মনে হয়েছে, যে ভোগ করতে চায় সে এখানে যযাতির মতো দশ হাজার বছরের যৌবন নিয়ে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে, পকেটে যথেষ্ট ফ্রাঙ্ক থাকলেই হল।

প্যারিস থেকে তারপর দিন গেলাম সুইজারল্যাণ্ডের জেনীভাতে। যাওয়ার সময়ে দেখি যে টিকিট কাটা হয়েছে আমাদের জন্য, তাতে সিট রিজার্ভ করা নেই। বহু কষ্টে টিকিট পরিবর্তন করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে জায়গা পেলাম।

জেনীভাতেও মোটরবাসে করে ঘুরিয়ে সব দেখানো হল। অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর। আন্তর্জাতিক মৈত্রীর জন্য জেনীভা বিখ্যাত। জেনীভার ইতিহাস স্বাধীনতা রক্ষার অদম্য প্রয়াসের ইতিহাস।

প্যারিসের মতোই ঝড়ের বেগে অনেক কিছু দেখানো হল। মনুমেন্ট অব রিফর্মেশান, ইউনাইটেড নেশন্‌স্ প্যালেস, রুশো

মিউজিয়াম, টাউনহল, সেণ্ট পিটারের গীর্জা প্রভৃতি দেখলাম। লেকের নীল জলে সাদা ধব্‌ধবে রাজহাঁসের খেলা অত্যন্ত নয়নমুগ্ধকর দৃশ্য। ঘড়ি, নানাবিধ পোশাক, বিচিত্র ছাতা, অতি উৎকৃষ্ট ছবি প্রভৃতি বহু জিনিস এখানে কিনতে পাওয়া যায়। অনেকেই অনেক কিছু খরিদ করলেন, আমার কাছে সুইস মুদ্রা কম থাকাতে বিশেষ কিছু কিনতে পারি নি।

তারপর দিন আলপ্‌স্‌ পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো হল। সারাদিন হৈচৈ করে বিকালে রোশার ডি নে (Rochers de Naye) বলে একটা জায়গায় গেলাম। সেটা আলপ্‌স্‌ পাহাড়ের একটি চূড়ায়। আমরা বিকালে যে হোটেলে বসে চা খেলাম সেটি প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। খাওয়ার পর পাহাড়ে বেড়ালাম। এমন সুন্দর দৃশ্য যে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পাহাড়ের নীচে জেনীভা হ্রদ—বিরাট, ঘন নীল। তার উপরে মেঘ ঝুঁকে আছে। পাহাড়ের গায়ে ঘন কুয়াশা। তার মধ্যে গরু চরছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু মাঝে মাঝে তাদের গলার ঘণ্টার মিষ্টি টুংটাং আওয়াজ পাচ্ছি, ডাকও শুনছি।

তারপর দিন জুরিখে (Jurich) গেলাম। কিন্তু শরীরটা ঠিক ছিল না বলে আমি বিশ্রাম নিলাম হোটেলে, আর সবাই বেড়াতে গেলেন। হোটেলটা খুব সুন্দর, জানালা দিয়ে অতি মনোহর সহরের দৃশ্য চোখে পড়ে। খাওয়া খুব ভালো দিয়েছিল। সুইজারল্যাণ্ডের মতো চমৎকার আইসক্রীম আর চকোলেট আমি অন্য কোথাও খাই নাই।

হাতে সময় ও অর্থ দুই অত্যন্ত কম থাকাতে তাড়াতাড়ি ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসতে হল। এসে কিছুদিন পর্যন্ত হর্সফোর্থের সৌন্দর্য অত্যন্ত ম্লান মনে হয়েছিল। সুইজারল্যাণ্ডে যতটা দেখব মনে করেছিলাম ততটা হয় নি, আবার যাবার বাসনা নিয়েই চলে আসতে হয়েছে।

॥ স্কটল্যাণ্ডে ॥

১৯৪৭ এর নভেম্বর। লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ থেকে আমাদের ক্লাসের চারজন ভারতীয় ছাত্রছাত্রীকে স্কটল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা দেখে আসার জন্য পাঠাবার কথা হল। তার মধ্যে আমিও ছিলাম। প্রথমে ঠিক হল এডিনবরা যাওয়া হবে।

২২শে নভেম্বর লীড্‌সের সিটি স্টেশন থেকে যাত্রা করলাম। শীতের ভয়ে যথেষ্ট জামাকাপড় নিতে হয়েছিল। ট্রেণ আধঘণ্টা লেট থাকাতে স্টেশনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল।

ধূসর নভেম্বরের বিকালে গাড়ি চলল। ট্রেণেই চা খেলাম।

রাত প্রায় ৮টা নাগাদ এডিনবরায় পৌঁছলাম। একজন সঙ্গী তাঁর বন্ধু মহসীন সাহেবের বাড়ি গেলেন। আর একজন ভদ্রলোক, বান্ধবী বিদ্যা ও আমি ডীন হোটেল (Dean Hotel) নামে একটা হোটেলে উঠলাম। এখানে আমাদের জন্য আগে থেকেই জায়গা ঠিক করা ছিল। হোটেলের ভাড়া কিছু কম নয়, বিছানা ও প্রাতরাশ ১২ শি. ৬ পে., লাঞ্চ ও ডিনার খেলে সবশুদ্ধ ১৮ শি. দৈনিক। যখন হোটেলে পৌঁছলাম তখন ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে শরীর মন অবসন্ন। হোটেলের পরিচারিকাকে বললাম, 'কি খেতে দিতে পার, দাও।' বেচারীদের খাওয়া দাওয়ার পাট সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের জন্য আবার উনুন ধরিয়ে রান্না করতে হল। খাবার ঘরে দেখি একটা বড় বাছুরের সাইজের প্রকাণ্ড কুকুর ঘোরাফেরা করছে। তার নামের খুব বাহার—ডিউক। পরিচারিকা আমাদের সান্ত্বনা দেবার সুরে বলল, কিচ্ছু ভয় নেই, ও একটি শিশু (He is a baby)। অবশ্য, 'শিশু'টির দৈত্যাকৃতি দেখে বিশেষ আশ্বস্ত হবার কারণও আছে বলে মনে হল না।

পরদিন ভোরবেলা উঠে বিদ্যা আর আমি প্রাতরাশ খাওয়ার পর বেড়াতে বের হলাম। এডিনবরার কিছুই তখন চিনি না।

রাস্তায় খানিকটা ঘোরাঘুরি করে একটা বাস দেখতে পেয়ে তাতে উঠে বসলাম। শুরু হল নিরুদ্দেশ যাত্রা। ঠিক করলাম, এ বাস যতদূরে যায়, যাওয়া যাক। মনের মধ্যে একটি গানের কলি গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল—'অচেনাকে চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে।'

বাস থামল গ্রান্‌টন্‌ বন্দরে (Granton harbour)। সেখানে দেখি তরঙ্গ-উদ্বেল সমুদ্র। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, জায়গাটির নাম লীথ (Leith)। নর্থ সী জমির মধ্যে মধ্যে ঢুকে খাঁড়ির সৃষ্টি করেছে। আমরা মনের আনন্দে বেড়াতে লাগলাম। ম্যাপটা দেখে বের হইনি, তাই এডিনবরায় এসে যে এত সহজে সমুদ্রের দেখা মিলবে সেটা ভাবি নি। এক জায়গায় প্রচুর সিন্ধুপাখি বসে। আমাদের দেখে জলে নেমে গেল। তাদের জলকেলি আয়ার্ল্যাণ্ডের সুখস্মৃতি মনে জাগিয়ে তুল্‌ল। মাছের কাঁটাতে বেলাভূমি একাকার। অনেক শামুক ঝিনুক কুড়ালাম। সমুদ্রভেদে শামুক ঝিনুকের রং ও আকৃতির ভেদ হয়।

সমুদ্রের ধার দিয়ে বেশ কিছুদূর গেলাম। এক জায়গায় উঁচু টিবির উপর একটা কাস্‌ল্‌এর মতো বাড়ি দেখে ভাবলাম, নিশ্চয় এখানে দ্রষ্টব্য কিছু আছে। কিন্তু টিপি বেয়ে উঠতেই গলায় চাক্‌তি বাঁধা বাঘের মতো প্রকাণ্ড এক কুকুর আমাদের তাড়া করে এল। তখন দে ছুট্‌! তারপর অনেক ঘোরাঘুরি করে হোটেলে ফিরে এলাম।

বিকালবেলা আবার দুই বন্ধুতে এডিনবরা আবিষ্কারে বার হলাম। এখানকার প্রিন্সেস স্ট্রীট (Princes Street) জগদ্বিখ্যাত রাস্তা। রাস্তাটি মাইলখানেক লম্বা। একদিকে সারি সারি সাজানো গোছানো দোকান ও রেস্তোরাঁ। অন্য দিকে পাহাড়ের ওপর এডিনবরা দুর্গ, যাদুঘর, জেনারেল পোস্ট অফিস, স্কটের

স্মৃতিস্তম্ভ, ওয়েভার্‌লি স্টেশন যাবার রাস্তা। যানবাহন মুখরিত রাস্তায় জনতার ভীড়। দুর্গের সামনে একটা পার্ক, প্রিন্সেস গার্ডেন (Princes Garden)। আমরা সেই বাগানে ঢুকে খুব বেড়ালাম। তারপর পাহাড়ে চড়লাম। দুর্গের কাছে গেলাম, কিন্তু সেদিক দিয়ে প্রবেশ পথ নয়। এক ভদ্রমহিলার কাছে দুর্গের চাবী ছিল। তিনি দরজা খুলে আমাদের ভিতরের উঠানে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে নীচের দৃশ্য বেশ দেখায়। পাহাড়টি সমুদ্রতল থেকে ৪৪৩ ফিট উচ্চ। এই দুর্গের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে। প্রধান অংশটি প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে তৈরী হয়েছে; এটি পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। এইটিকে এবং উত্তর দিকের অংশকে বলা হয় সিটাডেল অব দি কাসল্ (Citadel of the Castle)। দুর্গের প্রাচীনতম অংশগুলি এই Citadelএরই অন্তর্গত। এর মধ্যে সেণ্ট মার্গারেটের ভজনালয় (St. Margaret's Chapel) হচ্ছে সবচেয়ে পুরোনো। এর বয়স আট শতাব্দীরও বেশি। এই ভজনালয়টি বেশ সুন্দর। এটি নর্ম্যান্ স্থাপত্যবিদ্যার একটি স্কটিশ উদাহরণ। পাহাড়ের সর্বোচ্চ অংশে এটি অবস্থিত। বহু রাজনৈতিক ঝড় ঝাপটা এই দুর্গের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। ইতিহাসের অনেক উপাদান এখানে পাওয়া যায়। এই দুর্গের অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু হচ্ছে স্কটিশ জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতি মন্দির (Scottish National War Memorial)। ১৯২৭ সালের ১৪ই জুলাই খুব জাঁকজমক করে এই স্মৃতি-মন্দিরটির উদ্বোধন হয়েছিল। দ্বার উন্মোচন করেছিলেন প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্। ১৯১৪-১৮র প্রথম মহাযুদ্ধে যে স্কটিশ সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতিকে জাতির মনে চির জাগরূক করে রাখার জন্যই স্মৃতি-মন্দির। অনেক বীরের নাম এখানে খোদাই করা আছে। সবটা ঘুরে দেখতে বেশ খানিকক্ষণ লাগল। একটা ঘোরানো পথ

দিয়ে এসে আবার Princes Streetএ পড়লাম। Princes Streetএর দোকানগুলি চমৎকার। একটা দোকানে রাজকন্যার বিয়ের কেকের একটা প্রকাণ্ড মডেল সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

পরদিন সকালে স্কটিশ কাউন্সিল ফর্ রিসার্চ ইন এডুকেশন (Scottish Council for Research in Education) গিয়ে স্কটল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গেল। স্কটল্যাণ্ডের সেক্রেটারি অব স্টেটই সব বিভাগের মন্ত্রীরূপে পরিগণিত হন। আলাদা করে শিক্ষামন্ত্রী এখানে নাই। স্কটিশ শিক্ষা-বিভাগই হচ্ছে শিক্ষাসম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ। এডিনবরার সেণ্ট এণ্ডরুজ হাউসে কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগের একজন করে সচিব আছেন। শিক্ষাবিভাগে বহু পরিদর্শক ইত্যাদি অফিসার আছেন।

পার্লামেণ্টে শিক্ষাসম্বন্ধীয় আইন পাশ হয়। স্কটল্যাণ্ডের বড় বড় শিক্ষা আইনগুলি নিম্নলিখিত সালের—১৮৭২, ১৯০৮, ১৯১৮ এবং ১৯৪৬। শেষ আইনে শিক্ষার সব দিকগুলিই ভালোভাবে বিবেচিত হয়েছে। এই আইন যাতে ঠিক মতো রূপ পরিগ্রহ করতে পারে এবং শিক্ষাব্যবস্থা যাতে এই আইন অনুযায়ী চলতে পারে সে বিষয়ে নজর রাখাই শিক্ষাবিভাগের কাজ।

ইংল্যাণ্ডের মতো স্কটল্যাণ্ডও কতগুলি কাউন্টি (County)তে বিভক্ত। প্রত্যেক কাউন্টির একটি করে কাউন্টি কাউন্সিল (County Council) আছে, তার আবার অর্থ, স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন সমিতি আছে।

কাউন্টি কাউন্সিল-এর শিক্ষা সমিতি হল স্কটিশ শিক্ষাবিভাগের অব্যবহিত অধীনে। শিক্ষা সমিতির সঙ্গেই বিদ্যালয়গুলির প্রত্যক্ষ যোগ আছে। পরিদর্শকের কাজ হল, স্থানীয় শিক্ষা সমিতি এবং বিদ্যালয়গুলি ঠিকমত কাজ করছে কিনা এবং শিক্ষা বিভাগের আদর্শ যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করছে কি না তাই দেখা।

প্রত্যেক স্থানীয় শিক্ষা সমিতিতে একজন করে শিক্ষা অধিকর্তা থাকেন। এই সমিতি যে কাউন্টিতে অবস্থিত সেই কাউন্টির পাঁচ থেকে পনের বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্য দায়ী। পাঁচ বছর থেকেই শিক্ষা আবশ্যক। নার্শারী স্কুলে দুই থেকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে ভর্তি হওয়া আবশ্যিক নয়। তবে যদি কোনও স্থানের যথেষ্ট সংখ্যক অভিভাবক তাঁদের শিশুদের জন্য নার্শারী স্কুল চান তো স্থানীয় শিক্ষা সমিতি তা স্থাপন করতে বাধ্য।

এগার বছরে সাধারণতঃ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়। তখন বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। বুদ্ধি পরীক্ষা এবং কতদূর কি শিখতে পারল তারই ফলাফলের উপর নির্ভর করে শিশু কোন ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করবে, একাডেমিক (Academic), না ব্যবসা সংক্রান্ত (Commercial), না কারিগরী (Technical) না নিম্ন মাধ্যমিক (Junior Secondary)।

স্কটিশ শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহুমুখী বিদ্যালয় (Multilateral schools)। এখানে একই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। সহশিক্ষা এখানে ইংল্যাণ্ডের থেকে ঢের বেশি প্রচলিত।

মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলে ইচ্ছা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা কারিগরী মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। তবে ঐ সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হলে সতের বছর বয়সে সিনিয়র লীভিং সার্টিফিকেটের (Senior Leaving Certificate) পরীক্ষা দিতে হয়। ইচ্ছা করলে আরও এক বছর কোনও বিশেষ শিক্ষার (Specialisation) জন্য ইস্কুলে থাকতে পারা যায়।

স্কটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনন্যপরতন্ত্র। তারা সরকারী সাহায্য পায় এবং ছাত্রদের কাছ থেকে বেতনও নেয়।

স্থানীয় শিক্ষা সমিতি নানাপ্রকার সান্ধ্য ক্লাসগ্রহণের ব্যবস্থা করে। অনেক বিদ্যালয়-গৃহ সন্ধ্যাবেলায় এই সব ক্লাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে নাচ, গান, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ দেওয়া হয়। পাঠ শেষে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। আঠারো বছরের কম বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য এ পাঠ অবৈতনিক। অন্যদের সামান্য বেতন দিতে হয়। কম্যুনিটি সেণ্টার (Community Centre) তখনও যথেষ্ট সংখ্যক হয় নি, তবে এগুলি তৈরীর কাজ চলছে।

১৯০৮ সালের আইনে স্কুল মেডিক্যাল সারভিস (School Medical Service) আরম্ভ হয়। তখন শুধু পরিদর্শন ও পরীক্ষাই হত। ১৯৪৫ এর আইন অনুযায়ী চিকিৎসাও করা হয়। এ সবের ব্যবস্থা এখন শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে করতেই হয়।

স্কুলে যে খাবার দেওয়া হয় তার জন্য কিছু পয়সা দিতে হয়, যদিও বিনা পয়সায় দেবার চেষ্টা চলছে। লাঞ্চের জন্য চার পাঁচ পেনি খরচ। যদি কোনও অভিভাবক এ পয়সা দিতে অপারগ হন তো তাঁকে কিছু দিতে হয় না। স্কুলে দুধ ও কডলিভার অয়েল বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

স্কটিশ কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন্ এডুকেশন থেকে বেরিয়ে লাঞ্চ খেয়ে দুই বান্ধবী প্রিন্সেস স্ট্রীট থেকে ট্রাম নিয়ে বটানিক্যাল গার্ডেন দেখতে গেলাম। এডিনবরা সহরের বুকে এটি একটি চমৎকার বেড়াবার জায়গা। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই উদ্যানটি স্থাপিত হয়। ক'বার জায়গা বদল করে এখন বাগানটি বর্তমান স্থানে অবস্থিত। এর এলাকা কম নয়, ষাট একরের কিছু বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে এই উদ্যানের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। উৎকৃষ্ট গবেষণাগার, লাইব্রেরী, হারবেরিয়াম প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে গবেষণাকারীকে সর্বদাই সহায়তা করতে প্রস্তুত। উদ্যানটি নানা

ভাগে বিভক্ত। পৃথিবীর নানা স্থান থেকে গাছপালা সংগ্রহ করে আনা হয়েছে।

আমরা সব ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। একটা পুকুর ছিল, সেটা নাকি সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু হেমন্তের হিমেল দিনে তার সৌন্দর্যের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না। গোলাপ বাগানটি খুবই সুন্দর। গ্রীষ্মকালে এর রূপ কেমন খোলে তা আমরা আন্দাজ করে নিলাম। এখানে একটি রবিনপাখি নির্ভয়ে কাছে এল। তারপর আমরা এলাম হট হাউসে (Hot House)। এখানে ঘর গরম রাখার সুব্যবস্থা রয়েছে। এর নানা বিভাগ আছে। আলপাইন হাউসে নানা দেশের গাছ পাশাপাশি আছে, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, আমেরিকা, আল্‌প্‌স্‌ পর্বত ও হিমালয় পর্বত—সব কিছুরই প্রতিনিধি আছে। দেখে মনে হচ্ছিল কোনও আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসেছে। রডোডেনড্রন হাউস বা বরাশ ফুলের বাড়িটিও চমৎকার। হিমালয়ের গাছই বেশি। ভারতবর্ষের গাছ এখানে দেখে কালিদাসের শকুন্তলার কাতরোক্তি—'মলয়তটোন্মূলিতচন্দনতরুরিব' মনে হচ্ছিল। ফণিমনসার ঘরে অজস্র অদ্ভুত আকৃতির ফণিমনসা ও কাঁটাগাছ আছে, দেখলে ভয়ে গা শিউরে ওঠে। এর অধিকাংশ গাছই এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকা থেকে। অর্কিড, ফার্ণ, পতঙ্গভোজী গাছের জন্যও আলাদা ঘর আছে। ভারী সুন্দর চন্দ্রমল্লিকার বাহার। হট হাউস থেকে বেরিয়ে রক গার্ডেন (Rock Garden) দেখতে গেলাম। পাথর দিয়ে কৃত্রিম পাহাড় তৈরী হয়েছে। তবে ঐ কৃত্রিমতার মধ্যেই যতটা সম্ভব নৈসর্গিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা। পাহাড়টি বেশ উঁচু, উপর থেকে এডিনবরা সহর সুন্দর দেখায়।

২৫শে নভেম্বর থেকে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখা আরম্ভ হল। সকালে গেলাম র‍্যামজে টেকনিকেল কলেজে (Ramsay

Technical College)। এখানে হাতে-কলমে নিম্নলিখিত বিষয়ে পাঠগ্রহণের ব্যবস্থা আছে—কামারের কাজ, ফিটিং, মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্‌ট্রিকের ব্যবহার, ধাতু ঢালাইএর কাজ, নক্সা তৈরী, খনিসংক্রান্ত কাজকর্ম। এছাড়া ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান ও শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে ভদ্রলোকেরা সবাই প্রায় হাতুড়ি নিয়ে কারবার করেন। অত্যন্ত সরল প্রকৃতি, হাসিখুশি চেঁচামেচি করে আনন্দ প্রকাশ করেন। ইলেকট্রিক কেটলিতে চা ফুটানো হল। আমাদের জন্য অনেক কষ্টে দুটি ডাঁটিসমেত পেয়ালা ও পিরিচ জোগাড় হল। এঁদের অনাড়ম্বর আন্তরিক আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করল।

কলেজের বাতায়নপথে সমুদ্রের নীলিমার আভাস কর্মরত মনের মগ্নচেতনায় রং ধরিয়েছিল। কলেজ দেখা শেষ হলে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলাম। ভদ্রলোক দুজন খুব সম্ভবতঃ মর্যাদাহানির আশঙ্কায় সর্ববিধ চাপল্য পরিহার করে একটু বেড়িয়েই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন। আমরা দুজনে ভিজে বালুতে মহানন্দে খেলা করলাম। বড় বড় তরঙ্গমালায় উচ্ছ্বসিত সমুদ্র। জলে রোদের গলিত সোনা ভেসে যাচ্ছিল। স্বচ্ছ, কন্‌কনে হিমেল দিন। নোনা বাতাসে মুখে নুনের গুঁড়ো এসে লাগল। লবণ-কণিকায় যে অনন্তের আস্বাদ আছে, একথা তো আগে এমন করে অনুভব করি নি। খেলা শেষে সহরে ফিরে এলাম।

একটা হোটেলে লাঞ্চের পালা শেষ করতে হল। এরা এখানে মুসুর ডালের সুপটা খুব খায়। ইংল্যাণ্ডে এ জিনিসের এতটা প্রচলন দেখি নি। পথে সেণ্ট গাইল্‌স্‌ ক্যাথিড্রেল (St. Gile's Cathedral) দেখে ঢুকে পড়লাম। মধ্যে যুদ্ধে মৃতদের বহু স্মৃতিফলক আছে। একটা ভজনালয় বা চ্যাপেল আছে, তার নাম থিস্‌ল্‌স্‌ চ্যাপেল (Thistle's Chapel), এখানে ঢুকতে তিন পেনি প্রবেশ মূল্য লাগে। গাউন পরা পাদ্রীগোছের একটি

বৃদ্ধ আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। এখানে হোমরা চোমরা লোকদের জন্য স্বতন্ত্র আসন আছে। সাধারণের উপাসনার স্থানেও রাজারাণীর আসন আছে। রাণীর আসন বাঁদিকে। বিদ্যা প্রশ্ন করে বসল—'বাঁদিকে কেন?' বেচারী বৃদ্ধ বিনীতভাবে তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তখন বিদ্যা রায় দিল যে, যেহেতু হৃৎপিণ্ড বাঁদিকে হেলান, সেহেতু মেয়েদের বাঁদিকে রাখে, হৃদয়ের কাছে হবে বলে। এই অদ্ভুত আবিষ্কারে আমাদের অত্যন্ত কৌতুক বোধ হল।

সন্ধ্যা আটটায় একটা যুব সংঘে (Youth Club) যাবার কথা। রাস্তাটা কেমন যেন অন্ধকার, নির্জন, ভূতুড়ে মনে হল। শুনলাম, এটা একটা খুব খারাপ বস্তির মধ্যে অবস্থিত। ক্লাবটির বাইরেটা সুদৃশ্য না হলেও ভিতরটা ভালো। অনেকগুলি ঘর। শিক্ষক মহাশয়রা আছেন। বড় ও ছোট ছেলে ও মেয়েব আলাদা বিভাগ আছে। মা ঠাকুবমাদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও সুপ্রচুর। খেলাধূলা, শিক্ষা, সঙ্গীত, অভিনয়, সেলাই, বইপড়া ইত্যাদির প্রচুর সরঞ্জাম। একটি ছোট গ্রন্থাগার এবং চারশত দর্শক এক সঙ্গে বসতে পারে এমন একটি প্রেক্ষাগৃহ আছে। এই সংঘে যোগ দিতে হলে কিছু কিছু চাঁদা দিতে হয়।

মা ঠাকুরমারা আমাদের পেয়ে মেতে উঠলেন। চা কেক খাওয়ার পর স্কটল্যাণ্ডের লোকনৃত্য আরম্ভ হল। নানারকম উদ্ভটপোশাক পরে অনেকটা ব্রতচারীনাচের মতো সকলে মিলে নাচ। আমাদেরও শেষ পর্যন্ত বুড়ীদের সঙ্গে হাত মেলাতে হল।

বান্ধবী একজন স্কটিশ গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করল, 'স্কটিশ আর ইংরেজের মধ্যে তফাৎটা কি?' ভদ্রমহিলা উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করছিলেন। খানিক পরে আর একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কতদিন আছেন এখানে?' 'একপক্ষ কাল।' ক্রীড়া শিক্ষয়িত্রী মন্তব্য করে বসলেন, 'তাই কি স্কটল্যাণ্ডে থাকার পক্ষে

যথেষ্ট নয় ?' বান্ধবী প্রশ্ন করল, 'আপনি বুঝি ইংরেজ ?' গর্বিত উত্তর এল—'হাঁ।' তখন সেই ভালোমানুষ গিন্নীটি বান্ধবীকে বললেন, 'এবার আশা করি বুঝতে পারবেন স্কটিশ ও ইংরেজের মধ্যে তফাৎটা কোথায়।' হায় রে মানুষের মন! সর্বত্র তোমার একই লীলা! বাংলাদেশের পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গীয়দের মধ্যে যে মনোমালিন্য অনেক সময়েই লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ হয়েছি, এই সুদূর যুক্তরাজ্যেও সেই মনোভাবের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে বিস্মিত হলাম।

এ রকম ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা খুব। এই শ্রমিক শ্রেণী আগে মাতলামি করে, সিনেমা দেখে, জটলা পাকিয়ে, পরচর্চা পরনিন্দা ও কুৎসিত কলহ করে সারাদিনের কঠোর শ্রমের ক্লান্তি দূর করত। এখন সদুপায়ে অবসর বিনোদনের চেষ্টা এদের মানসিকতাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছে।

পরদিন সকালবেলা বাসে করে পেনিকুইক জুনিয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (Penicuik Junior Secondary School) দেখতে গেলাম। এটি গ্রাম্য পরিবেশে অবস্থিত। এখানে সহশিক্ষা আছে। বারো থেকে পনের বছর বয়সের ছেলেমেয়ে এখানে পড়ে। পড়াশুনার তিনটি ধারা আছে— ১। বাণিজ্য বিষয়ক বা সাধারণ মাধ্যমিক পাঠ, ২। কারিগরী বা গৃহশিল্পের পাঠ, ৩। বিশেষ পাঠ। কতগুলি মূল বিষয় সকলকেই পড়তে হয়। কিন্তু বিভিন্ন পাঠের জন্য সাত আটটি করে বিশেষ বিষয় আছে। এজন্য দৈনন্দিন কার্য তালিকা বেশ জটিল রূপ ধারণ করেছে।

সেখান থেকে বাসে করে গ্লেনকোর্স স্কুলে গেলাম। এটি গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়। দুটি শিশুশ্রেণী ও পাঁচটি প্রাথমিক শ্রেণী আছে। শিক্ষয়িত্রী মোটে চারজন। এক একজনে একসঙ্গে একাধিক ক্লাস নিয়ে থাকেন। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলতে বললেন। একজন বন্ধু

শিশুদের বললেন, 'প্রশ্ন কর, উত্তর দেব।' একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ভারতবর্ষে আমাদের মতো স্কুল আছে কি না।' ভদ্রলোক বললেন, 'আমার বাড়ি দেখেছ?' 'হাঁ।' 'কি রকম বলতো?' মেয়েটি ছোট্ট মাথা দুলিয়ে বলল, 'ভাঙা চেয়ার থাকে, গরু, বাছুর মুরগী থাকে।' তখন ভদ্রলোক বললেন, 'আমাদের স্কুলও সেইরকম,—Central heating (গরম জলের পাইপে ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা) নেই, কিচ্ছু নেই।' আমি তো বেগতিক দেখলাম। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে Central heatingএর কি যে দরকার সে সব তো এই বাচ্চাগুলি বুঝবে না। আর স্কুলের বর্ণনা শুনে ভাববে আমাদের স্কুলে গরুবাছুর রাখা হয়। তখন আমি প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে বললাম, 'আমায় যদি কিছু বলতে অনুমতি দেন তো বলি।' তখন ছোটদের উপযোগী ভাষায় আমার দেশ সম্বন্ধে বললাম। অন্য ক্লাসেও বলতে হল।

বিদেশে আমাদের একটা কথা সর্বদা মনে রাখা উচিত মনে করি। এখানে আমরা প্রত্যেকে এক একটি দূত। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ভারতের নানা পরিচয় আমাদের আচার ব্যবহারে, কথাবার্তায় প্রকাশ পায়। বিদেশীরাও সাধারণতঃ দুএকজনকে দেখেই সারা ভারত সম্বন্ধে ধারণা করে বসে। দেশের সম্মান যাতে বিদেশীর চোখে এতটুকু ক্ষুণ্ণ না হয় সে সম্বন্ধে আমাদের প্রতি মুহূর্তে সচেতন থাকা উচিত।

পরদিন সাউথ কুইনস্ ফেরি স্কুল (South Queens Ferry School) দেখতে গেলাম। এটিও একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়। এর তিনটি বিভাগ আছে, শিশুশ্রেণী, প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক। শিশু শ্রেণীতে একশো জন, প্রাথমিক বিভাগে দুশো জন এবং মাধ্যমিক বিভাগে একশো জন ছাত্রছাত্রী আছে। এই স্কুলের পাঠ্যক্রম গ্রাম্য পরিবেশকে লক্ষ্য করেই তৈরী হয়েছে। মেয়েরা গৃহশিল্প এবং ছেলেরা কৃষিকাজ হাতে কলমে শেখে। এছাড়া কাঠের

কাজ, ইঞ্জিনিয়ারীং, বিজলীর ব্যবহার, জৈবতত্ত্ব প্রভৃতিও শেখানো হয়। হাতে কলমে কাজ ছাড়া ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, কলা ও সঙ্গীত শেখার ব্যবস্থা আছে। কৃষিকাজ শেখানোর উদ্দেশ্য ততটা চাষবাস শেখানো নয়, যতটা পরিবেশকে ভাল মতো বুঝতে শেখানো। এখানকার ছাত্রদের মধ্যে ভবিষ্যতে নানাপ্রকার কর্মপ্রণালী গ্রহণই প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টাটি প্রশংসনীয়। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বৃদ্ধ, একটু প্রাচীনপন্থী, কিন্তু খুব অভিজ্ঞ।

সে স্কুল থেকে বেরিয়ে একটা হোটেলে লাঞ্চ খেলাম। হোটেলটি ফোর্থ ব্রীজের (Forth Bridge) একেবারে কাছে। সমুদ্রের তীর বড় সুন্দর। সবাই মিলে ঠিক করলাম স্টীমারে করে দক্ষিণ কুইন্‌স্‌ফেরি থেকে উত্তর কুইন্‌স্‌ফেরিতে যাব। স্টীমার ঘাটেই দাঁড়িয়ে ছিল। অনেক সখ করে মোটরগাড়ি তুলছিলেন স্টীমারে। দিনটি খুব ঠাণ্ডা। আগের রাতে তুষারপাত হয়েছিল। হু হু হাওয়া। জায়গাটাকে বলে ফার্থ অব ফোর্থ (Firth of Forth)। অনেক ছোটখাট দ্বীপ মাথা তুলে আছে। স্টীমারে করে ওপারে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না।

উত্তর কুইন্‌স্‌ফেরিতে বাসের দোতলায় একদম সামনের সিটে বসলাম। পথে এক বন্ধু আপেল খাওয়ালেন, অদ্ভুত মিষ্টি ও ঠাণ্ডা। আইসক্রীমের মতো স্বাদ।

ডান্‌ফার্মলাইন (Dunfarmline) বলে একটা জায়গায় বাস থামল। এখানে একটি এ্যাবি (Abbey) ও একটি পার্ক আছে। এ্যাবিটা মন্দ নয়। পার্কে একটি সরাইখানা। চা খাব বলে সেখানে গেলাম। সরাইখানার বাগানে দুটি ময়ূর নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিকেলের গোলাপী আকাশ, মাঠে সবুজের আস্তরণ, তাতে দুটি চিত্রল ময়ূর—সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড ছবি।

ভেবেছিলাম ট্রেনে ফিরব, তাতে ফোর্থ ব্রীজটা পার হওয়া যেত। তাতে অনেক হাঙ্গামা দেখে স্টীমারেই ফিরতে হল।

চড়ার বেশ খানিকক্ষণ পরে স্টীমার ছাড়ল। ফোর্থ ব্রীজটি অন্ধকারে সিলুয়েট ছবির মতো দেখাচ্ছিল। চাঁদ উঠল, মস্ত বড়, বোধ হয় পূর্ণিমারই চাঁদ। চাঁদের আলো জলে পড়ে মনকে কত পুরাতন স্মৃতিরঞ্জিত করে তুলছিল। বহুদিন পূর্বে, তখন ইস্কুলের ছাত্রী ছিলাম, এক কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নৌকা করে বেলুড় থেকে দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছিলাম। সেই আমার জীবনে প্রথম নৌকাভ্রমণ। নৌকার মাঝিদের ক্ষুদ্র গৃহস্থালী—তোলা উনুন, পেঁয়াজ, সর্ষের তেলের শিশি, গামছা ও ছেঁড়া কাঁথা দেখে মনে হয়েছিল নদীর বুকে এদের জীবনযাত্রা কী রোমাঞ্চকর! জলে সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়ের রং মাখামাখি। তারি সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সঙ্গিনীর গান—

"চুকিয়ে সুখ শুকিয়ে মুখ যে জন আছে ঘরছাড়া
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়—
ওরে আয়—আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনের শেষে
শেষ খেয়ায়—।"

সেই বর্ণসমৃদ্ধ সন্ধ্যার কথা হঠাৎ এতদিন পরে এতদূরে এসে মনে পড়ল। আজকের ভ্রমণটিও ছোট, কিন্তু অন্তরমণিমঞ্জুষায় সোনায় জড়ানো ইন্দ্রনীলমণির মতো এই দুর্লভ স্মৃতি সেই কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যার স্মৃতির সঙ্গেই তোলা রইল।

পরদিন সকালে বোনেস একাডেমী (Bo'ness Academy) দেখতে গেলাম। এটি বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এখানে সহশিক্ষা আছে। ছশো জন ছেলেমেয়ে পড়ে। নানা বিভিন্ন কোর্স আছে। বাণিজ্যবিভাগে মেয়ের সংখ্যা ছেলের চেয়ে বেশি। এই স্কুলের একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানকার ছেলেমেয়েরা খুব

সুন্দর ছবি আঁকে। কলাশিক্ষকেরই কৃতিত্ব। তা না হলে সাধারণভাবে সকলের মধ্যে শিল্পানুরাগ সঞ্চার করা সহজ নয়। তাদের আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবি প্রধানশিক্ষক মহাশয় নিজের ঘরে ও স্কুলের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছেন। প্রধান শিক্ষক কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সহশিক্ষা সমর্থন করেন না।

সেখান থেকে বারোজটাউন (Burrowstown) স্কুলে গেলাম। দুপেনির রাস্তা। ছোট্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়। দুই বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী, মাথায় টাক, স্বল্পাবশিষ্ট চুলে সোনার ক্লিপ গোঁজা, কতগুলি বাচ্চাকে পড়ান ও কড়ি গুণে অঙ্ক শেখান। বাচ্চারা নাচগান দেখিয়ে বিদ্যে জাহির করে পরম পুলকিত হল। বৃদ্ধারা তাদের আনন্দ দেখে মশ্‌গুল।

সেদিন রাতে খাওয়া দাওয়ার পর দুই বান্ধবীতে বসে প্ল্যান আঁটতে লাগলাম। হোটেলওয়ালীর ফুটফুটে মেয়েটিও যোগ দিল। ম্যাপ, বাস ও টাইমটেবিল দেখে ঠিক করলাম পরদিন গ্লাসগো (Glassgow) যাব, সেখান থেকে লক লমণ্ড (Loch Lomond)। বলতে ভুলে গেছি, যে ভদ্রলোকটি ডীন হোটেলে উঠেছিলেন, তিনি দুদিন পরেই ভারতীয়দের আস্তানা খুঁজে চলে গিয়েছিলেন। রাত দশটায় ফোনে দুই বন্ধুকে টেলিগ্রাম পাঠালাম পরদিন সকালে দেখা করার জন্য। টেলিগ্রামে নামদুটি দ্বন্দ্ব সমাস করে দিলাম। হিন্দু মুসলমান দুই নাম সমাসবদ্ধ হয়ে নাকি তাঁদের পত্রের মর্মোদ্ধারে বিলক্ষণ বেগ দিয়েছিল।

ভোরে তাঁরা ফোনে খবর নিলেন, ব্যাপার কি। একজন রাজী হলেন আমাদের সঙ্গে যেতে। সকালে সেণ্ট এণ্ড্রুজ স্কোয়ার (St. Andrew's Square) থেকে বাস ছাড়ে। প্রাতরাশ খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে গেলাম। যাওয়া মাত্র বাস ছেড়ে দিল।

এডিনবরা ছাড়িয়ে বাথগেট হয়ে বাস চলতে লাগল। বেশ ঠাণ্ডা। রাস্তার দুপাশে জল জমে হিমানী হয়ে আছে। গ্লাসগো

ছেলেমেয়েরা কিছু করে হাতখরচাও পায়। নানাপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্য, নার্সিং, ছাপার কাজ, মেয়েদের বেশবিন্যাস, টেলিফোন মেকানিক্‌স্‌, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শক্ত অসুখের পর উঠলে করণীয় নানাপ্রকার শিল্প কাজ (Occupational Therapy Training), নার্সারী ট্রেণিং, মাদের জন্য নানা জিনিস শেখানো প্রভৃতি কত কি যে এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

সেখান থেকে বেরিয়ে একটা ভারতীয় রেস্তোরাঁতে খেতে গেলাম। পাঞ্জাবী খানা। হাতীর কানের মতো বড় বড় চাপাটি, মাংস, বাঁধাকপির তঁরকারী ইত্যাদি। হজম করতে প্রাণান্ত। তারপর চিড়িয়াখানায় গেলাম। কৃত্রিম জলাধারটি (Aquarium) সুন্দর। সমুদ্রের তলার মতোই মনে হয়। বাঘ নেই, একটা ময়লা হাতী। পেঙ্গুইনরা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, একজন মস্ত বড় মাছ নিয়ে তাদের মুখে দিচ্ছিল। একগ্রাসে আস্ত মাছটা গলাধঃকরণ করে তারা সরে এসে অন্যদের জায়গা করে দিচ্ছিল। খুব সভ্য ভদ্র বিচক্ষণ রকমসকম। অনেকগুলি সিংহ। ক্যাঙ্গারু প্রচুর।

পরদিন ভদ্রলোক দুজন ট্রেণিং কলেজ দেখতে গেলেন। আমাদের প্রোগ্রাম ছিল অন্য। পিট্‌লক্‌রি (Pitlochry) তে একটি পোলিশ ইস্কুল দেখতে যাব। আগের দিন স্টেশনে মাল রাখার জায়গায় (Left Luggage) সব ভারী মাল রেখেছিলাম। ভোর সাতটায় গাড়ি ছাড়ল। দেখে খুব আনন্দ হল যে, ফোর্থ ব্রীজের উপর দিয়ে ট্রেণ চলল। একটি অপূর্ণ আশা পূর্ণ হল অপ্রত্যাশিত ভাবে। ট্রেণের কামরায় এক সাহেব ভীষণ সিগারেট খাচ্ছিলেন, ধোঁয়ায় অস্থির। আমি বান্ধবীকে বাংলায় বললাম, 'সস্তা বিড়ি খাচ্ছে।' সে দরজা খুলতে বলল। ভদ্রলোক নিজেই দরজা খুলে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'But this is not বিড়ি' (এটা কিন্তু বিড়ি নয়)। আমাদের শুনে চক্ষু চড়কগাছ।

আলাপ হল, তিনি সাড়ে চার বছর ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন এবং হিন্দী, হিন্দুস্তানী এগুলো মোটামুটি জানেন।

পার্থে (Perth) গিয়ে গাড়ি বদল করলাম। সেখান থেকে পিট্‌লক্‌রির রাস্তাটি বড় সুন্দর। এই সেই স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত হাইল্যাণ্ড (Highland)। পার্বত্য জায়গা, অনেকটা ছোট-নাগপুরের পর্বত শ্রেণীকে মনে করিয়ে দেয়।

পিট্‌লক্‌রিতে নেমে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে বাস নিয়ে ডানালাস্টেয়ার (Dunalastair) গেলাম। উঁচু নীচু পার্বত্যপথ। অতি গম্ভীর দৃশ্য। বাসের যে ড্রাইভার সে-ই বেল্ট কাঁধে নিয়ে টিকিট কণ্ডাক্টর সাজে, সে-ই চিঠি বিলি করে, গ্রামবাসীদের দুধ, আটা প্রভৃতি সরবরাহ করে। এতগুলো ভূমিকায় বেচারীকে রোজ একলা কাজ করতে হয়।

ইস্কুলবাড়ীর নাম ডানালাস্টেয়ার হাউস।

পোলিশ প্রধানা শিক্ষয়িত্রী খুব সমাদর করলেন। যুদ্ধের সময়ে অনেক পোলিশ পরিবার বাস্তুহারা হয়ে যুক্তরাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। পোল্যাণ্ড কম্যুনিস্ট হবার পর অনেকে রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্যহেতুও এখানে এসে বাসা বাঁধতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের মেয়েদের পড়ানোর জন্য এটি একটি উদ্বাস্তু বিদ্যালয়। এখানে বোর্ডিংএ মেয়েদের থাকতে হয়। মাসে প্রত্যেককে পাঁচ গিনি করে দিতে হয়, কিন্তু থাকার জন্য কিছু লাগে না। বিদেশে এসে এঁরা নানা অসুবিধার মধ্যে আছেন। বাড়িটা স্কুলের উপযোগী মোটেই নয়। মেয়েদের ঘরগুলি খুবরি খুবরি। প্যারাফিনের স্টোভ জ্বেলে রাখাতে ছোট্ট কুঠরীগুলো দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে। বেশ হতশ্রীভাব। কিন্তু এই দারিদ্র্য যতটা সম্ভব ঢেকে রাখা হয়েছে জিনিসপত্র গুছিয়ে সাজিয়ে রেখে। ছেঁড়া পুরানো কাপড়ের টুকরো কেটে তাতে ছুঁচের কাজ করে ঘরের সৌন্দর্য বাড়ানো হয়েছে। সমস্ত ত্রুটি ঢেকে গেছে

আন্তরিকতায়। আমরা সেখানে যা মনের শান্তিতে ছিলাম, এমন শান্তি কার্পেট-মোড়া ঝকৃঝকে ডীন হোটেলে পাই নি।

ছুপুরে লাঞ্চএর টেবিলে শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে আলাপ হল। খাওয়ানোর খুব তদারক করলেন। পোলিশ খাওয়া একটু অন্যরকম। আমার তো ইংরেজী খানার চেয়ে ভালো লাগল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক আলাপ হল।

আমার লীড্‌সের পোলিশ বান্ধবী স্তেনিয়া এখানকার প্রাক্তন ছাত্রী। তার বোন মীরা এখানে পড়ে। খাওয়ার পর মীরার সঙ্গে বেড়াতে গেলাম। অনেকটা জমি এই স্কুলেরই। শান্ত নির্জন পরিবেশ। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা, পাহাড়ের মাথায় বরফ পড়েছে। নিষ্পত্র গাছগুলি ভূষণহীনতায় কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জীর্ণপাতার মর্মরে শিহরিত হচ্ছে অরণ্যানীর স্বপ্ন।

বনের মধ্যে একটা সেতু ছিল। তার কোনও রেলিং নেই। বেশ নীচ দিয়ে বইছে টামেল নদী (Tummel)। বরফ পিচ্ছিল সেতু, পার হওয়া গেল না।

সন্ধ্যাবেলা খাওয়ার পর একটি উৎসব হল। সাণ্টা ক্লসের নামকরণের দিনই হচ্ছে উৎসবের উপলক্ষ্য। পোলিশ রোমান ক্যাথলিকরা দেখেছি Name day বা নামকরণের দিনটা খুব মানে। মেয়েরা অভিনয়, নাচগান ইত্যাদি করল। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের নকল করে প্রচুর হাস্যরস সৃষ্টি করল। লাতিন শিক্ষকের কাছ থেকে জামা চেয়ে নিয়ে সেই জামা গায়ে দিয়ে তাঁকেই নকল করল। তারপর দেবদূত ও শয়তানের দল এল। তারপর সাণ্টা ক্লস এসে প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে উপহার দিল। ইস্কুলের ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী কেউ বাদ পড়ল না। আমরাও উপহার পেলাম। আমি পেলাম কাজ করা রুমাল, চকোলেট, শুকনো ফল ও বিস্কুট। খুব আনন্দে কাটল সন্ধ্যাটা।

রাতে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর ঘরে জটলা। বাংলা ভাষা শুনতে চাওয়াতে "নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি" ইত্যাদি আবৃত্তি করলাম। তার মানেটা অবশ্য ইংরেজীতে বলতে হল। রবীন্দ্রনাথ, পোলিশ কবি মিচ্‌কোভিচ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হল।

পরদিন হঠাৎ বেলা এগারটায় শুনলাম একটা বাস যাচ্ছে কিন্‌লক্‌রানোখ (Kinlochranoch) বলে একটা জায়গায়, তার দৃশ্য অপূর্ব। আমাদের জিনিসপত্র কিছুই গুছানো ছিল না। বাস-ড্রাইভার বলল, আমাদের জন্য পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে পারে। ঠিক করলাম কন্‌লক্‌রানোখ্ দেখেই সেখান থেকেই পিট্‌লক্‌রি চলে যাব। মীরা মধ্যপথে ডানালাস্টেয়ারএ নেমে যাবে। খুব তাড়াতাড়ি এ সিদ্ধান্ত হল। প্রধান শিক্ষয়িত্রী খুবই ক্ষুণ্ণ হলেন।

বাসে চড়ে কয়েক মাইল যেতেই চমৎকার লেকে এসে পড়লাম। আশেপাশে কয়েকটি সুন্দর হোটেল আছে। সরোবরে পাহাড় ঝুঁকে নিজের রূপ দেখছে, জলেও পাহাড়ের বর্ণবৈচিত্র্য। আকাশে মেঘে রোদে লুকোচুরি, "বনপথে আঁধার আলোর আলিম্পন।"

এত তাড়াতাড়ি মালপত্র সব নিয়ে চলে এলাম, ভালো করে বিদায় নেওয়া হল না,—মনটা খচ্‌খচ্ করছিল। তখন একটা হোটেলে গিয়ে ফোন করে দিলাম ফিরে যাব বলে। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শুনে খুব খুশি।

লেকের কাছ থেকে খানিক দূরে টামেল নদীর একটি ঝর্ণা আছে, ভারী সুন্দর। পাথরের উপর জল জমে বরফ হয়ে লম্বা আকৃতিতে ঝুলছে, তার পাশ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ করে জল ঝরছে। পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে অনেকদূর উঠে একদম ঝর্ণার কাছে বসে রইলাম। বিরাট পর্বতশ্রেণীর আঁকাবাঁকা রেখায় দিগ্বলয় লুপ্ত, বরফ ঝক্‌ঝক্ করছে, পত্রহীন বৃক্ষে বনানী ফাঁক ফাঁক লাগছে।

বনভূমিতে ঝরা পাতার উৎসব। চারিদিক একেবারে শান্ত, শুধু "স্খলনমুখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ।"

অনেকক্ষণ বসে থেকে বাসে করে ফিরে এলাম। আমাদের দেখে সবাই খুশি হলেন। ঠিক হল তারপর দিন সকালে যাত্রা করব।

বিকেলে টামেল নদীর আর একটি ঝর্ণা দেখতে গেলাম। এটা পিট্‌লক্‌রি যাবার পথে পড়ে। পথে বান্ধবী চাষার বাড়ি থেকে মুরগী ও ডিম কিনতে বৃথা চেষ্টা করল।

দিনটা মেঘলা হয়ে এসেছিল। দূরের পাহাড়গুলি কুয়াশায় লুপ্ত। এখানে সেখানে কুহেলী পরদার মতো ঝুলছে, যেন খণ্ড খণ্ড মেঘ। কুয়াশা হলে আরণ্য প্রকৃতির আর একরকম শ্রী খোলে। এ যেন প্রণয়িনীর খেলা, কিছু ধরা দিয়ে কিছু ধরা না দিয়ে। তবে একটা অভিমানে ঠোঁট ফুলানো থম্‌থমে ভাব আছে।

বনের মধ্য দিয়ে পথ। দুধারে বিরাট গাছগুলি নিজ মহিমায় গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুদূর গিয়ে ঝর্ণার শব্দ শোনা গেল। পাথরের গা বেয়ে নামলাম। খুব পাথুরে জায়গা। অদ্ভুত বন্যপ্রকৃতি। পাথরের বিষমরেখায় সৌন্দর্য খুব বেড়েছে। এ ঝর্ণাটি বিশেষ উঁচু নয় কিন্তু বেগ অত্যন্ত বেশি। একস্থানে একটি স্বল্প পরিসর জায়গা দিয়ে সমস্ত নদীটির জল তোড়ে বের হচ্ছে, তাই অত গর্জন। উপলবন্ধুর পর্বত গাত্রে খানিকক্ষণ বসলাম। তখন বনানীতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। আবছা আলোয় জলের রং কিরকম ধূসর লাগছে। খানিকপরে ফেরার পথে পা বাড়ালাম। একটা পেঁচা পাখার ঝাপটে সন্ধ্যার স্তব্ধতা ছিন্ন করে বনের মাথায় উড়ে গেল। দূরের খামার বাড়ি থেকে গৃহাগত হাইল্যাণ্ডের গরুর বিকট ডাক শোনা যাচ্ছিল।

সেই রাতে একটি অদ্ভুত খাবার খেলাম। ভিনিগারে ভিজানো কাঁচা আস্ত হেরিং মাছ, ভাল করে আঁশ পর্যন্ত ছাড়ানো হয়নি।

আর আলুসেদ্ধ। ছুরি দিয়ে অতি কষ্টে কেটে দেখি, ভিতরে নরম কাঁচা ডিম। আমাদের তো চক্ষুস্থির। বান্ধবী আস্তে আস্তে বলল, 'কাঁচা মছলি খাব কি করে?' আমি বললাম, 'যতটা পার খাও, যা না পার খেও না, যেন পেট ভরে গেছে এই ভাব কর, কিন্তু মুখ বিকৃত কর না।' আমাদের বিশেষ সম্মান দেখানোর জন্য এই বিশেষ ডিসটি আনা হয়েছে, 'খাব না' বলে দুঃখ দিই কি করে? অথচ গন্ধে প্রাণ অস্থির। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা পরম আগ্রহে দুটো করে মাছ খেলেন, বারবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের এই সুখাদ্য খেতে কেমন লাগছে। লাভের মধ্যে সারারাত দুই বান্ধবীর ঘুম এল না, কাঁচা মাছ পেটের মধ্যে ফুটতে লাগল। সারারাত জেগে বসে কলসী কলসী জল খেলাম।

পরদিন লাঞ্চের পর পিট্‌লক্‌রির বাসে চড়লাম। সবাই খুব ঘটা করে বিদায় দিলেন। দিনটা একেবারে মেঘলা। পিট্‌লক্‌রিতে নেমে ফিশার্‌স্ হোটেলে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল। ওখানেই বিকেলের চা নিলাম। তারপর ট্রেণ ধরে পার্থে বদলে এডিনবরায়। মালপত্র নিয়ে রাত এগারটায় ট্রেণ ধরলাম লীড্‌সের জন্য। সে ট্রেণে ইয়র্কে এসে রাত তিনটে বাহান্নতে বদল করার কথা। কিন্তু ঘন কুয়াশার জন্য পথে অনেকটা লেট হল। রাত সাড়ে পাঁচটায় ইয়র্কে পৌঁছলাম। আগের গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, পরের ট্রেণ সকাল সাড়ে সাতটায়। দুঘণ্টা নোংরা বিশ্রামাগারে কাটিয়ে সকালের গাড়িতে নটার সময়ে লীড্‌সে এলাম। দু' রাতের অনিদ্রা,—ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছিল। বান্ধবী তো দারুণ ঠাণ্ডা লাগিয়ে দিন কতক ভুগল। আমি দু' তিন দিন বিছানায় শুয়ে চাঙ্গা হলাম।

॥ ডেভনশায়ারে ॥

১৯৪৭-এর বড়দিনের ছুটিটা কোথায় কাটাবো একটু চিন্তা হয়েছিল। শুনলাম, ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ অংশে ডেভনশায়ারে নাকি শীত অপেক্ষাকৃত কম। দক্ষিণ ডেভনে পেয়িংটন (Paignton) নামে এক গ্রামে নিরিবিলিতে কয়েকদিন কাটিয়ে আসব, এই ঠিক করলাম।

ভোর রাতে সেন্ট ক্যাথারিন্স থেকে বিদায় নিলাম। বিভাও আমার সঙ্গে চলল। পথে কন্‌কনে শীত, রাত্রিশেষের আকাশে শুকতারার প্রসন্ন চাহনি।

পেয়িংটনে পৌঁছে চোখ জুড়িয়ে গেল। লীড্‌সে শীতের প্রকোপ বেশি বলে গাছপালা ইতিমধ্যেই নিষ্পত্র। এখানে কিন্তু সেই তুলনায় শ্যাম শোভার সমারোহ অধিকতর। আমরা যে গ্রামবাটিকায় (Country House) উঠেছিলাম সেটা সমুদ্রের কাছেই। বাগানে এলে সমুদ্রের নীলিমা চোখে পড়ে।

একটা মস্ত বড় ঘরে আমাদের থাকতে দিয়েছে। লণ্ডন থেকে আর এক বান্ধবী ইভারও আসার কথা। খুব ভালো আসবাবপত্র। ভিক্টোরীয় যুগের আয়না টেবিল, মস্ত বড় বড় পালঙ্ক। পালঙ্কে পালকের লেপ। ঘরে Central heating-এর ব্যবস্থা আছে। গ্যাসের আগুনও আছে, জ্বালাবার দরকার কোনও দিনই হয় নি। আমি একটু শীতকাতুরে (বন্ধুরা অবশ্য বলে, 'একটু' নয়, 'অত্যন্ত'), এই উষ্ণ পরিবেশে এসে খুবই আরাম বোধ করলাম।

বাইশে ডিসেম্বর ইভা এসে পড়ল। ভারী স্ফূর্তিবাজ প্রাণময়ী মেয়ে। এসেই হাসিতে গানে লণ্ডনের উদ্ভট সব গল্পে আমাদের মধ্যে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করল। ইভার সঙ্গে লণ্ডন-আগত এক ভদ্রলোক কিছু জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ভারতবর্ষ থেকে আসার সময়ে আমার মা সেগুলি আমাকে দেবার জন্ত

তাঁকে দিয়েছিলেন। জিনিসের পোঁটলা খুলে আমরা খুব খুশি। মা জামা কাপড় কুম্‌কুম্‌ তেল প্রভৃতি তো দিয়েছেনই, আরো দিয়েছেন মুড়ি এবং আমতেল। তাই দেখে তিন বন্ধুতে আনন্দে আত্মহারা। মুড়ি খাওয়ার সময়টা আমাদের ভারী অদ্ভুত ছিল। রাতে শোবার সময়ে লেপের মধ্যে ঢুকে গল্প করতে করতে আচারের তেল মাখা মুড়ি খেতে খেতে স্বর্গসুখ অনুভব করতাম।

সেই বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার বাহার খুব ছিল। ভোরে বিছানায় বেড টি (Bed Tea) দিত। তারপরে সকাল নটায় প্রাতরাশ, একটায় লাঞ্চ, বিকাল চারটায় চা ও সন্ধ্যা সাতটায় ডিনার। সব খাবারই অতি উৎকৃষ্ট। মুরগী বা টর্কী পাখির মাংস প্রায়ই দিত। সাড়ে তিন একর জমির উপরে বাড়িটি ছিল, ফল তরকারী বাড়িতেই উৎপন্ন হত।

আমরা খাবার টেবিলেও আচার নিয়ে যেতাম। আমাদের তিনজনের জন্য একটি স্বতন্ত্র টেবিল দিত। খাবার ঘরে এইরকম অনেকগুলি ছোট ছোট টেবিল ছিল। আমাদের আচারের শিশি কিন্তু অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একটি মেয়ে নাকি ইভাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'ওটা কি সাপের আচার?' ইভা আবার তাকে বুঝিয়ে বলেছে, সাপের না, আমের ইত্যাদি। মেয়েটির কথা শুনে তো আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে গেল। আমি বললাম, 'বললেই পারতে, হ্যাঁ, সাপেরই আচার, আমরা ইচ্ছে হলে মানুষের আচারও বানিয়ে খাই, সুতরাং সাবধান!' যাই হোক, আমের আচার শুনে একজন খুব হোঁৎকা সাহেব (তাকে আমরা muffing man বলতাম) আদিখ্যেতা করে বলছে, 'তাই নাকি? আমরা আমের আচার বড্ড ভালোবাসি।' ইভা বাধ্য হয়ে ভদ্রতা করে আমার এবং নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা প্লেটে করে আম ও লেবুর আচার নিয়ে তাদের দিল। তারা হুঁ হাঁ কিচ্ছু বলল না। ইভা বলছে, 'জিজ্ঞাসা করি, কেমন লাগল।' আমি বললাম, 'আমি সমানে

ওদের মুখ দেখেছি। ওরা একবারও মুখে দেয় নি, বেশ বলতে পারি। তাহলে মুখ একটু অন্তত বিকৃত হতই। স্রেফ পাতে নিয়ে ফেলেছে। জিজ্ঞাসা করলে বলবে Splendid (চমৎকার)। তখন তুমি আবার বলবে, আবার খাও। আমার মার হাতের জিনিস এভাবে নষ্ট করতে আমি দেব না।' ইভাও আমার কথার যৌক্তিকতা বুঝল। আচার পর্ব এখানেই শেষ, আর কোন দিনই muffing manরা এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করে নি।

বাড়িতে একটি লাউঞ্জ ছিল যেখানে খুব আড্ডা চলত। আমরা সাধারণতঃ সে আড্ডায় যোগ দিতাম না, নিজের মনে ঘুরে বেড়াতাম। বাড়িতে থাকলেও নিজেরাই গল্প করতাম।

ডেভনশায়ারে বেড়ানোর সব চেয়ে ভালো জায়গা ছিল সমুদ্রতীর। কত ভাবেই যে সমুদ্রকে দেখলাম! চলতে চলতে হঠাৎ মনে হয় দিক্‌চক্রবাল যেন খুব কাছে এসে থম্‌কে গেছে। একটু গিয়ে দেখি, নীচে সমুদ্র। পেয়িংটনে সমুদ্র খুবই কাছে সে কথা পূর্বেই বলেছি। সমুদ্রে প্রচুর ঝিনুক। রোজ আমরা ঝিনুক কুড়োতাম। একপাল কুকুর সমুদ্রেব ধারে খেলা করত, কখনও বা জলের মধ্যে ঢুকে হৈ হৈ করত। সিন্ধুপাখি খুব বেশি। এখানে তারা মানুষকে বিশেষ ভয় করে না। অনেকে আবার তাদের খেতে দেয়। একটি ছোট ছেলে রোজই মাব হাত ধরে আসত আর পাখিদের রুটির টুকরো খাওয়াত।

পেয়িংটনের কাছেই টর্কি (Torquay) বলে একটি সহর আছে। আমরা প্রায়ই সেখানে বেড়াতে যেতাম। এটি একটি বন্দর। ভেন হিল (Vane Hill) নামে একটি ছোট পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে সাজানো বাড়ি। পাহাড় বেষ্টন করে রাস্তা ঘুরে ঘুরে উপরে উঠেছে। বন্দরের ভিতরের অংশ মনে হয় সহরের মধ্যে। শান্ত হালকা নীল্‌চে সবুজ জলে ছোট ছোট রঙিন নৌকাগুলি অলস ভাবে পড়ে আছে। বন্দরের বাইরের অংশের মুখ বাইরের

সমুদ্রের দিকে খোলা। টর্কি খুব সাজানো গুছানো সুন্দর জায়গা। এখানে সমুদ্রের ধারে অনেক ছোট বড় বেড়াবার স্থান আছে। আমরা প্রায়ই বীকন্ কোভ (Beacon Cove) বলে একটি জায়গায় গিয়ে সমুদ্রের খেলা দেখতাম। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাথুরে দ্বীপ জলের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রের ধারে ছোট্ট ছোট্ট ফুলে ভরা কাঁটা গুল্ম। ঝিনুকের তৈরী পাউডার কেস, গোমেধের মালা প্রভৃতি খুব বিক্রী হয়। আমরা চুপ করে বালুর উপরে বসে থাকতাম, ঢেউয়ের নাচানাচি দেখতাম। দেখে দেখে আশ মিটত না।

একদিন সকালে ব্রিক্স্হাম্ (Brixham) নামে একটা ছোট্ট বন্দরে বেড়াতে গেলাম। সেখানে অনেক ট্রলার ড্রিফ্টার প্রভৃতি মাছধরা জাহাজ আছে। মাছধরার একটি কেন্দ্র এটি। শান্ত পরিষ্কার আকাশে সীগাল উড়ছে, মাছধরা জাহাজ চলতে আরম্ভ করলে অনেকগুলি সীগাল জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে। ছোট ছোট কুটিরগুলিও বড় মনোরম। রোদ ওঠাতে বেশ গরম বোধ হচ্ছিল। জলে রোদের ঝিকিমিকি। সবশুদ্ধ মিলিয়ে যেন একটি তেলরঙে আঁকা ছবি।

একদিন ডার্টমাউথে (Dartmouth) গেলাম। এখানে ডার্ট নদীর মোহনা। নদীটি ইংলিশ চ্যানেলে পড়েছে। এখানে বিখ্যাত রাজকীয় নৌবিদ্যাশিক্ষা কেন্দ্র (Royal Naval College) আছে। কলেজ দেখতে বিশেষ অনুমতি লাগে। লাঞ্চের সময় হয়ে আসাতে আমরা একটা হোটেলে খেতে গেলাম। সেখানে এমন একটি জিনিস খেলাম যা পূর্বে খাইনি, পরেও না। সেটি হচ্ছে ঝিনুকের সুপ। খেতে ভালোই লেগেছিল, এবং বলে না দিলে টেরও পেতাম না। অচেনাকে চিনতে ঘর হতে বেরিয়েছি, বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন খাবারও এই চেনাকে অনেকটা সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে মানুষের মূল্য বোঝার পক্ষে ভিন্নদেশীয়

রান্নাবান্নার স্বাদ গ্রহণও প্রয়োজনীয় বলে আমার অন্তত ধারণা হয়েছে।

লাঞ্চ খেয়ে আমরা মোহনার কাছে গেলাম। একটা স্টীম বোট দাঁড়িয়েছিল। নদীর মোহনায় একটু বেড়াতে ইচ্ছা হওয়াতে মাঝিকে বলতে সে রাজী হল। নদী যেখানে সমুদ্রে মিশেছে, তার পর থেকেই উথাল-পাথাল ঢেউ। ঢেউ-এর দোলায় নৌকা তো মোচার খোলার মতো দুলতে লাগল। আমরা ভয় পেয়ে চেঁচাতে লাগলাম। মাঝি আবার নৌকা নদীর মধ্যে নিয়ে এল। চারিদিকে অপরূপ দৃশ্য। ইংলিশ চ্যানেলে গিয়ে কিন্তু মনে হচ্ছিল, সমুদ্র বেয়ে যদি একেবারে বাড়ি যাওয়া যেত, বঙ্গোপসাগর দিয়ে, গঙ্গা দিয়ে, তা হলে মা যে কত অবাক্ হতেন।

একদিন টেইনমাউথে বেড়াতে গেলাম। এখানে টেইন নদীর মোহনা আছে। এই মোহনায় মস্ত বড় বালির চড়া। চড়ায় অজস্র ছোট বড় জলধারা কুল্‌কুল্ করে বইছে। লক্ষ লক্ষ সামুদ্রিক পাখি সেখানে আসর জমিয়েছে। গৈরিক নদী সমুদ্রে মিশেছে, সমুদ্র ব্যগ্রব্যাকুল দুবাহু বাড়িয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। বিকেলটি খুব পরিষ্কার, আকাশে রঙের অপূর্ব শোভা। সমুদ্রতীরে অনেকে বেড়াতে এসেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামা পর্যন্ত আমরা তিন বন্ধুতে সেখানে মনের আনন্দে বেড়ালাম। একটি গদ্যকবিতায় টেইন মাউথের সৌন্দর্যের কিছুটা বর্ণনা করেছি, এখানে তার একটু তুলে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না,—

টেইনের মোহনায়
রঙে রসে জড়ানো কী অপরূপ সেই বিকেল!
আশ্লেষ ব্যাকুলা নদী
এঁকেবেঁকে সহস্রধা প্রসারিত,
মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ বালুচরে

ঝিরিঝিরি পাতলা জলের স্রোত,
তাতে ভীড় করেছে লক্ষ লক্ষ সাগর-বলাকা,—

...   .

তাদের উদাত্ত কণ্ঠের সাহানা সঙ্গীতে
বেলাভূমি মুখরিত।
তারি সাথে মিশেছে
আনন্দ-উদ্বেল সমুদ্রের চিরমিলনের গান।
বড় বড় ঢেউএর মাথায়
ছুল্‌ছে লক্ষ ফেনার ফুল,
লক্ষ মোতির হার।
আকাশেও সেই বিকেলে
টুক্‌বো মেঘে সোনা-সিঁদুর আলো।
তাবি আভায় জ্বলে উঠেছে
ফেনশীর্ষ সাগব তরঙ্গ,
টেইনেব গৈরিক জল,
আর দূবের পাইন বনস্থলী।

এরই মধ্যে ডেভনে এল বড়দিনের উৎসব। গতবছর লণ্ডনে সেই উৎসবের দিনে রাস্তায় বেরিয়ে বড় মুশ্‌কিলে পড়েছিলাম। পথঘাট মদের গন্ধে ম' ম' করছে। বাঁধভাঙ্গা আনন্দের উচ্ছ্বাস আমাদের কাছে একটু অতিরিক্তই মনে হয়েছে। সুতরাং এবার বড়দিনে বাইরে যাই নি। বাড়িতেই যে আনন্দ-উৎসব হল, তাতে যোগ দিলাম। আমাদের প্রত্যেককে বাড়ির কর্তা সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার ও ছোট ডায়েরী দিলেন। সারাদিনই খাওয়ার খুব ঘটা। সন্ধ্যাবেলায় লাউঞ্জে নানারকম হাসিখেলা ইত্যাদি হল। আমরা খুব সেজেগুজে মাথায় মস্ত বড় চন্দ্রমল্লিকা ফুল দিয়েছিলাম। আমাদের দেখাদেখি ছু-একজন ইংরেজ মেয়েও

বাগান থেকে চন্দ্রমল্লিকা এনে মাথায় পরল। শেরী শ্যাম্পেনের ছড়াছড়ি। আমরা তার বদলে লেমন স্কোয়াশ খেলাম।

বিলেতের পার্টিতে বয়স্ক গম্ভীর প্রকৃতির ভদ্রলোকেরা যে খেলা খেলেন সেগুলির অধিকাংশই ছেলেমানুষি। আমার মনে হয়, গাম্ভীর্যের গুরুভার সবসময়ে মাথার উপরে চাপিয়ে রাখা মানুষের পক্ষে কম ক্লান্তিজনক নয়। সুস্থসবল ভাবে বেঁচে থাকতে হলে এই ক্লান্তির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া অত্যন্ত দরকার। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি ছেলেমানুষ আছে। সে আমাদের শৈশবের সুখস্মৃতিতে গড়া চিরশিশু। অনেকে মর্যাদাহানির আশঙ্কা করে তাকে মোটেই প্রশ্রয় দেন না। তাঁদের কাছে দুনিয়াটা নিশ্চয়ই ভীষণ serious গুরুগম্ভীর বলে প্রতীয়মান হয়। ৺সুকুমার রায় মহাশয় বোধ হয় এঁদেরই বলেছেন 'রামগরুড়ের ছানা'। পৃথিবীর অনেক সহজ আনন্দের দ্বার এঁদের কাছে রুদ্ধ। সংসার ও কাজকর্ম এঁদের কাছে জগদ্দল পাথরেব মতো বাস্তব। মনের দুটো একটা জানালা খোলা থাকলে, ছেলেমানুষির খেয়ালখুশির বাতাসে ভারী পর্দাটা একটু উড়ে গেলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই, জীবন সম্বন্ধে আমার এইরকম ধারণা। বিলেতের লোকেও এ-কথা স্বীকার করে।

এইরকম ছেলেমানুষি খেলা ছাড়া সহজ আনন্দ সহজে উপভোগ করার পথ আরও আছে। যেমন, শিশুসাহিত্য পাঠ, শিশুদের উপযোগী অভিনয় দেখা, শিশুদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেশা, প্রকৃতিকে উপভোগ করা ইত্যাদি। মনের তারুণ্য এতে বজায় থাকে। পেয়িংটনে জ্যাক ও সিমগাছ (Jack and the Bean Stalk) নামে একটি বাচ্চাদের অভিনয় দেখে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। গল্পটা অবশ্য ঈষৎ পরিবর্তিত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সুন্দর সেজে এমন ভালো অভিনয় করল যে তিনটি ঘণ্টা সময় আমাদের সার্থক হয়েছিল।

তাছাড়া, প্রকৃতিকে উপভোগ করা যে ডেভনশায়ারে ভ্রমণের প্রধান অঙ্গ ছিল তা তো আগেই উল্লেখ করেছি। অত্যন্ত শান্ত, উত্তেজনাহীন নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশে সমুদ্র, পাহাড়, গ্রাম, —সব কিছুকেই রসিয়ে রসিয়ে আস্বাদ করেছি। শীতের প্রকোপ কম হওয়াতে আরও সুবিধা হয়েছে। শ্যামল বনানী, পাখিডাকা ছায়াঢাকা গ্রাম, সমুদ্রতীর, সাগর-বলাকার ডাকাডাকি, ছোট ছোট মাছধরা নৌকাগুলির কর্মতৎপরতা, সব কিছুই মনে মুক্তির আভাস এনে দিয়েছে, আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে আমি ক্ষুদ্র, খণ্ডিত, সীমাবদ্ধ। প্রকৃতিকে আস্বাদ করারও একটি বিশেষ কৌশল আছে। সেটি হচ্ছে সৌন্দর্যের সামনে চুপ করে বসে থাকা। বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়ানোর মধ্যেও আনন্দ আছে, তবে তার ধরন স্বতন্ত্র। ডেভনশায়ারে আমরা যখন সুন্দর দৃশ্যের সামনে আসতাম, সবাই চুপ করে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকতাম, তাই এমন করে নিসর্গের রূপসুধা পান করা সম্ভব হয়েছে। আবিষ্ট হয়ে প্রকৃতিকে দেখে তার ছবি মনে গেঁথে রাখতে হয়। পরে ধ্যান করলে সে চিত্র আরও উজ্জ্বল হয়। নানাবিধ সংস্কার ও কল্পনা তাতে খানিকটা বর্ণসংযোগও করতে পারে। এরকম সুন্দর স্মৃতি মনের মণিকোঠায় অনেক তোলা থাকতে পারে। এই কৌশল অভ্যাসসাপেক্ষ, এবং এই অভ্যাস গঠিত হলে খুব সহজে আনন্দলোকে প্রবেশ করার চাবিকাঠিটি খুঁজে পাওয়া যায়। টেইনমাউথের যে কবিতাটির অংশ প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেটি ঐ ভ্রমণের নয় বছর পরে লেখা। এখনও নির্জনে চিন্তা করলে মনে হয় যেন কাল গিয়েছি ওসব জায়গায়, —সে স্মৃতি এম্‌নি উজ্জ্বল, এম্‌নি মধুর।

এইরকম প্রকৃতির মুখোমুখি থেকে তার কাছ থেকে জীবনের অনেক পাথেয় সংগ্রহ করে বড়দিনের ছুটিটা কাটিয়ে লীড্‌সে ফিরে এলাম।

॥ এ্যাভন নদীর তীরে ॥

১৯৪৮ এর জুলাইএর শেষে লণ্ডনে এসেছি। দিনগুলি যে কোথা দিয়ে কাটছে টের পাওয়া যায় না। এরই মধ্যে ইভা খবর আনল, লণ্ডন মজলিসের দল একটা বাস রিজার্ভ করে শেক্‌স্‌পীয়ারের দেশ স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-এ্যাভন (Stratford-on-Avon)এ যাচ্ছে। বিদ্যা, ইভা ও আমি তিনজনেই ঠিক করলাম ঐদলের সঙ্গে যাব।

স্ট্র্যাটফোর্ড লণ্ডন থেকে পঁচাশি-নব্বই মাইল দূরে। সকাল নয়টার সময়ে বাস ছাড়ার কথা, ছাড়ল দশটার পরে, এবং শুনলাম রাতে ফেরা যাবে না। সেই শুনে দুজন মহিলা ভীষণ রেগে ফিরে চলে গেলেন। আমরাও খুব চেঁচামেচি করলাম, কিন্তু রয়ে গেলাম। ভাবলাম তিনজনে আছি, জলে তো পড়ব না, কোন একটা হোটেলে রাতটা স্বচ্ছন্দে কাটানো যাবে। কিন্তু না গেলে শৈশবের একটি সাধ অপূর্ণ থেকে যাবে।

বাস ছাড়লে সবাই গল্প করতে লাগল, কখনও বা সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে লাগল। এখানে আমরা সবাই ভারতীয় শুধু ড্রাইভার বাদে। একজন সাহেব আছেন দেখে কৌতূহল হল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এক বাঙালী মুখোপাধ্যায়বংশীয় ভদ্রলোকের স্ত্রী আইরিশ। তাঁদের দুটি ছেলে। একজন ভারতে ঠাকুরমার কাছে মানুষ, আর একজন আয়ার্ল্যাণ্ডে দিদিমার কাছে মানুষ। যাঁকে আমি সাহেব ভেবেছিলাম তিনি দিদিমার কাছে মানুষ ছেলেটি। আর, চেকোশ্লোভাকিয়ায় ঠাকুরমার কাছে মানুষ পুত্রটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি যতই ফর্সা হোন, আকৃতিতে প্রকৃতিতে হাবে ভাবে কথায় বার্তায় পুরোদস্তুর বাঙালী। এক পিতামাতার সন্তান দুই ভাই, দুই বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়াতে তাঁদের আকৃতি, ধরন,—সবই এমন ভাবে আলাদা যে, দেখলে আশ্চর্য লাগে।

পরিষ্কার সুন্দর দিন। ইংল্যাণ্ডের গ্রাম, সাজানো শস্যক্ষেত্র নয়নস্নিগ্ধকর। দুপুর বেলায় আমাদের সকলেরই ক্ষুধার উদ্রেক হল। কেউই সঙ্গে খাবার আনি নি। গ্রামের একটা সরাই খানায় গাড়ি থামানো হল। এতগুলি লোক নামতে দেখে সরাইখানার লোকেরা ঘাবড়ে গেল। খাবার বিশেষ কিছুই নেই। শেষে গ্রামের একটা খামার বাড়ি থেকে ডিম এনে ডিমভাজা, রুটি ও চায়ের ব্যবস্থা করল।

সেখানে একটি কাঠের দরজা দেওয়া গ্যারেজের ধরনের ঘর ছিল। সেটা খুলিয়ে ভিতরের বাথরুমে ঢুকে দেখি অবস্থা শোচনীয়। কাঠের বেড়া দেওয়া জায়গা, তার মধ্যে একটা বালতি বসানো, তার উপরে একটা কাঠের ফ্রেম। বালতি অত্যন্ত নোংরা, বহুদিন হল পরিষ্কার করা হয় নি। এরকম খাটা পায়খানা যে ইংলণ্ডের মতো সভ্য অগ্রসর দেশে আছে তা আমাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল।

বিকেলে সাড়ে চারটা নাগাদ স্ট্র্যাটফোর্ডে পৌঁছলাম। এক জায়গায় শেক্স্পীয়ারের মূর্তি রয়েছে। তার চারিদিকে হ্যামলেট, লোর্ড ম্যাকবেথ ইত্যাদির মূর্তি। সেখান থেকে গেলাম মহাকবির পত্নী অ্যান হ্থওয়ের (Anne Hathaway)র বাড়ি। অত্যন্ত সুন্দর সুরক্ষিত বাগান অজস্র পুষ্পসম্ভারে চিত্রিত। বাড়িটি বহু পুরাতন, অদ্ভুত ধাঁচের। এই বাড়ির ছবি অনেক সময়ে চকোলেটের বাক্সে, ট্রেতে দেখছি। ভিতরে ঢুকে সব দেখলাম। বড় বড় মোটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে কড়িকাঠ বানানো হয়েছে। বৈঠকখানা, অগ্নিকুণ্ড, ম্যান্টেলপীসে রাখা সেকেলে ঘরসাজানো মূর্তি, ফুলদানী ইত্যাদি, যে আসনে বসে ভাবী স্বামী স্ত্রী গল্প করতেন, সব কিছুই দেখলাম। শোবার ঘরে ভারী কাঠের পালঙ্কে খোদাই করা জবরজং কাজ। রান্নাঘরে সেকেলে বাসনপত্র, উনান প্রভৃতি। এসব দেখে মনটা যেন কেমন হয়ে গেল।

মনে হল, বিংশ শতাব্দী থেকে যেন অনেকটা দূরে সরে গিয়েছি।

সেখান থেকে গেলাম হেন্‌লি স্ট্রীটে শেক্‌স্‌পীয়ারের নিজের বাড়িতে। এ বাড়িটিও প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন। নীচের তলায় একটি সংগ্রহশালা আছে। অমর কবি যে ঘরে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সে ঘরে তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি আছে। তিনি যে ডেস্কে বসে পড়াশুনা করতেন সেটাও আছে। আগের বাড়ির মতো এর আসবাবও খুব পুরানো, তবে জায়গাটা একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগল। এই বাড়িটির বাগানও চমৎকার।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গেলাম। বিস্তা, ইভা ও আমি একটা হোটেলে গিয়ে পেটভরে খেলাম। তারপর এ্যাভন নদীতে মোটরলঞ্চ করে খানিকটা বেড়ালাম। নদীটি ভারী মিষ্টি। রাজহাঁস ধীর মন্থর গতিতে ভাসছে, নীচু নীচু পাথরের সেতু। দুই তীরে কোথাও ঝুঁকে পড়া উইলোর সারি, কোথাও বা বন্যগোলাপের গাছে মৌমাছির অলস গুঞ্জন, কোথাও বা বনঝোপে পাখির মন উদাস করা ডাক। এই সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ যেখানে কিশোর উইলিয়াম স্কুল পালিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তখনও গোলাপ এমনি করেই আকুল হয়ে ফুটত, তখনও উইলো এমনি করেই কার বিরহব্যথায় থরোথরো কাঁপত, তখনও আলোছায়াখচিত বনতলে বনের পরীরা এমনি করেই আসাযাওয়া করত। প্রথম কৈশোরে হাই রোড্‌স্‌ টু লিটারেচার (High Roads To Literature) পড়েছিলাম। কিশোর কবির স্বপ্নের মায়াকাজল পরানো চোখ দুটি আমাকেও আবিষ্ট করে রাখত। দেশ কালের গণ্ডী অতিক্রম করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেই সাগরপারের বালিকা এই এ্যাভনের বনবীথিকায় কতবার ঘুরে বেড়িয়েছে!··· তারপর বহুদিন কেটে গেছে। হঠাৎ এতদিন পরে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সেই এ্যাভন নদীর

তীরে দাঁড়িয়ে সেই ছেলেবেলাকার মুগ্ধতাটুকু আবার ফিরে পেলাম। আবার নতুন করে অভিভূত হলাম।

লঞ্চ ঘাটে এসে লাগল। ঘাটেও খানিকক্ষণ বসে রইলাম। বাচ্চা ছেলেরা হাঁসেদের খাবার দিচ্ছিল, তারাও নির্ভয়ে হাত থেকে খাচ্ছিল

সেখান থেকে একটা বাগানে গেলাম। সেখানে একটা ছোট যাদুঘর ছিল, কিন্তু দেরী হওয়াতে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাগানটি ভারী কায়দা করে করা। নানা বর্ণের ফুল দিয়ে মাটিতে নক্সা কাটা হয়েছে।

তারপর শেক্‌স্‌পীয়ারের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত থিয়েটারে (Shakespeare Memorial Theatre) গেলাম। এই বাড়িটি একেবারে আধুনিকতম স্থাপত্যের নিদর্শন। এখানকার পুরানো ধাঁচের বাড়িগুলির কাছে একটু বেমানানই লাগে। তবু, নদীর তীরে এই প্রাসাদটির সৌন্দর্য অস্বীকার করা যায় না। এই বাড়ি ব্রিটেন ও আমেরিকার শেক্‌স্‌পীয়ারের ভক্তদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থে নির্মিত হয়েছে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ঐ থিয়েটার হলে ওথেলো অভিনয় দেখলাম। মঞ্চ সাজানো অতি অদ্ভুত, সঙ্গীতও চমৎকার, আর অভিনয়ের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এমন সুন্দর অভিনয় আমি জীবনে দেখি নি। মঞ্চের দৃশ্য, অভিনয় সব কিছুই অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং জীবন্ত। কয়েকটি ঘণ্টা নিবিড় রসোপলব্ধির মধ্যে কাটল। বিশ্বকবির জন্মস্থানে বসে তাঁর নাটকের এমন প্রাণমাতানো অভিনয় দেখতে পেয়ে কৃতার্থ বোধ করলাম।

রাত সাড়ে দশটায় অভিনয় শেষ হল। তখন খেয়াল হল, পেটে আগুন জ্বলছে। একটা রেস্তোরাঁ থেকে কিছু খাবার কিনে নিয়ে এলাম। তারপর বাস ছাড়ল। বাড়ি পৌঁছলাম যখন, তখন রাত দুটো।

॥ ডেনমার্কের উদ্দেশে ॥

১৯৪৮এর আগস্ট। লীড্‌সের পড়াশুনা শেষ হয়ে গেছে, ইয়র্কশায়ারের একটি স্থানীয় শিক্ষাবিভাগে কাজ করাও সমাপ্ত। তারপর আমাকে ডেনমার্ক ও সুইডেনের বিদ্যালয়গুলি দেখতে যেতে বলা হল।

কাজের বিবরণী ঠিক করতেই বেশ কিছুদিন লাগল। ইণ্ডিয়া হাউস বলল আমার যাতায়াতের ব্যবস্থা করছে। লীড্‌স্ থেকে লণ্ডনে এসেছি, সেকথা পূর্ব পরিচ্ছেদেই বলা হয়েছে।

কদিন লণ্ডনে এমন পচা বর্ষা নেমেছিল, যেন বাংলা দেশের ভাদ্রমাস। টিপ্‌টিপ্‌ রিম্‌ঝিম্—আকাশের নানা ছন্দে কাঁদুনির আর বিরাম নেই। তারই মাঝে এক সন্ধ্যায় ওয়াটার্লু ব্রীজে টেম্‌স্ নদীর হাওয়া খাওয়ার উৎকট সখ জেগেছিল প্রাণে। ফলটা পেলাম হাতে হাতে। এক পায়ে লাগল ঠাণ্ডা, তাতে. ধরল বাত। অত দূরের যাত্রা, এ পা নিয়ে যাব কি করে? দস্তুরমতো চিন্তায় পড়লাম। বুড়ী ল্যাণ্ডলেডী বল্‌ল, 'কুছ্‌ পরোয়া নেই, মুশ্‌কিল আসান্ আছে আমার হাতে', ডেকে নিয়ে এল তার গৃহচিকিৎসককে। তিনি একটা ছুঁচ ফোঁড়ালেন ব্যথার জায়গায়, আর উপদেশ দিলেন, ট্যাক্সি করে চলাফেরা করতে।

ইণ্ডিয়া হাউসে আমার পাসপোর্টটা পাঠিয়ে দিলাম এই আশায় যে, ওরাই যদি ভিসাগুলি করিয়ে দেয়। পা একটু ভালো হলে ট্যাক্সি করে তাদের কাছে হাজির হলাম। সেখানে আমাকে ঐ পা নিয়ে দূরদেশে যেতে পারব কি না, ডাক্তারের মতামত কি, ডাক্তারের ফোন নম্বর কত ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা হল। ভিসা টিসা কিছুই করানো হয় নি, আমি চল্লিশ মিনিট বসে থাকার পর আমাকে জানানো হল, ওসব করার সময়ও ওদের.হবে না। তারপর কয়েকদিন ট্যাক্সি করে ঘুরে ঘুরে সব ভিসা করলাম। ইণ্ডিয়া

হাউস থেকে বলেছিল যে, হল্যাণ্ড ও জার্মানীর মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হবে, কিন্তু ফিরে আসার সময়ে সুইডেন থেকেই সোজা জাহাজ পাব। অতএব যাবার সময়কার ভিসাগুলিই শুধু করলাম।

তারপর, ইণ্ডিয়া হাউস থেকে টাকা নেওয়া এক অতি জটিল ব্যাপার। বহুকষ্টে যখন সব ব্যাপার শেষ হল তখন দেখি ১৪৫ পাউণ্ড আমার হাতে। এতগুলি টাকা নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাওয়া খুব নিরাপদ নয়। তাড়াতাড়ি নিকটস্থ টমাস কুকের অফিসে চলে গেলাম এবং ট্রাভলার্স্ চেক বানিয়ে নিলাম।

সব কাজই শেষ হল, শুধু টিকিট পাওয়া বাকি। রবিবার সকালে যাত্রা, শনিবার সকালে ইণ্ডিয়া হাউসে গেলাম টিকিট করাতে। তারা বল্‌ল টমাস কুকের অফিসে লোক গিয়েছে টিকিট আনতে। সাড়ে এগারটার সময়ে টিকিট এল। শুধু এ্যামস্টারডাম পর্যন্ত, এবং আমাকে ফিরেও আসতে হবে ঐ পথ ধরেই। তখন তো আমার মাথায় হাত। না করেছি প্রত্যাবর্তনের ভিসা, না কিছু।

আর একটা সমস্যা। এ্যামস্টারডামে নাকি এক রাত কাটাতে হবে। আমি কিছুই জানতাম না, থাকার কোন ব্যবস্থাই করিনি। ইণ্ডিয়া হাউস বল্‌ল, টমাস কুক্‌কে জিজ্ঞাসা কর, তারা হোটেলের নাম বলে দেবে। তখন সাড়ে এগারটা বেজে গেছে, শনিবারে বারোটার মধ্যে কুকের অফিস বন্ধ যে! পায়ের কথা ভুলে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ালাম। তারা দুটো হোটেলের নাম দিল। একটাতে আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করলাম, যদি তারা অস্বীকার করে আমাকে জায়গা দিতে, তখন আর একটাতে ফোন করতে হবে। সন্ধ্যার দিকে জবাব এল, জায়গা মিলবে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

পরদিন ভোরবেলা স্টেশনে গেলাম। সঙ্গে আমার বান্ধবীও

এসেছিল আমাকে ট্রেণে তুলে দিতে। আমার জায়গা রিজার্ভ করাই ছিল। সকাল নটা কুড়ি মিনিটে গাড়ি ছাড়ল। গাড়িতে একজন ভারতীয় ভদ্রলোক ছিলেন, পুণার দিকে তাঁর বাড়ি। তিনিও ডেনমার্কে যাচ্ছেন, কিন্তু সোজা জাহাজে করে।

বেলা সোয়া এগারটায় হারউইচ (Harwich) পৌঁছলাম। সেখান থেকে হুক অব হল্যাণ্ডের (Hook of Holland) জন্য জাহাজ ধরব। কাস্টম্‌সে বিশেষ কড়াকড়ি করল না, শুধু গয়নাগাঁটি আছে কিনা জিজ্ঞাসাবাদ করেই ছেড়ে দিল। এগারটা পঁচিশ মিনিটে জাহাজ ছাড়ার কথা ছিল, কিন্তু ছাড়ল দেড়টায়। জাহাজে প্রথম শ্রেণীরই টিকিট ছিল, সুতরাং বসার বেশ আরামই ছিল, কিন্তু জাহাজে উঠেই সবাই পাল্লা দিয়ে এত মদ খেতে লাগল যে গন্ধে দস্তুরমতো শরীর অস্থির করতে লাগল। সমুদ্রও খুব শান্ত ছিল না। দুপুরে লাঞ্চ খেয়ে একটু আরাম বোধ করলাম।

একচোট ঘুম দিয়ে উঠে দেখি, বিকেল হয়ে গেছে। নীল জলে বৈকালী আলোর মনমাতানো শোভা বেশিক্ষণ দেখার সৌভাগ্য হল না, কারণ তখন তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিতে হবে, এ্যামস্টারডামে কিছু জোটার সম্ভাবনা কম,—এই কথাটাই মাথার মধ্যে ঘুরছিল। খাবার ঘরে অলিম্পিক ফেরত হল্যাণ্ডের দল জটলা করছিল। ক্রমাগত মদ খেয়ে তাদের দিল খুলে গিয়েছিল। তারা চীৎকার করে অলিম্পিকের খেলার বর্ণনা করতে লাগল। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়ায় চেঁচাতে লাগল, 'ইণ্ডিয়া হকি খেলেছে ভাল, ও কি ইণ্ডিয়া না পাকিস্তান,. ওকে জিজ্ঞাসা কর।' এই বলে আমায় তারা জিজ্ঞাসা করল, আমার দেশ কোথায়। আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি শুনে মদ নিয়ে আমার হেল্‌থ্‌ ড্রিঙ্ক করল। আমি চুপ করে তাদের রকম-সকম দেখলাম।

জাহাজ দেরী করে ছাড়ার জন্য দেরী করে হল্যাণ্ডে পৌঁছাল।

জাহাজে আমাদের কাস্টম্‌সএর জিনিস ও টাকাকড়ি কি কি নিয়েছি লেখার ফর্ম্ (customs declaration form এবং money declaration form) দেওয়া হয়েছিল। সেগুলি দেখেই আমাদের ছেড়ে দেওয়া হল, কাস্টম্‌সে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করল না। যে ট্রেনটাতে করে আমাদের এ্যামস্টারডামে যাওয়ার কথা ছিল, সেটা দেরী দেখে আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। অবশ্য অন্য একটি ট্রেণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। রটারডাম, হারলেম ইত্যাদি জায়গার মধ্য দিয়ে ট্রেণ চলল। রটারডামে যুদ্ধের জন্য খুবই ক্ষতি হয়েছিল। তারপরে হল্যাণ্ড হিটলারের কাছে নতিস্বীকার করে। হারলেমের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে বহুদিন আগে পড়া 'ব্ল্যাক টিউলিপ' গল্পটির কথা বার বার মনে হতে লাগল। ছেলেবেলায় কল্পনায় রঙিন মনে হারলেমের কত চিত্রই এঁকেছিলাম। হঠাৎ যেন মনে হল, দূরদেশে এসে বন্ধুর দেখা মিলল অপ্রত্যাশিত ভাবে।

হল্যাণ্ডে সমুদ্র একেবারে জমির ভিতরে ঢুকে গেছে। পথে ঘাটে বাঁধ, সেতু, এই সবের প্রাচুর্য। রাস্তার ধারের বাড়িগুলিতে খুব পাতলা পর্দা। রাত হয়েছে, ঘরে ঘরে বিজলী বাতির সমারোহ, সুতরাং পর্দা ভেদ করে বাড়ির ভিতরকার জীবনযাত্রা স্পষ্টই চোখে পড়ল।

রাত সাড়ে দশটায় এ্যামস্টারডামে পৌঁছালাম। অনেকক্ষণ ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করে শেষকালে ট্যাক্সি পেলাম। সুইস হোটেলে (Suisse hotel) আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানে ভারী রাজসিক ব্যবস্থা। এক রাতের জন্য বলেই আমার এখানে ওঠা সম্ভবপর হয়েছিল।

খুব সাজানো ঘর, ঘরের সংলগ্ন বাথরুম। টাটকা ধবধবে বিছানা, তার পাশেই টেলিফোন। বিছানায় শোবামাত্র ঘুম।

পরদিন ভোর পৌনে সাতটার সময়ে হোটেলের পরিচারিকা

টেলিফোনে আমায় জাগিয়ে দিল। প্রাতরাশ খেতে গেছি,— হায় ভগবান, কন্টিনেন্টের ব্রেকফাস্ট এক পেয়ালা কফি ও সামান্য রুটি। তাই কোনমতে খেয়ে একটা ট্যাক্সি করে স্টেশনে গেলাম। সেখানে কুকের লোক আমাকে স্টকহোল্‌ম্‌ পর্যন্ত টিকিট দিল। গাড়িতে জায়গা রিজার্ভই ছিল।

আমার গাড়িতে একটি সুইস ভদ্রলোক ছিলেন, আর একটি সুইডিশ ছেলে ও একটি সুইডিশ মেয়ে ছিল। ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ সুন্দর দেখতে। সাজগোজের দিকে তার খুবই নজর আছে, নখগুলি তেকোনা করে কেটেছে। চুলে ঘন ঘন চিরুণী চালায়। কিশোর মুখে নম্র হাসি। প্রাণোচ্ছলতা খুব, তবে তার প্রকাশের গতিপথটা সব সময়ে খুব শোভন নয়। ছুনিয়াতে এসেছে যেন মজা লুটতে। প্যারিস তার ভালো লাগে, কারণ সেখানে ফুর্তি আছে। শান্ত জায়গা তার পছন্দ নয়। সব সময়েই বলে, 'Come, let us have some fun,' এসো একটু মজা করি, বলে হয় তাস বার করে, নয়তো নিজের মনেই পকেট-দাবা নিয়ে খেলে। সেই মেয়েটির সঙ্গে সে অল্পক্ষণেই খুব ভাব জমিয়ে নিল ও তাস খেলতে লাগল।

গাড়িতে ডাইনিং কার ছিল। লাঞ্চ খেলাম। প্রথমে একটু টিনের মাছ ও সামান্য স্যালাড্‌। তারপর পেয়ালায় করে ঘন সূপ। তারপর খুব সুন্দর চিকেন রোস্ট, বরবটি ও আলুসেদ্ধ। তারপর টার্ট, কফি, ন্যাসপাতি। সামান্য প্রাতরাশের পর খিদেটা খুবই হয়েছিল, সুতরাং খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। আমার সামনের টেবিলে ডেনমার্কের রয়াল এগ্রিকালচারাল কলেজের (Royal Agricultural College) অধ্যাপক বসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি তাঁর কলেজ দেখার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন।

তারপর গাড়ি হল্যাণ্ড ও জার্মানীর সীমানায় এল। এখানে

বহুক্ষণের জন্য গাড়ি থেমে রইল। বন্দুক ঘাড়ে সেপাইরা চারিদিকে পাহারা দিচ্ছিল। খানিক পরে আমাদের নেমে গিয়ে লাইন করে দাঁড়িয়ে পাসপোর্ট ও টাকা দেখাতে হল। সে এক মহা ঝঞ্ঝাট। সেটা শেষ হল তো কাস্টম্‌সের লোক গাড়ির মধ্যে ঢুকে হল্যাণ্ড থেকে কিছু কেনাকাটা করেছি কি না তাই দেখতে এল। আমি এক রাত ছিলাম শুনে আমার জিনিসপত্র ঘাঁটা-ঘাঁটি করল না, কিন্তু অন্যদের বাক্স খুব উল্টেপাল্টে দেখল।

অবশেষে ট্রেণ জার্মানীর মধ্য দিয়ে চলল। এটা ইংরেজ অধিকৃত অংশ। হামবুর্গ (Hamburg) দেখলাম,—অদ্ভুতভাবে ধ্বংস হয়েছে। জার্মানী দেখে গত বছর যে রকম ধারণা হয়েছিল, এ বছরও ঠিক সেরকমই হল। সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা দেশ, যেখানে মানুষের বসতি, সেখানেই ধ্বংসস্তূপ। অনেক বিরাট প্রাসাদ একেবারে চুণ-সুরকি ভাঙা ইঁটের রাশ হয়ে পড়ে আছে, তারই মাঝে হয় তো দুএকটি ঘর মানুষের বাসযোগ্য আছে, সেই ঘরের জানালায় পরদা, ছোট মাটির টবে লাল হলদে ফুল। আশ্চর্য লাগল! মনে হল, মানুষের অন্তরের সৌন্দর্য-প্রীতির প্রতীক হয়ে ঐ ছোট ফুলগুলি মানুষের হিংসাদ্বেষের চরম নিদর্শন এই বিরাট ধ্বংসস্তূপকে মৃদু হেসে ব্যঙ্গ করছে। বলছে, 'বন্ধু, তুমি পারলে না, মৃত্যুর প্রলয়ঙ্কর রূপের চেয়ে জীবনের জয়গান বেশি সত্য!' মলিন মুখে, নত মস্তকে স্ত্রীপুরুষ কাজ করছে, নগ্নপদ, বিরলবস্ত্র ছেলেমেয়ে রাস্তায় খেলা করছে, ট্রেণ থেকে রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিলে মহানন্দে দৌড়ে গিয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছে। জোয়ান ছেলে বিশেষ নাই, বেশির ভাগই বুড়ো বুড়ী। অনেকে প্ল্যাট্‌ফর্‌মে বসে আছে, কিসের আশায় কে জানে, কিন্তু মুখে কী দারুণ সর্বহারা ভাব! তারই মধ্যে, ইংরেজ অফিসারের গৃহিণীরাই হবেন বোধ হয়, ঠোঁট এঁকে, ভুরু এঁকে, এই গরমে কাঁধে মরা শিয়ালের ছাল ঝুলিয়ে আপাদমস্তক উগ্রসজ্জায় সেজে

উদ্ধত ভঙ্গিতে চলেছেন। এই সাংঘাতিক হতশ্রী দারিদ্র্যের মধ্যে বিলাসের উৎকট আড়ম্বর দেখাতে এঁদের এতটুকু সঙ্কোচ হয় না। জার্মানদের দুরবস্থা দেখে সুইডিশ মেয়েটি বারবার বলতে লাগল, 'বুঝি না, কি করে এই অবস্থায় মানুষ থাকতে পারে।' কয়েকবার একই কথা বলাতে আমি উত্যক্ত হয়ে বললাম, 'আমি খুব বুঝি, আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আমি দেখেছি। এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় মানুষ থাকতে পারে। আমি শুধু এইটা বুঝি না যে, মানুষ কি করে এত নিষ্ঠুর হতে পারে যে, মানুষকে এত কষ্ট দিতে পারে।' তখন মেয়েটি চুপ করল।

ক্রমে জার্মানীর অরণ্যপ্রান্তরে সন্ধ্যা নেমে এল। কী শান্ত, সুন্দর সন্ধ্যা! এ দেখলে কি একবারও মনে হয় যে, এই দেশের ভয়ে একদিন পৃথিবী কম্পিত হয়েছে? এই দেশের অধিবাসী অন্য দেশের লোকের প্রতি কত অমানুষিক অত্যাচার করেছে, এই আকাশ, এই বন্ধুর মতো প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত আকাশ একদিন বোমাবিস্ফোরণে বিক্ষুব্ধ হয়েছে? মানুষের মনে, তার মুখে চোখে ললাটে সে দুর্দিনের স্মৃতি এখনও গভীর রেখায় আঁকা আছে, কিন্তু প্রকৃতি উদাসীন! তাই আজও জার্মানীর ঘাসে ঘাসে পরম নিশ্চিন্তে ছোট ছোট নীল ফুলগুলি ফুটে রয়েছে, আজও তার বনবীথিকা তেমনই শ্যামল, আর, আজও সেই আশ্চর্য আরণ্য সমারোহে পাখির কাকলীর অভ্যর্থনার মধ্যে—

"নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা
সোনার আঁচল খসা,
হাতে দীপশিখা—।"

রাত গভীর হল। ভোর ছটায় ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে পৌঁছাব, সুতরাং ঘুমের জোগাড় করা গেল। সেই ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের কাঁধে মাথা রেখে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে শুল। কী বিচিত্র এদের মনের গঠন! প্রেমের কোন

প্রশ্নই ওঠে না এখানে। ওরা ট্রেনে ওঠার আগে পরস্পরকে চিনতও না। যাত্রাশেষেও চেনার কোন বালাই থাকবে বলে মনে হয় না। মেয়েটির হাতে আবার বাগদানের আংটিও রয়েছে। কোন কারণ বিনা সম্পূর্ণ অহেতুকভাবে এরকম ব্যবহারের মধ্যে খানিকটা স্ফূর্তি করা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? এ স্ফূর্তিরও অর্থ ঠিক বোধগম্য হল না।

বেশ ঘুম এসেছিল। রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ কাস্টম্‌সের অফিসাররা ঢুকল। তারা পাসপোর্ট দেখল, স্যুটকেশ দেখল। আমায় প্রশ্ন করল, 'কত সিগারেট ও মদ এনেছ?' আমি বললাম, 'ওসব খাই না, তাই আনিও নি।' বোধ হয় বিশ্বাস হল না, বলল 'বাক্স দেখব।' আমি গুটিশুটি হয়ে বসে ছিলাম, বললাম, "দেখ, উপরে আছে।" তারা জিনিসপত্র নামিয়ে খুব হাঁটকাতে লাগল। আমার বড় রাগ হল। রাতদুপুরে একী জ্বালাতন রে বাপু! আমি হাসতে লাগলাম ওদের কাণ্ড দেখে। আমার হাসি দেখে ওরা ভাবল, নিশ্চয় কিছু পাচার করে এনেছি। তখন জিনিসপত্র আরও লণ্ডভণ্ড করল। শেষ পর্যন্ত কিছু না পেয়ে আবার তুলে রেখে দিল। লাভের মধ্যে পরদিন ভোরবেলা টুথব্রাসটাই খুঁজে পেলাম না।

মাঝরাতে সুইস ভদ্রলোকটি ফ্রেডেরিকাতে নেমে গেলেন। তখন আমি আরাম করে বসলাম। খানিক পরে দেখি ছেলেটি ঘুমচোখে উঠে বসে ঢুলতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঘুমোবে নাকি?' বলল, 'I sleep.' সব ইংরেজী বেচারীর তখন গুলিয়ে গিয়েছে। আমি ওকে আমার বেঞ্চিটা ছেড়ে দিয়ে মেয়েটির বেঞ্চে এসে বসলাম। আমি বললাম, 'তুমি তো বেশি দূর যাবে, ভাল করে ঘুমাও গিয়ে।' সে খুবই কৃতজ্ঞ হল। সকালবেলা যখন কোপেনহেগেনে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, তখন ওরা বলল, 'পুনর্দর্শনায়।'

কোপেনহেগেনের স্টেশনটি বেশ বড় ও সুন্দর। আমার গন্তব্যস্থল ছিল এল্‌সিনোর (Elsinore বা Helsingör) এর আন্তর্জাতিক গণবিদ্যালয় (International Peoples' College)। প্রথমে তো কুলীদের কিছুতেই বুঝাতে পারি না যে, এল্‌সিনোরের জন্য টিকিট কোথায় কাটব। শেষকালে কুকের লোক দেখে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। সেই সব ব্যবস্থা করে দিল। ৭।৫ মিনিটে গাড়ি। ওয়েটিংরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুলাম।

কোপেনহেগেন থেকে এল্‌সিনোর ট্রেণে এক ঘণ্টার পথ। ডেনমার্ক কৃষিপ্রধান দেশ, সুন্দর ছবির মতো সাজানো। ছোট ছোট কুটীরগুলিতে গ্রামের সৌন্দর্য ও শহরের সুবিধা দুইই আছে। বাগান তো অজস্র। পথের ধারে ধারে প্লাম, পীচ, আপেল গাছ ফলভারে অবনত। স্বাস্থ্যবান ছেলে-মেয়েরা হাসিমুখে খেলা করছে। আকাশ ইন্দ্রনীলমণির মতো উজ্জ্বল।

এল্‌সিনোর স্টেশন থেকে আন্তর্জাতিক গণবিদ্যালয়ে (International Peoples' College) যাবার জন্য ট্যাক্সি নিলাম। কলেজটি মস্ত বড় বাগানের খুব সুন্দর পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। নানা রংএর বাহারী ফুলে চমৎকার শোভা হয়েছে। অফিসে যেতেই এক বৃদ্ধ আমাকে আমার ঘর দেখিয়ে দিলেন। দোতলার উপরে একটি ঘর, ছোট হলেও একেবারে নিজস্ব, সুতরাং খুবই খুশি লাগল। আরও খুশি লাগল, যখন প্রাতরাশের টেবিলে গিয়ে দেখি, এরা কন্টিনেন্টাল প্রাতরাশ খায় না, ডিম, পরিজ, দুধ, রুটি, মাখন, জ্যাম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে খায়। প্রাণখোলা হাসিতে, সাদর অভ্যর্থনায়, আন্তর্জাতিক প্রীতির আন্তরিকতায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মনে হতে লাগল, এরা আমার নিতান্তই আপনার।

॥ হ্যামলেটের দেশে ॥

এল্‌সিনোর শেক্‌স্‌পীয়ারের অমর সৃষ্টি রাজকুমার হ্যামলেটের দেশ। ডেনমার্কের একটি বিশিষ্ট বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র আন্তর্জাতিক গণবিদ্যালয় এল্‌সিনোরে অবস্থিত। আমার স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় শিক্ষা-বিষয়ক কর্মসূচীতে প্রথমেই ছিল এই কলেজে কিছুদিন পড়া। ডেনমার্কে যাত্রা করার আগেই ইংল্যাণ্ড থেকে চিঠি লিখে আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম।

অন্যান্য গণবিদ্যালয়ের মতো এখানেও বছরের নানা সময়ে নানারকম পাঠপরম্পরা আছে। শীতের পাঠ চলে নভেম্বর অথবা জানুয়ারী থেকে মার্চ, গ্রীষ্মের পাঠ এপ্রিল থেকে জুলাইএর মাঝামাঝি। তারপর থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত কতকগুলি পাক্ষিক ছুটির পাঠ (Vacation course) আছে। আমি ষোল থেকে তিরিশে আগষ্ট (১৯৪৮) ব্যাপী ভেকেশান কোর্সটিতে যোগ দিয়েছিলাম।

১৯২১ সালে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্থিক অনটনের জন্য নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একে বড় হতে হয়েছিল। ডেনীশ রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষ এবং এল্‌সিনোর পৌরপ্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়টিকে সাহায্য করেন। তা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন থেকেই অধিকাংশ অর্থ সংগৃহীত হয়। থাকা, খাওয়া ও বেতনের হার নিম্নলিখিতরূপ ঃ—এপ্রিল থেকে জুলাই—২৭ পাউণ্ড, নভেম্বর থেকে মার্চ—৪৫ পাঃ, জানুয়ারী থেকে মার্চ—২৭ পাঃ, পাক্ষিক (Vacation Course)—৯ পাঃ।

বিদ্যালয়টি প্রায় পনের একর জমিতে অবস্থিত। বিস্তৃত জমিতে ছাত্রনিবাস, ক্লাসঘর, শিক্ষক-আবাস, আস্তাবল প্রভৃতি অনেকগুলি বাড়ি আছে। একটি পুরাতন জমিদারের বাড়িতে প্রথমে ক্লাস হত। এখন সেখানে আফিস, ছুটি খাবার ঘর, এবং সপরিবারে

কলেজের কোষাগারিক ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লেনিংসএর ও অনেকগুলি ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা আছে। তার মাটির তলায় মস্ত বড় রান্নাঘর। আর একটি প্রকাণ্ড বাড়িতে ছাত্রাবাস, ব্যায়ামচর্চার স্থান, কমন রুম ইত্যাদি আছে। অন্য বাড়িগুলি এত বড় নয়। যে বাড়িতে ক্লাস বসে, তাতে বিবাট লেকচার হল এবং গ্রন্থাগার আছে। প্রত্যেক বাড়ির ধারে ধারে সারি দেওয়া মরশুমী ফুলের বাহার। ফলে, ফুলে, দীঘিতে সমৃদ্ধ বাগানটি সুন্দর। কোথাও চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, গোলাপের কুঞ্জ, কোথাও বা পরিপুষ্ট নাসপাতি-আপেলের ভারে গাছের নুয়ে-পড়া ডালগুলি। দু একর জমি নিয়ে একটি ফলের বাগান। শীত এবং গ্রীষ্মকালে পাঠের সময়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে সপ্তাহে পাঁচদিন (শনিবার বাদে) রোজ অন্ততঃ এক ঘণ্টা করে হয় রান্নাঘরে, নয় বাগানে কাজ করতে হয়। ডেনমার্ক কৃষিপ্রধান দেশ, ধরিত্রীমাতার সঙ্গে ডেনীশদের সম্পর্ক অতি নিবিড়। এই বাগানটিও তাদের সেবানিপুণ হাতের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয় নি।

নাম থেকেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বোঝা যায়। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দিক্‌কালের ব্যবধান বিভিন্ন দেশের মানুষের মিলনের পথে আর বিশেষ অন্তরায় নয়, অন্তরায় নিজের মনের সঙ্কীর্ণতা, দেশাভিমান ও জাত্যভিমান। এক একটি দেশকে বিরাট বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে বিচ্ছিন্ন করে দেখলেই এই সব সীমাবদ্ধতা আসে। তারই ফলে ঘটে মহা অনর্থ। নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের ভিত্তিতে ভাব আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতির মানুষের মিলনস্থল রচনা করে প্রকৃত গণতন্ত্রের পথ প্রসারিত করাই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। ডেনমার্কের গণবিদ্যালয়ের মূল প্রবর্তক গ্রণ্টভিগের (Grundtvig) আদর্শ অনুযায়ী এখানেও কথাবার্তা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে শেখানোর ব্যবস্থা আছে। অসাম্প্রদায়িক (Non-Denominational) খ্রীষ্টীয় আদর্শে জীবনকে অনুপ্রাণিত

করাও এখানকার আর একটি উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু সে আদর্শের সঙ্গে অন্য কোনও ধর্মের আদর্শের কোনও বিরোধ নাই। সব ধর্মের মূলনীতিগুলি মোটামুটি এক, এবং এখানেও সেই মূলনীতিতেই জোর দেওয়া হয়। এঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু বলেছেন : আমি এসেছি, যাতে তারা প্রাণ পেতে পারে, এবং তা প্রচুরভাবেই পেতে পারে। ("I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.") এই প্রাণ-প্রাচুর্যের কথা আমাদের উপনিষদেও শুনি। সেখানে ঋষি প্রার্থনা করছেন, "জীবেম শরদঃ শতম্ শৃণুয়াম শরদঃ শতম্" ইত্যাদি। এখানকার পড়ানোর ধরন, পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় এবং সর্বপ্রকার কার্যকলাপ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, সুবৃহৎ জগতের পটভূমিকায় পরিপূর্ণ জীবনের বৈচিত্র্যময় আস্বাদ লাভ করাই এর উদ্দেশ্য।

এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মূর্ত করে তোলার পশ্চাতে একটি বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব আছে। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পিটার ম্যানিকা (Mr. Peter Manniche) মহোদয়ের কথা বলছি। প্রতিদিন তাঁর অন্তর-সৌন্দর্যে নতুন করে মুগ্ধ হয়েছি। বৃদ্ধ নিজের হাতে এই আন্তর্জাতিক বিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন। তাঁর প্রাণখোলা হাসি, অনুপ্রেরিত অধ্যাপনা, বিশ্বের সঙ্গে ডেনমার্কের পরিচয়কে নিবিড় করার চেষ্টা—সবই আমাদের অত্যন্ত প্রীত করেছে। এত লোক যাতায়াত করছে এখানে, প্রত্যেকের বিষয়ে খুঁটিনাটি খোঁজটি পর্যন্ত ভদ্রলোকের নেওয়া চাই। মনেও রাখেন সব। একটা ব্যাপার আমার খুব ভালো লাগল। এই প্রতিষ্ঠানে জার্মান ছাত্রও আছেন। অথচ ডেনমার্ক যুদ্ধের সময়ে জার্মানীর অধিকারে এসে কম কষ্ট পায় নি। যেখানে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, সেখানে জাপানীর ও জার্মানের বিশেষ যোগদান নজরে পড়ে নি। ১৯৪৭ সালে প্রাগে নিখিল যুব-উৎসবে (World

Youth Festival) জার্মানীর দান চোখে পড়ে নি। ১৯৪৮ সালে অলিম্পিক খেলাতেও নয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ে জার্মানদের জানানো হয় সাদর নিমন্ত্রণ। ডেনমার্কের অন্যান্য স্থানেও লক্ষ্য করেছি, অত্যাচারী জার্মানদের ডেনীশরা অপেক্ষাকৃত সহজেই ক্ষমা করতে পেরেছে; ক্ষমাশীলতা বোধ হয় এদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। একটি জার্মান ছাত্র আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ে ছিলেন। তিনি বহুদিন যুদ্ধবন্দী হয়ে ছিলেন। দুঃখ-দুর্দশায় হতাশার ছাপ তাঁর মুখে বড় করুণ হয়ে ফুটত। ইংরেজ বন্ধুরা কখনও কখনও তাঁকে এড়িয়ে চলতে চাইতেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত ম্যানিকার আন্তরিক সমাদর থেকে তিনি কখনও বঞ্চিত হন নি। সমগ্র পৃথিবী শ্রীযুত ম্যানিকা একাধিক বার ঘুরেছেন। শান্তিনিকেতনে এসে কবিগুরুর সাক্ষাৎলাভের গল্প এঁর কাছে শুনেছি। ভারতবর্ষের দরিদ্র, অবহেলিত কৃষক-সম্প্রদায়ের উপর সহানুভূতিও এঁর অসীম। এক সন্ধ্যাবেলা ডেনমার্ক এবং ভারতবর্ষের কৃষির তুলনামূলক আলোচনার সময়ে তাঁর ভারতবর্ষের কৃষিসম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দগুলির (যথা রায়ত, খাজনা, তালুকদার, তহশীলদার ইত্যাদি) অনায়াস ব্যবহার এবং গাণিতিক হিসাবগুলির (Statistics) সাবলীল উল্লেখ আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত করে তুলেছিল। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে এরকম ব্যক্তিরই আখ্যা 'উদারচরিত', সাগরমেখলা বিপুলা বসুধা যাঁর কুটুম্ব, মনের দিগন্ত যাঁর বিশ্বের পরিধির সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে।

এ আবাসিক বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রা খুব চিত্তাকর্ষক। শিক্ষা এখানে কেবলমাত্র পুঁথিগত নয়, জীবনের নানাদিক বিকাশের সহায়ক। মেলামেশার মধ্য দিয়ে শিক্ষার উপর এখানে খুব জোর দেওয়া হয় বলে বিভিন্ন জাতির ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মেলা-মেশা এখানকার শিক্ষার অঙ্গ। যখন সেখানে ছিলাম, তখন

নিম্নলিখিত দেশ থেকে ছাত্রছাত্রী সমাগম হয়েছিল ঃ ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ভারতবর্ষ ,আফ্রিকা, আমেরিকা, সিংহল, হল্যাণ্ড, প্যালেস্টাইন। নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনার ফলে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যেত। প্রত্যেক দেশেরই কোন না কোন বিশেষ সমস্যা আছে। সেই সব আলোচনায় খুবই লাভ হত। কাফ্রী ছাত্রটি অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র। পশ্চিম আফ্রিকায় এঁর দেশ। সেখানকার আদিম অধিবাসীদের উপর কত রকম যে অন্যায় অত্যাচার চলে, তারই গল্প তিনি করতেন। একটি ডাচ্‌ ছাত্রী ছিলেন, সাম্রাজ্যবাদে তাঁর বিশ্বাস অগাধ। ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের জন্য অনেক সময়ে তিনি বাঁকা মন্তব্য করতেন। জার্মানীর ছাত্রটি দুঃখে কষ্টে একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন বলে কথা কইতে সঙ্কোচবোধ করতেন। তাঁকে তাই জার্মানীর সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে বিব্রত করি নি। সিংহলী ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অনেক শেখা গেল। প্রধানতঃ সিংহলী ভাষা এবং বৌদ্ধদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেই বেশি আলোচনা হত। প্যালেস্টাইনের দুটি আরব ছাত্রী ছিলেন, একজন মুসলমান, একজন খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টান ছাত্রীটি খুব প্রাণোচ্ছল ছিলেন। সর্বদাই তাঁর হাসি, সময়োচিত পরিহাস প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠান মুখরিত হত। আরবরা কি করে খ্রীষ্টান হয়, তা এক রবিবারে ধর্মসভায় তিনি অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বহুকাল আগে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রথম বিস্তারলাভের সময়ে এঁর পূর্ব পুরুষরা খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে অনেক বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে বহু কষ্টে তাকে লালন করেছিলেন। আরব-ইহুদী সমস্যাতে কিন্তু আরব মুসলমান ও আরব খ্রীষ্টানের মধ্যে কোনও মতদ্বৈধ হয় না। এক সন্ধ্যায় এই সমস্যাটিই বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল। তাতে আরব বান্ধবীরা নিজেদের মতামত ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন।

সান্ধ্য আলোচনাগুলি বাস্তবিক চমৎকার হত। একবার বিশ্বের ঐক্য আন্দোলন (One World Movement) সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং আলোচনা হল। তাতে ইউ. এন. ও. (UNO)র কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ডেনমার্ক, আরব, ভারত, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা, এই কয়টি দেশের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীরা কিছু কিছু বললেন। নানা বিরুদ্ধ মতের সমাবেশে সভাটি অত্যন্ত কৌতুকাবহ হয়েছিল।

আলোচনা ব্যতীত রোজই সকালে নিয়মিত ক্লাস হত। বিভিন্ন অধ্যাপকরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন—ডেনীশ সমবায়, ডেনীশ বিদ্যালয়গুলির সূচনা ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, জার্মান অধিকৃত ডেনমার্ক, ডেনীশ সাহিত্যিক, ডেনীশ ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন, ডেনমার্কের কৃষি-ব্যবস্থা। বিশ্বের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ডেনমার্কের দান নির্ধারণ করার পক্ষে এই বক্তৃতাগুলি অপরিহার্য।

এখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কতগুলি উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। অন্তরঙ্গতা এবং সহযোগিতার সুরে এখানকার জীবনবীণার তার বাঁধা। প্রতিবার খেতে বসার আগে সকলে দাঁড়িয়ে সমবেতভাবে একটি গান করতেন। এ গান কোনও বিশেষ প্রার্থনার নয়, জীবনের, আনন্দের, সৌহার্দ্যের গান। খাওয়ার পর শ্রীযুক্ত ম্যানিকা পরবর্তী কর্মসূচী সম্বন্ধে আলোচনা করতেন এবং প্রত্যেকের নাম ডেকে ডেকে ডাকের চিঠি বিলি করতেন। এভাবে চিঠি দেওয়াতে তাঁর খানিকটা সময় নষ্ট হত, কিন্তু এই ব্যাপারটি উপলক্ষ্য করে তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে যোগ রাখাটিকে আনন্দের বিষয় করে তুলেছিলেন। নানা বিদেশী নাম উচ্চারণের বিকৃতিহেতু অনেক সময়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করে একটি সরস পরিবেশ রচনা করত। রবিবার সকালে একটি করে ধর্মসভা (Fellowship Meeting)

হত। তাতে নানাদেশের লোক নিজেদের ইচ্ছামত ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলতেন। আমি তাতে সংক্ষেপে ভারতীয় উপাসনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে কয়েকটি উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করেছিলাম।

সন্ধ্যা বেলায় আলোচনা না থাকলে কোন না কোন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকত। একটি ডেনীশ ছাত্র ভারী চমৎকার পিয়ানো বাজাতেন। একটি ফরাসী ভদ্রমহিলার সঙ্গীতের সুরলহরী আজও আমার মনে ভাসে। এক সন্ধ্যায় সুইডেনের কৃষকদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁরা জাতীয় পোষাক পরে সুইডীশ লোকনৃত্য দেখালেন। একটি নাচ বড় মজার। এটি নাকি কোন জমিদার ছেলের আবিষ্কার। এর নাম ষাঁড় নৃত্য (Ox dance)। দুটি কৃষক বালকের সামান্য বচসা কি করে ক্রমশঃ প্রচণ্ড হাতাহাতিতে পরিণত হল, তাই এ নাচে দেখান হয়েছে।

বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান দেখতে নিয়ে যাওয়া এখানকার শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। এর উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—ডেনমার্ক ও সুইডেনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা এবং ডেনমার্কের বিবিধ সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ, ঐতিহাসিক স্থান, কৃষকের বাড়ি, সমবায় সমিতি, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ডেনমার্কের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে গণবিদ্যালয়ের (Folk High Schools) একটি বিশেষ স্থান আছে। এগুলি এখন বিশ্বের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু ডেনমার্কেই এর উৎপত্তি। দুনিয়ায় ডেনমার্কের বিশেষ দান এই গণবিদ্যালয়।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে ডেনমার্ক সাংঘাতিকভাবে পরাজিত হয়। তখন দিনেমারদের জীবনে নেমে এল ঘন

অন্ধকার, কোথাও এতটুকু আলোর রেখা নেই। এমন সময়ে জাতিকে রক্ষা করবার জন্য যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় নাম হচ্ছে, নিকোলাই ফ্রেডেরিক সেভেরিন গ্রণ্টভিগ (Nikolai Frederik Severin Grundtvig)। এই ঋষিপ্রতিম শিক্ষাগুরুর অপূর্ব মনীষা সেদিন ডেনমার্ককে পথ দেখিয়েছিল। ধনবণ্টনের বৈষম্য, গ্রামের লোকের দুরবস্থা, সাধারণ লোকের কষ্ট তাঁকে নিরন্তর ব্যথিত করত। সাধারণ লোকে যদি নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন না হয়, তারা যদি নিজেদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট না হয়, তবে কিছুতেই জাতিজাগরণ সম্ভবপর হতে পারে না। তাই তিনি খুললেন গণবিদ্যালয়, সাধারণ বয়স্কদের উন্নতির জন্য। এগুলি প্রকৃতপক্ষে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র।

এই গণবিদ্যালয়ের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে মাতৃভাষায় পড়ানো হয়। (অবশ্য, আন্তর্জাতিক গণবিদ্যালয়ে বাধ্য হয়ে বহুভাষায় পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।) ডেনমার্কের প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য এবং ডেনীশ সাহিত্য সম্বন্ধে জানা এখানকার পাঠের অঙ্গ। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কৃষির ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা থাকবে। ডেনীশ জাতীয় জীবনের বহুমুখী বাস্তব ধারার প্রকৃত উপলব্ধির জন্যই এগুলির প্রয়োজন। ভ্রমণ করার শিক্ষাগত মূল্যও স্বীকৃত হয়েছে। সঙ্গীতের স্থান এখানে খুব উচ্চে। শিক্ষা এখানে পুস্তকপ্রধান নয়, যতটা সম্ভব হাতে কলমে শেখানো বা আলোচনার মাধ্যমে শেখানোরই ব্যবস্থা। একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কোর্স হয়। যে সময়ে চাষীরা মাঠে ব্যস্ত, তাদের স্ত্রীদের অবসর, তখন মহিলাদের জন্য গৃহশিল্প-শিক্ষার কোর্স। আবার, যখন চাষীদের ফুরসৎ মিলল, তখন তারা এসে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করল। সাধারণ লোকের সচেতনতা

বৃদ্ধির ফলে ক্রমশঃ তারা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে শিখল, সমবায়-পদ্ধতিতে চাষবাস, পশুপক্ষীপালন, দুধমাখনের ব্যবসা প্রভৃতি হতে লাগল। ডেনমার্ক কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে চাষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি হতে লাগল। কি করলে ফসল ভালো হয়, কিসে গরু-শূকরের উন্নতি হয়, এসব বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণাও হল। মিলিত প্রচেষ্টার ফলে কাজ ভালো হল। এইভাবে গণবিদ্যালয়গুলি জাতীয় জীবনের উন্নতির সোপানের কাজ করেছে।

আন্তর্জাতিক গণবিদ্যালয় থেকে আমাদের বিভিন্ন গণবিদ্যালয় দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুটির কথা এখানে উল্লেখ করব। এ দুটি অবশ্য এল্‌সিনোরে অবস্থিত নয়। একটি হল হাম্‌লেবেকএ (Humlebœk) ক্রোগেরাপ গণবিদ্যালয় (Krogerup Hojskole)। এর বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে দিনেমারদের গণতন্ত্র ও নাগরিকতার বাস্তব ধারণা দেওয়া। সব রকমের রাজনৈতিক মতামত এখানে আলোচনা করা হয়। কার্যনির্বাহক সমিতিতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধি থাকে। কনজারভেটিভ (Conservative), সোস্যালিস্ট (Socialist), র‍্যাডিক্যাল (Radical), কম্যুনিস্ট (Communist) প্রভৃতি সব পার্টির ছেলেমেয়েরাই একসঙ্গে থাকে, সহযোগিতা শিক্ষা করে, এবং যখন মতদ্বৈধ হয় তখন অমায়িক ভাবে, বন্ধুত্ব বজায় রেখেই ভিন্ন মত পোষণ করে। দেশের দুর্দিনে এই প্রতিষ্ঠান অনেক কাজ করেছে। রাজনীতি যে সামাজিক মেলামেশার গণ্ডী বেঁধে দেয়, মানুষের কাছ থেকে মানুষকে তফাৎ করে দেয়, এই কুফলটুকু দূর করার বাস্তব প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ, সন্দেহ নাই।

অস্‌কিলা গণবিদ্যালয় (Roskilde Folk High School) আর একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান। এটি শ্রমিকদের নিজস্ব। নানা

বিভিন্ন প্রকারের কোর্স চলে। ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক সংঘ, রাজনৈতিক দল, সাংবাদিক সংঘ, ছুতার-মিস্ত্রীর সংঘ প্রভৃতি বিভিন্ন দল এসে এক-একটা পাঠ্যক্রম চালাতে পারে। এখানে কিন্তু শিক্ষণীয় বস্তু হচ্ছে প্রধানতঃ সাংস্কৃতিক। অর্থনীতি, জাতীয় বাজেট, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, জীববিদ্যা প্রভৃতি পড়ানো হয়। সাধারণ শ্রমিকের সংস্কৃতির মান উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস খুবই মূল্যবান্।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া, ডেনমার্কের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। ডেনমার্ককে বলা হয় সামাজিক পরীক্ষণাগার (Social Laboratory)। সরকার থেকে বহুপ্রকারেরই ব্যবস্থা আছে জনসাধারণের সুবিধার জন্য। আমরা একটা বৃদ্ধদের আস্তানা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে সরকার থেকে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মাসিক পেনশন ও থাকার জন্য খুব অল্প খরচে ফ্ল্যাট্ দেওয়া হয়। মস্ত বড় বাড়ি ভাগ ভাগ করা। সাধারণতঃ ছুটি ঘর, রান্নাঘর, স্নানাগার অথবা একটি ঘর, রান্নাঘর, স্নানাগার। আসবাবপত্র বাসিন্দাদের। রান্নার কাঁচামাল মিউনিসিপ্যালিটি থেকে রোজ সরবরাহ করা হয়, পেনসন থেকে তার দাম কেটে নেওয়া হয়। অধিকাংশ ঘরেই স্বামী-স্ত্রী 'বুড়োবুড়ী ছুজনাতে' থাকে। ঘরে ঘরে চতুর্দিকে শুধু ফোটো সাজানো। বুড়োবুড়ীর যৌবনকালের ছবি, অনেকগুলি নানা-বয়সের ছেলেমেয়েদের ছবি। ইয়োরোপে বিয়ের পর ছেলেরাও পৃথক্‌ভাবে থাকে। বুড়োবুড়ীর ঐ স্মৃতিই সম্বল। নাতি-নাতনীকে মাঝে মাঝে একটু চোখের দেখার সৌভাগ্য হয় তো সেই ঢের। একজায়গায় এতগুলি বৃদ্ধ থাকে, প্রায়ই কাউকে না কাউকে যম এসে টান দেয়। একবাড়ির বাসিন্দাদের হরদম শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে দেখাটা মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল বলে বোধ হল না।

অসহায় বৃদ্ধদের থাকার আলাদা জায়গা আছে। সেটা খানিকটা হাঁসপাতালের মতো। চলচ্ছক্তিরহিত বা স্মৃতিভ্রষ্ট বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সেখানে খুব যত্ন করে রাখা হয়। খুব পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা, নার্সরা দেখাশুনা করছে। মস্ত বাগানের ভিতরে বাড়ি। বাগানের বেঞ্চে অনেক বৃদ্ধ বসে আছে, গলায় চাক্‌তি পরানো। যারা হাঁটতে পারে অথচ কিছুদূরে গিয়ে পথ ভুলে যায়, তাদের জন্যই এই ব্যবস্থা। পুলিশ বা অন্য কেউ দেখলে তাদের নিয়ে চাক্‌তিতে লেখা ঠিকানায় পৌঁছে দেয়।

একদিন হ্যামলেটের দুর্গ বলে কথিত ক্রোনবোর্গ দুর্গ (Kronborg Castle) দেখতে গেলাম। অবশ্য, শেক্‌স্‌পীয়রের হ্যামলেট ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন্‌ বলেই শুনেছি। যাই হোক, এই দুর্গের ভিতরে একটা বিরাট প্রাঙ্গণ আছে, সেখানে মাঝে মাঝে হ্যামলেট অভিনয় হয়।

এই দুর্গে অনেক প্রাচীন জিনিসপত্র, ছবি, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি আছে। একটা চ্যাপেল আছে, কিন্তু প্রোটেস্ট্যাণ্ট হলেও হঠাৎ দেখলে মনে হয় রোমান ক্যাথলিক। অবশ্য, রোমান ক্যাথলিক গীর্জাতে যে সৌকুমার্য আছে, তার অভাব দেখলাম। সোনার জলে রংকরা মূর্তিগুলি শিল্পের নিদর্শন হিসাবে বড়ই খেলো মনে হল। একটা জায়গায় নৌবহর ও বাণিজ্যের যাদুঘর আছে। প্রাচীনকালে ডেনীশ বাণিজ্যপোত কোথায় কোথায় যেত, তার বিবরণ আছে। অনেক দিন আগে ভারতবর্ষে ডেন-মার্কের ঘাঁটি ছিল। তারা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে তা বিক্রী করে দেয়। তখনকার প্রাচীন ছবির মধ্যে দ্রষ্টব্য হিসাবে সব চেয়ে মূল্য দেওয়া হয়েছে সতীদাহের ছবিকে। সঙ্গে তার ইংরেজী বিবরণীও আছে। নৌসংক্রান্ত যাবতীয় মডেল, ছবি, চার্ট ইত্যাদি আছে। একটা ডুবুরীর পোশাক দেখে খুব খুশি হলাম। ছেলেবেলায় 'সাগরিকা' পড়ে ও ছবি দেখে কতবার কল্পনায়

ঐরকম একটা বিকট ভারী পোশাক পরে সমুদ্রের তলায় ডুব দিয়েছি।

অনেক ছবি আছে, অধিকাংশই ডাচ ও ফ্লেমিশ। বেশির ভাগ ছবিই বড় মাংসল, স্থূলরুচির পরিচায়ক। 'দেবদূতের পতন' নামে একটা ছবি আছে, তাতে দেবদূতদের মাংসপেশীর বাহার দস্তুরমতো ভাল্‌গার লাগে। একটা প্রকাণ্ড উঁচু টাওয়ার ছিল, তাতে চড়লাম। উপরে উঠতে দম বেরিয়ে গেল, কিন্তু উপর থেকে এল্‌সিনোরের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখলাম।

মাটির তলায় একটা কারাকক্ষ আছে। অন্ধকার বলে পথপ্রদর্শক কেরোসিনের কুপি হাতে আগে আগে গেল। সেটা একটা সাংঘাতিক জায়গা। ভীষণ স্যাঁতস্যাঁতে। স্থানে স্থানে জল চুঁইয়ে পড়ছে। এখানে বন্দীদের রাখা হত। একবার নাকি আটশ সুইডিশ সৈন্য এখানে বন্দী হয়ে ছিল। আমার তো পাঁচ মিনিটেই দম বন্ধ হয়ে এল। কি করে যে এরা দীর্ঘদিন ধরে এই আলোবাতাসহীন ভিজে জায়গায় বন্ধ ছিল,—আহা! একটা কোণাকৃতি জায়গা আছে যেখানে বন্দীকে ঠেলে ঠেলে শেষকালে একেবারে দেয়ালে ঘেঁষিয়ে লোহার দরজা আটকে দেওয়া হত। মাটির নীচে এই অমানুষিক বর্বরতা, আর মাটির উপরে নাচ, গান, মদ আর মোহিনী! কি জীবনই ছিল!

মাঝে মাঝে ডেনমার্কের পল্লীদৃশ্য দেখার জন্যও যাওয়া হত। ছোট ছোট গ্রাম। কৃষকরা সমবায়-পদ্ধতিতে কাজকর্ম করে। পশুপক্ষীপালনের কেন্দ্র দেখতে গিয়ে বাস্তবিক চমৎকৃত হয়েছি। মুরগীর ডিম এক একটি হাঁসের ডিমের মতো বড়। মুরগীগুলিও রাক্ষুসে। শূকরের তোয়াজ খুব। বীট, গাজর, আলুসেদ্ধ মাখনতোলা দুধ, শস্য—এই সবই ওদের খাবার। পরিষ্কার শান-বাঁধানো লম্বা লম্বা ঘরে খোঁয়াড়ের মধ্যে থাকে। কাদায় গড়াগড়ি করার অনুমতি নেই বেচারীদের। এটা কিন্তু লক্ষ্য

করেছি যে, শূকর যত ভালো করেই রাখা হোক, তার গায়ের এমন একটা নিজস্ব বোট্‌কা গন্ধ আছে, যেটা সেই পরিচ্ছন্ন জায়গাতে গেলেও টের পাওয়া যেত। গরুর বাঁট থেকে দুধ দোয়া হয়ে একেবারে মাখনতোলা হয়ে বোতলে ভর্তি হবার নানা যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে।

একটি চাষীর বাড়িতে বেড়াতে যাবার গল্পটা বলি। আপেল পীচের দিগন্তবিস্তৃত বাগান। রসে ভর্তি আপেলগুলি মাটিতে নুয়ে পড়তে চাইছে। সেই বাগানের মধ্য দিয়ে এক বিরাট খামার বাড়িতে গেলাম। বাড়ির চাল খড়ে ছাওয়া। উঠোনে একটা ঝক্‌ঝকে মোটর দাঁড়িয়ে। বাড়ির বারান্দায় প্যারাম্বুলেটারে হৃষ্টপুষ্ট শিশু শুয়ে হাত-পা নাড়ছে। এপ্রণপরা গৃহকর্ত্রী এসে আমাদের নিয়ে লাউঞ্জে বসালেন। রংকরা দেয়ালে সুরুচিসঙ্গত ছবি। অগ্নিকুণ্ডের উপরের তাকও খুব সাজানো। বড় বড় কুশনযুক্ত সোফা, বড় রেডিও, মেঝেতে কার্পেট বিছানো। গৃহিণী সমাদর করে পলকাটা কাঁচের গ্লাসে ফলের রস দিলেন, তাঁর নিজের হাতে তৈরী। আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে এটা কৃষকের বাড়ি। সরবৎ খাবার পর গৃহিণী তাঁর সব ঐশ্বর্য দেখাতে নিয়ে চললেন। মস্ত বড় শেডের ভিতরে অনেক যন্ত্রপাতি আছে। একটা কল-লাগানো গাড়ি আছে। তা দিয়ে আলুর ক্ষেত থেকে আলু তোলা যায়। আলু মাটি থেকে উঠে মোটামুটিভাবে পরিষ্কার হয়ে একটা পাত্রে জড় হয়। এক জায়গায় অনেক তামাকপাতা শুকোচ্ছে। মাঠে গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড ষাঁড়ের নাকে লোহার কড়া ও চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। সেটা ফোঁস্ ফোঁস্ করছে আর খুর দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে। ডেনমার্ক উন্নততর পশুপক্ষী প্রজননের উপরে খুব জোর দেয়। কৃষকের ঐশ্বর্যসম্পদ দেখে আমার তো অত্যন্ত আশ্চর্য লেগেছে। গৃহস্বামীর সঙ্গে মাঠে দেখা হল, তিনি তাঁর

রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধেও খানিক আলোচনা করলেন। ডেনমার্ক যদি পারে, আমরা কি পারি না আমাদের দেশ এরকম স্বাস্থ্যে সম্পদে ঝল্‌মল্‌ করে তুলতে, আমাদের চাষীভাইদের জীবনযাত্রার মান এরকম উন্নত করে তুলতে,—এইসব ভাবতে ভাবতে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলাম।

একদিন এল্‌সিনোরের কাছে হর্নবেক (Hornbœk) ও Gilleleje নামে দুটি স্থানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সমুদ্রের ধারে ছোট্ট জায়গা। প্রাকৃতিক শোভা মনোরম। অধ্যক্ষ ম্যানিকা তো মহোৎসাহে সাঁতারের পোশাক পরে সমুদ্রে ঝাঁপ খেতে লাগলেন। কিছু কিছু জাহাজ এদিক ওদিকে বাঁধা আছে। নীচু পাহাড়ের গায়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। অনেকটা বেড়িয়ে রাতে বাড়ি ফিরলাম।

মাঝে মাঝে এল্‌সিনোরেই বেড়াতে যেতাম একা একা। ডেনমার্ক এবং সুইডেনকে বিভক্ত করছে একটি সমুদ্রের অংশ। এটি একটি প্রণালী অর্‌ সুণ্ড (Ore Sund)। এই প্রণালীর দুইদিকে দুই সমুদ্র। দক্ষিণে বাল্টিক (Baltic) ও উত্তরে ক্যাটেগাট (Kattegat)। প্রণালীটির সবচেয়ে সরু অংশে এই এল্‌সিনোর। এটাই যেন প্রণালীর মুখের মতো। এই মুখকে রক্ষা করছে ক্রোনবোর্গ দুর্গ। এল্‌সিনোর শান্ত, পরিচ্ছন্ন শহর। রাস্তার দুধারে বাড়িগুলি ছবির মতো সাজানো। প্রত্যেক বাড়িতে বাগান। অনেক বাড়ির একতলার জানালায় ছোট ছোট আয়না আটকানো আছে, তাতে ঘরে বসে রাস্তা দেখা যায়। এটা খুবই মজার লেগেছিল। বড় রাস্তা ধরে সোজা চলে গেলে বাজারের মধ্যে এসে পড়া যায়। তার বাঁদিকে স্টেশন, পোস্ট-অফিস ও সমুদ্র (Ore Sund)। আমি প্রায়ই সমুদ্রের ধারে বসে থাকতাম। নীল আকাশে বাংলাদেশের শরতের আমেজ। ধারে ধারে বন্যগোলাপের ঝোপে ফল এসেছে।

সমুদ্রের ধারে একজায়গায় একটা স্ট্যাচু—একটা নগ্নমূর্তি অনেকগুলি বিরাটকায় সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

বেড়িয়ে ক্লান্ত বোধ করলে কোনও দুধের দোকানে ঢুকে দুধ কিনে খেতাম। ডেনমার্কে তৃষ্ণানিবারণের এই এক সহজ উপায়। পথে ঘাটে প্রচুর দুধের দোকান। নানা আকারের বোতল আছে। খেয়ে বোতলটি রেখে গেলেই চলে। আমি মাঝে মাঝে বোতল বাড়িতেও নিয়ে আসতাম, পরদিন ফেরত দিতাম। একদিন এরকম একটি বোতলে অর্ধেকের বেশি দুধ ছিল। খেতে না পারায় সেটি টেবিলের উপরে অম্‌নি ফেলে রেখেছিলাম। সকাল বেলায় দেখি, সব দুধটা জমে দই হয়ে গেছে, মুখে দিয়ে দেখি অতি সুস্বাদু দই। ডেনমার্কে ক্রীমও খুব ভালো পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের কাছে এগুলি সহজলভ্য বলেই সবারই স্বাস্থ্য এমন সুন্দর।

এল্‌সিনোরে দিনগুলি আনন্দেই কেটেছে। এম্‌নি করে বিদায়ের মুহূর্ত এল ঘনিয়ে। একদিন ভোরবেলার ট্রেনে ডেনমার্কের অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি দেখবার জন্য এল্‌সিনোরকে পিছনে ফেলে চলে আসতে হল।

নানা জটিলতার জালে আচ্ছন্ন জীবন। কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে আজও মনে পড়ে ডেনমার্কের একটি নিভৃত কোণে শুনেছিলাম অন্তরের বন্ধনমোচনের সঙ্গীত, সহজ মানবিকতার সুরে গাওয়া। হিংসাদীর্ণ পৃথিবীতে তার মূল্য কেই বা দেবে ?



॥ ডেনমার্কের রাজধানীতে ॥

জার্মানীর উত্তর তীর থেকে ডেনমার্ক উঠেছে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার একটি অংশ এই দেশ। জাট্‌ল্যাণ্ড (Jutland) নামে একটি বড় উপদ্বীপ, ফুনেন (Funen) এবং জীল্যাণ্ড (Zealand) নামে দুটি বড় দ্বীপ, লোল্যাণ্ড (Lolland) ও ফল্‌স্টার (Falster) নামে দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট দ্বীপ ও প্রায় পাঁচশো ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি এই ডেনমার্ক। এদিকে ওদিকে সমুদ্র, তার অসংখ্য খাঁড়ি জমির মধ্যে ঢুকে তীররেখাকে অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

ডেনমার্ক ছোট্ট, মিষ্টি দেশ, হিমালয় বা আল্‌প্‌সের মতো বিরাট পর্বতশ্রেণী বা শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্য,—কিছুই এখানে নেই. সমুদ্রও যেন মানুষের সঙ্গে একটি অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের বাঁধনে আবদ্ধ।

ডেনমার্কের জমি উঁচু-নীচু, আবহাওয়া সমঅক্ষরেখাস্থিত অন্যদেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহনীয়। প্রকৃতি ও মানুষ দেশটিকে সুন্দর, শোভন করে তোলার কাজে একসঙ্গে হাত লাগিয়েছে। বড় বড় বীচের স্নিগ্ধ ছায়া। মাঠে মাঠে ফুলের গালিচা, সমুদ্রের উপরে আকাশ নত হয়ে পড়েছে। যাতে প্রকৃতির সৌন্দর্য সকলে উপভোগ করতে পারে সেজন্য রাস্তাঘাট খুব সুন্দর করে তৈরী। কৃষিপ্রধান দেশ, খাবার প্রচুর উৎপন্ন হয়। তার অনেকটাই অবশ্য বাইরে চালান যায়। ধনী দরিদ্রের পার্থক্য খুব উদগ্র নয়। ধনবণ্টনের মধ্যে মোটের উপর একটা সাম্য আছে। মোটামুটিভাবে সকলেই যাতে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে তার জন্য সমাজকল্যাণকর বহুবিধ ব্যবস্থা বর্তমান। মোটের উপর ডেনমার্ক সুখী, সমৃদ্ধ দেশ।

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন (Copenhagen),

ডেনীশ ভাষায় কোব্‌ন্‌হাব্‌ন (Kobenhavn)। একথাটির অর্থ—সদাগরদের বন্দর। দ্বাদশ শতাব্দীতে বিশপ এ্যাবস্যালন (Bishop Absalon) নামে এক পাদ্রী এই বন্দরটির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মূর্তি কোপেনহেগেনের টাউনহলের প্রবেশ-মুখে দেখতে পাওয়া যায়। সেই থেকে ধীরে ধীরে শহরটি গড়ে উঠেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই শহর ডেনমার্কের রাজধানী হবার সম্মান লাভ করে। ডেনমার্কের প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোকের বাস এই কোপেনহেগেনে।

কোপেনহেগেনে এসে প্রথমেই যা আমার নজরে পড়েছিল তা হচ্ছে পথে ঘাটে অবিশ্রাম সাইকেলের স্রোত। এত সাইকেল একসঙ্গে বাস্তবিকই আর কোথাও আমি দেখি নি। এমন কি, মা বাবারা খুদে বাচ্চাগুলিকে পর্যন্ত একটা বেতের ঝুড়িতে বসিয়ে সেটা হাতলের সামনে আটকিয়ে নিয়ে চলেছে। আমার সঙ্গে যাঁরা দেখাসাক্ষাৎ করতে এসেছেন, তাঁরা অনেক সময়েই রাস্তার ধারে সাইকেল দাঁড় করিয়ে আমার বাড়িতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছেন। পরে দেখে আশ্চর্য হয়েছি, সেই সাইকেল তেমনি আছে, কেউ ছোঁয় নি।

ডেনমার্কে অবস্থানকালে কোপেনহেগেনে মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করতে হত। একবার গিয়ে দিনকতক ছিলামও। এল্‌সিনোরে এক সাংবাদিক ভদ্রমহিলার সঙ্গে খুব আলাপ হয়। তাঁর নিমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতেই সে কয়দিন কাটিয়েছি। তাঁর নাম শ্রীমতী ঈডিথ রিসেল। আতিথেয়তায় দিনেমাররা তুলনাহীন। ভদ্রমহিলা আমাকে এত যত্ন করতেন, বেশি করে খাবার জন্য এত অনুরোধ করতেন যে বাস্তবিকই লজ্জা পেতাম। তাঁর বাড়িতে আমি এমন স্বচ্ছন্দভাবে ছিলাম যে, কয়েকটি বন্ধুকে নিয়ে একবার সেখানেই চা খাইয়েছিলাম। একটি পরিচারিকা নিয়ে ভদ্রমহিলা একাকী সেখানে থাকতেন, যাকে বলে আমীরী চালে।

কোপেনহেগেনে দ্রষ্টব্য জিনিস অনেক আছে। আমি ঘুরে ফিরে অনেকটাই দেখেছিলাম। বহু সুন্দর ভাস্কর্যের নিদর্শন এখানে আছে। একটি চমৎকার ফোয়ারা আছে, তার মাঝখানে একটি নর্ডিক পৌরাণিক কাহিনী রূপায়িত। দেবী জিফঁ (Gefion) তাঁর চারটি ছেলেকে ষাঁড়ে পরিণত করে তাদের সাহায্যে সারা জীল্যাণ্ড চাষ করে সুইডেন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন, এই কাহিনীই সেখানে ক্ষোদিত। শৌর্যবীর্যের চমৎকার প্রতীক।

সুণ্ডের (Sund) জলের মধ্যে কয়েকটি পাথর বসানো। তার উপরে হ্যান্স এণ্ডারসেনের জলপরীর ব্রোঞ্জের মূর্তিটিও অনবদ্য। শান্ত সমুদ্রের বুকে যখন ধীরে ধীরে নেমে আসত সন্ধ্যার মায়া, জাহাজের মাস্তলের কাছে উঁকি দিত সন্ধ্যাতারা, তখন আমাকে মোহিত করে রাখত ওই সাগরিকার বিষাদময়ী প্রতিমা, মানুষের প্রতি অনুরাগে যার নয়নে বেদনার আভাস।

এখানকার চিড়িয়াখানা ও কৃত্রিম জলাশয় বেশ সুন্দর। টিভোলি (Tivoli) নামে একটা পার্ক আছে, তার মধ্যে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা। খানিকটা কার্নিভ্যালের মতো লাগে। সন্ধ্যাবেলায় সেখানে বেড়াতে গেলে বিভিন্ন আলোর সমাবেশ দেখে নয়ন তৃপ্ত হয়। কোথাও ফোয়ারার জল-কণায় লাল নীল আলো রামধনুর সৃষ্টি করছে, কোথাও বা দেয়ালী উৎসব। নানারকমের ম্যাজিক, নাগরদোলা ইত্যাদি আছে। একটা ব্যাপার কিন্তু আমার ভালো লাগে নি। সেটি হচ্ছে জুয়া খেলা। জুয়ার দোকানগুলিতে ভীড়ও অসম্ভব। জুয়ার প্রশ্রয় দেওয়া নৈতিক চরিত্রের হানিকর বলে মনে করি। এক জায়গায় দেখলাম, কিছু পয়সা দিলে একটা কিছু ছুঁড়ে অনেকগুলি কাপডিশ ভাঙতে পারা যায়। চীনেমাটির ডিশগুলি ভেঙে পড়ার শব্দে লোকদের কী উল্লাস! দেখে মনে হল, এর একটি মনস্তাত্ত্বিক মূল্য হয়তো রয়েছে। ধ্বংস করার প্রবৃত্তি আমাদের

প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে কিন্তু সে প্রবৃত্তির বিকাশ প্রায়ই সামাজিক জীবনের অনুকূল নয়। এভাবে হয়তো তার খানিকটা তৃপ্তি হতে পারে। খুব সুন্দর নাচগানের ব্যবস্থাও রয়েছে আকাশের তলায় তৈরী মঞ্চে। টিভোলি না দেখলে কোপেনহেগেনের জীবনের এক অংশ দেখা বাকি থেকে যায়।

ডেনমার্কের গণবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা গ্রুণ্টভিগের নামে উৎসর্গীকৃত গীর্জাটি অনুপম স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। গীর্জার অরগ্যানের মতো আকৃতি অনেকটা। ভিতরে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল নিরাভরণ সৌন্দর্য। অলঙ্করণের অভাব যে কি ভাবে অলঙ্কারের পর্যায়ে পড়তে পারে, তা এটি না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। খুব ভালো গদ্যকবিতার সঙ্গে এর তুলনা দেওয়া চলে বোধ হয়। রাষ্ট্র ও দেশবাসীরা চাঁদা তুলে এই স্মারকচিহ্নটি তৈরী করেছে। দেখে মনে হয়, যে হৃদয় কুটিলতা জানত না, যার দাবী ছিল সহজ ও সত্য, সেই ভক্তের বিরাট ভক্তি-উচ্ছল হৃদয়টিকেই যেন এই মন্দিরটি রূপ দিয়েছে। পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ মন্দিরের সমপর্যায়ে এটি অনায়াসে আসতে পারে।

কোপেনহেগেনে ভালো যাদুঘরেরও অভাব নেই। আমি দুটি দেখেছি। একটি হল জাতীয় যাদুঘর (The National Museum)। এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ডেনমার্কের ইতিহাস বর্ণনা করা আছে। নানাবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রীতে যাদুঘরটি পূর্ণ। প্রস্তর ও ব্রোঞ্জযুগের সংগ্রহটি আমার ভালো লেগেছিল। এ ছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ডেনমার্কের গোপন ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করে যে প্রদর্শনীটি রয়েছে, সেটিও খুব মর্মস্পর্শী।

গ্লিপ্‌টোটেক (Glyptotek) নামে আর একটি যাদুঘর দেখেছিলাম। কার্লস্‌বার্গ মদচোলাইএর কোম্পানী দ্বারা এই যাদুঘরটি স্থাপিত হয়, এবং এর টাকাতেই এটি চলছে। এখানে

বহু রোমান মূর্তি, মিশরীয় প্রাচীন সামগ্রীর সংগ্রহ, পুরাতন ফরাসী চিত্র ইত্যাদি আছে। এখানে বাগানে একটা ছোট্ট চৌবাচ্চা মতো আছে, তার মধ্যে সাদা পাথরের একটি অপরূপ মাতৃমূর্তি আছে। এটি একজন ডেনীশ শিল্পীর কাজ। একরাশ অত্যন্ত কচি বাচ্চা মাকে ঘিরে আছে; কাঁধে, কোলে, হাতের কাছে, পায়ের কাছে ভীড় করেছে। দেখে মনে হল, প্রকৃতিমায়ের চমৎকার রূপ। অবশ্য, ভাস্কর্যের ধরন ভিন্নপ্রকারের হলে বলতাম মা ষষ্ঠীর মূর্তি। ভাবটা সেই রকমই। শুধু এই মূর্তিটি দেখবার জন্য আমি একাধিকবার ওই যাদুঘরে গিয়েছি।

কোপেনহেগেনের অনেকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছে। এখানে অনেক স্কুলেই ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক: কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কথা সংক্ষেপে বলছি। রাজকীয় পশুচিকিৎসা ও কৃষি মহাবিদ্যালয়টি (Royal Veterinary and Agricultural College) খুব চিত্তাকর্ষক। এটি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছে। এই বিষয়গুলি এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়,—পশুচিকিৎসা, কৃষি, জমি জরীপ, হর্টিকালচার, অরণ্যবিদ্যা (Forestry), ডেয়ারী বিজ্ঞান। নিয়মিত পাঠ ছাড়া নানাবিধ বিশেষ পাঠের ব্যবস্থাও এখানে আছে। এখানে পশুদের জন্য হাঁসপাতাল, পরীক্ষামূলক কৃষি-ব্যবস্থা এবং একটি বটানিক্যাল বাগান আছে। এখানে মাস্টার্স্ ডিগ্রী ও ডক্টরেট পর্যন্ত দেওয়া হয়। এখানকার একজন অধ্যাপকের আমন্ত্রণ ক্রমে এসে খুবই লাভবান হয়েছি মনে হয়। ডেনমার্কের জাতীয় জীবনে কৃষি ও পশুপালনের স্থান সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করেছি। এ সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানটি খুবই উচ্চ মানের। এখানে পড়ার খরচ অতি সামান্য। একরকম ফ্রী বলা চলে।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখেও খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। এটি ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রই এর পরিচালনার ভার

নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি আবাসিক নয়। এখানে পড়াশুনা করার পাঁচটি ধারা আছে,—ধর্ম, আইন ও অর্থনীতি, চিকিৎসাবিদ্যা, আর্ট্‌স্‌ এবং বিজ্ঞান। এখানকার কাজকর্মের মূলনীতি হল ছাত্ররা যাতে নিজেদের কাজ নিজেরা করে নিতে পারে, সেইটে শেখানো। প্রত্যেকটা বিষয়ে ধরে ধরে বিদ্যা গিলিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি এখানে অনুসৃত হয় না। একটা উপাধি পেতে গেলে যে পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হতে হয়, তাদের মধ্যেকার ব্যবধানের একটি উর্ধ্ব সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সীমার মধ্যে যখন একজন ছাত্র নিজেকে যথেষ্ট প্রস্তুত মনে করবে, তখনই সে পরীক্ষা দিতে পারবে। এবিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এখানে ম্যাট্রিকুলেশনের ফি বাবদ বাইশ ক্রোনার লাগে। তাছাড়া কোনও কোনও বিশেষক্ষেত্রে বছরে পঞ্চাশ-ষাট ক্রোনার পর্যন্ত দিতে হতে পারে। এছাড়া পড়াশুনার জন্য আর কোনও মাইনে লাগে না। হোস্টেলের খরচও যৎসামান্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠে খরচ এত কম বলে অনেক ছাত্রই পড়াশুনা করতে পারে। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িটি খুব সুন্দর,—বিশেষ করে সিনেট-হলটি। একটা প্রাচীন আভিজাত্যের ছাপ আছে। এখানে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়াকর্মে কোনও গাউন পরতে হয় না।

ডেনমার্কে শিশুদের যত্ন করবার নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। বরনারিঙ্গেন (Borneringen) এরকম একটি শিশু-কল্যাণ সংঘ যার কার্যকলাপ দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। এই সংঘটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন ডেনমার্কের রাণী ইন্‌গ্রিদ্‌। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্ক যখন জার্মানীদের দ্বারা অধিকৃত, সেই সময়ে এই সংস্থাটি স্থাপিত হয়। শিশুকল্যাণ ছাড়া কিছু কিছু যুবকল্যাণের কাজও এর কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই সংস্থার অধীনে অনেকগুলি কিণ্ডারগার্টেন, বাচ্চাদের ক্লাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আছে। প্রত্যেকটি

প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চিকিৎসক আছেন, তাঁদের বেতন এই সংস্থা থেকে দেওয়া হয়। শিশুদের দন্ত-চিকিৎসারও সুব্যবস্থা আছে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি আইনের বলে স্থিরীকৃত হয়েছে যে, এই প্রতিষ্ঠানের খরচের শতকরা সত্তর ভাগ দেবে সরকার, কুড়ি ভাগ দেবে অভিভাবকরা, আর দশ ভাগ আসবে চাঁদা, দান ইত্যাদিরূপে। প্রথম আরম্ভের সময়ে এই সংস্থার একপয়সাও মূলধন ছিল না। এখন কিন্তু এর আর্থিক অবস্থা দস্তুরমতো ভালো। সদিচ্ছা থাকলে কাজ যে টাকার জন্য আটকায় না, এই সংস্থা তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমি একটা বাচ্চাদের ক্লাব ও কিণ্ডারগার্টেন দেখেছি। ব্যবস্থা বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

কার্ল্‌স্‌বার্গ (Carlsberg) এর মদ ও লেমনেড প্রভৃতি তৈরীর বিরাট কারখানা আছে। এই কারখানার মালিকরা নানাবিধ সৎকাজ করায় খুব উৎসাহী। গ্লিপ্‌টোটেক্‌ যাদুঘরের কথা আগেই বলেছি। এঁদের কারখানায় অনেক মেয়ে কাজ করে। তাদের বাচ্চাদের রাখার জন্য একটা ক্রেশে-নার্শারী গোছের প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি কারখানার একেবারে গায়ে লাগানো। বাচ্চা হওয়ার পর মাদের যখন প্রথম কাজ করতে বের হতে হয় তখন তাঁদের দুর্ভোগ আমাদের দেশের খাটিয়ে মাদের যথেষ্ট জানা আছে। সন্তানকে অনেক সময়েই মাতৃদুগ্ধ,—যা তার জন্মগত অধিকার,—তা থেকে বঞ্চিত রাখতে হয়। ডেনমার্কের এই কারখানায় দেখলাম মাদের এই দারুণ মনোবেদনা থেকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা। বাচ্চা হওয়ার পর মা যখন কারখানায় কাজ করতে যায়, তখন ঐ কয়েক সপ্তাহের কচি শিশুকেও সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তাকে ক্রেশেতে রেখে কাজ করে। যখন যখন দুধ খাওয়াবার সময় হয়, তখন তখন কারখানা থেকে ছুটি দেবার ব্যবস্থা আছে। এসে দুধ খাইয়ে আবার কাজ করে। দুধ ছাড়া ওষুধ এবং অন্য কিছু খাওয়াবার প্রয়োজন হলে

নার্সরা খাওয়ায়। বাচ্চারা দেখলাম অত্যন্ত আরামে সেখানে থাকে। আলাদা আলাদা ছোট ছোট খাট আছে। অনেক বাচ্চা বোতলে করে খানিকটা দুধ খায়, অনেককে আবার চামচে করে পরিজজাতীয় কি যেন খাওয়ানো হচ্ছিল। চারিদিক ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে,—এতটুকু ময়লা নেই কোথাও। নার্স আছে প্রচুর,—তাদের কেউ কেউ সেখানেই কোয়ার্টার্স পায়। একটু বড় বাচ্চাদের জন্য নার্শারীর ব্যবস্থা। খেলনাপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসরঞ্জাম,—কিছুরই ত্রুটি নাই। কাজের শেষে মারা যার যার ধন নিয়ে বাড়ি ফেরে। দু একটি ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ লাগে। এছাড়া পয়সা-কড়ি বিশেষ কিছু লাগে না।

আজকাল যে যুগ এসেছে, সে যুগে মেয়েদেরও পুরুষদের মতো কাজে বের হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদের সংসারের ব্যবস্থাপনার তাতে অসুবিধা হয়। সব দেশেই কিছু কিছু ব্যবস্থা তাদের জন্য আছে। যেমন, আমাদের দেশে আছে মাতৃত্ব-ছুটি (Maternity leave)। কিন্তু এমন পুরুষ আমাদের দেশে আমার নজরে পড়েছে যারা মনে করে, মেয়েরা তাদের সঙ্গে সমানে প্রতিযোগিতা করতেও চাইবে, আবার মাতৃত্ব-ছুটির মতো একটি বিশেষ সুবিধাও ভোগ করতে চাইবে। অবশ্য, ক্রমেই নারীর বাইরে কাজ করতে আসাটা পুরুষের চোখে সহনীয় হয়ে উঠছে। খুবই আশা করি, দেশের নানাবিধ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এমন কতগুলি ব্যবস্থা হবে যাতে মেয়েরা ঘর ভালোমতো সামলেই বাইরের কাজ করতে পারবে। মেয়েরা যদি ঘরের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হয়ে তৃপ্ত মনে বাইরের কাজ করতে পারে তবে তাদের মাতৃত্বচেতনা আরও প্রসারিত হবে, সংসার ও সন্তান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ায় আরও উৎসাহের সঙ্গে তারা কাজ করতে পারবে, এবং দেশের ও সমাজের তাতে প্রভূত কল্যাণ হবে। ডেনমার্কে তারই আভাস দেখে আমার নারীমন খুশিতে ভরে উঠেছিল।

এল্‌সিনোরেই দেখেছিলাম দিনেমাররা জাতিহিসাবে অত্যন্ত বন্ধুত্বপরায়ণ। প্রাগে যুব-উৎসবে গিয়ে যেমন সহজ সরল আবহাওয়াটি পেয়েছিলাম, ডেনমার্কে তারি দেখা মিলেছে। শ্লাভ চরিত্রের সঙ্গে দিনেমার চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছি। রাস্তাঘাটে অপরিচিতের মুখে বন্ধুর হাসি। সবাই ব্যগ্র ভাব করার জন্যে, অনেক সময়ে ভাষাই হয়ে দাঁড়ায় প্রধান বাধা।

ডেনমার্কের বহু স্থানে আমি বহুবার বক্তৃতা দিয়েছি। সাধারণতঃ আমি ইংরেজীভাষায় বলতাম, আর একজন দোভাষীর কাজ করতেন। প্রায়ই খবরের কাগজওয়ালারা বড় বিরক্ত করত। আবার তাদের কাছে খোঁজ নিয়ে অনেক ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা আসতেন আমার সঙ্গে আলাপ করতে। এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি ধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণারত। আমার পদবী 'মিত্র' (তখন ছিল) শুনে বেদের মিত্র দেবতার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেক সংস্কৃত পুস্তক তাঁকে পড়তে হয়েছে, কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বইএর সংগ্রহটি মন্দ নয়। তিনি রামকৃষ্ণ কথামৃতের ডেনীশ অনুবাদও পড়েছেন। ভদ্রলোকের মাথায় কিন্তু একটু ছিট আছে মনে হল, কারণ তিনি বললেন যে, তিনি ভারতবর্ষে যাবেন যোগসাধনা করতে, এবং পরজন্মে যোগী হবেন।

প্রফেসর মিলথার্স্‌ (Milthers) নামে রয়াল ভেটেরিনারী কলেজের এক অধ্যাপকের সঙ্গে পথে আলাপ হয়েছিল। তাঁর নিমন্ত্রণে উক্ত প্রতিষ্ঠান দেখার গল্প আগেই করেছি। কিন্তু তাতেই ভদ্রলোক ক্ষান্ত হলেন না। কোপেনহেগেনে তাঁর বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। সেখানকার সমাদরের কথা ভুলব না। ভদ্রলোকের দুটি ছেলে দুটি মেয়ে। গৃহিনী উচ্চশিক্ষিতা ও অত্যন্ত পরিশ্রমী। কত রকমের রান্নাই

যে করেছিলেন আমার জন্য! একটা নতুন খাবার খেয়েছিলাম মনে আছে, ভুট্টা সেদ্ধ। ছেলেমেয়েগুলি স্কুলে পড়ে, আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। আমার এক লণ্ডনের বান্ধবী কটিনেণ্টে হ্যারিকেন টুর করতে অর্থাৎ ঝড়ের বেগে ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন। আমি যখন সেখানে ছিলাম তখন তিনি কোপেনহেগেনে এসেছিলেন। অধ্যাপক মহাশয় সেকথা শুনে নানা স্থানে ফোন করে লোক পাঠিয়ে বান্ধবীকে একেবারে আমার সামনে এনে হাজির করলেন। খুব আনন্দে সন্ধ্যাটা কেটেছিল।

একবার এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আলাপ করবার পর তাঁর মাসীর বাড়ি নিমন্ত্রণ করলেন। গিয়ে দেখি একটি ছোটখাট রোগা বৃদ্ধা। তিনি এক পুঁটলি চাল নিয়ে এসে কি যেন বললেন। ভদ্রলোকটি বুঝিয়ে দিলেন, যেহেতু আমি ভারতবর্ষের লোক, ভাত খেতে অভ্যস্ত, সেহেতু এই চাল আনা হয়েছে; আমি এখানে ভাত রেঁধে খাই, এই এঁদের মনোগত বাসনা। আমার তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল! নিজের রন্ধন বিদ্যা পাছে সব ফাঁস হয়ে পড়ে তাই তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমাদের দেশে ভাত তো কতই খেয়েছি, আপনারা কি করে চাল রান্না করেন সেটা দেখতে ইচ্ছে করছে।' বৃদ্ধা তখন খুব আনন্দ করে দুধে চালগুলো আধ সেদ্ধ করলেন। তারপরে তার উপরে দারুচিনির গুঁড়ো ছড়িয়ে একপ্রকার আঠালো চরু প্রস্তুত করে আমাকে মস্ত বড় প্লেট ভর্তি করে খেতে দিলেন এবং জানালেন যে, বড়দিনের উৎসবের এটি একটি বিশেষ খাবার। আমি একটা ছোট প্লেটে করে তুলে নিলাম দেখে খুব ক্ষুণ্ণ হয়ে তাঁর বোনপোর কাছে অনুযোগ করলেন, আমার নাকি 'পাখির আহার।' তাঁর পায়েসের খুব প্রশংসা করে আমাদের দেশের পায়েস রাঁধার কথা বললাম। বিদায়ের সময়ে একটা

ঠোঙা করে বাকি চালটা অত্যন্ত পীড়াপীড়ি সহকারে আমাকে গছিয়ে দেওয়া হল, বিদেশে বিভূঁয়ে চালবিহনে আমার যে কষ্ট সেটা যাতে কথঞ্চিৎ দূর হয় এই আশায়। সব দেশেরই মা মাসীরা চিরন্তন দেখলাম। দেশকালের সীমা এঁদের বাঁধতে পারেনি।

ডেনমার্কের জনসাধারণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানতে উৎসুক, কিন্তু জানার উৎস এদের খুব বিস্তৃত এবং যথাযথ নয়। ইংরেজ তার শাসনকালে ছুনিয়ার কাছে ভারতবর্ষের একটি মসীলিপ্ত মূর্তি তুলে ধরতে কোনও ত্রুটি করেনি। ফলে, আমাদের যত কুসংস্কার, যত কুপ্রথা সব বাইরের লোকে অতিরঞ্জিত করেই জানে। কিন্তু আমাদের ভালো দিকটা জানার সুযোগ তাদের কমই হয়েছে। এসম্বন্ধে আমার মনে হয় ভারতীয় দূতাবাসগুলির যথেষ্ট করণীয় রয়েছে। ভারত সম্বন্ধে বাইরে অনেক প্রচার-কার্য দরকার।

যদিও ডেনমার্ক জার্মানীর কাছ থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছে, তবু, পাশা যখন উল্টে গেছে, দুঃস্থ জার্মানীকে সাহায্য করার জন্য তারা ব্যগ্র। অনেক পরিবারে জার্মান অনাথ শিশুদের পোষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু জার্মানী নয়, অন্যান্য দেশেও রেডক্রশ ইত্যাদির মারফত ডেনমার্ক অনেক জনসেবামূলক কাজ করছে ও করেছে।

খুব ব্যস্ততার মধ্যেই কোপেনহেগেনের দিনগুলি কেটেছে। হ্যান্স এণ্ডারসেনের জন্মস্থান দেখার জন্য তেসরা সেপ্টেম্বর সকালবেলা কোপেনহেগেনের কাছ থেকে বিদায় নিতে হল।



॥ ওডেন্সে ও অরহুসে ॥

ওডেন্স ডেনমার্কের ফুনেন দ্বীপে অবস্থিত। ট্রেণ ও ফেরী স্টীমার করে দুপুরবেলায় ওডেন্সে পৌঁছলাম।

হ্যান্স ক্রিশ্চান এণ্ডারসেন পৃথিবীর বিখ্যাত রূপকথাশিল্পীদের অন্যতম। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কে তাঁর জন্ম। তাঁর গল্প বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বের শিশুদের চিত্ত জয় করেছে। 'জলপরী', 'ছোট্টদিয়াশলাইওয়ালী', 'বিশ্রী হাঁসের বাচ্চা' 'মা' প্রভৃতি গল্প বাংলা ভাষাতেও সুপরিচিত।

ওডেন্স একটি ভারী সুন্দর মফঃস্বল সহর। এখানে দ্রষ্টব্য জিনিস অনেক আছে, তবে সময়ের স্বল্পতাহেতু সব কিছু আমার দেখা হয় নাই। স্টেশন থেকে বার হয়েই দেখি চতুর্দিকে খুব ভীড়। সহরের যত ছোট ছেলেমেয়ে প্রজাপতির মতো বিচিত্র পোশাকে সেজে বাবা-মার হাত ধরে রাজপথ রঙীন ও কলরব-মুখর করে তুলেছে। কোথাও গ্রামোফোনে গান হচ্ছে, কোথাও বিক্রী হচ্ছে বেলুন, পুতুল, খেলনা, কেউ কিনে খাচ্ছে ফল। সকলেরই মুখে আনন্দের ছায়া। আমার কৌতূহলী দৃষ্টি বোধ হয় এক ভদ্রমহিলাকে আকৃষ্ট করল। তিনি তিন চারটি চঞ্চল শিশু সামলাতে সামলাতে তিনি বললেন: "আমি ইংরেজীতে কথা বলতে পারি। আপনি নিশ্চয় জানতে চান, এখানে কি হচ্ছে। আজ হল শিশু-উৎসব দিবস, তাই এরা সব পথে বেরিয়েছে। এদের আনন্দে আমরাও যোগ দিতে এসেছি। একটু পরেই শিশুদের শোভাযাত্রা বার হবে।" রূপকথার রাজা এণ্ডারসেনের জন্মস্থানে শিশুদের উৎসব খুবই উপযোগী ও প্রাণস্পর্শী।

একটি ছোট্ট মেয়ে এসে আমাকে দুটি হলদে গোলাপ দিয়ে গেল। ইতিমধ্যে যানবাহন-চলাচল বন্ধ হয়েছে। শিশুদের শোভাযাত্রা বার হয়েছে রাজপথে। আশেপাশের বাড়ির

জানালায় ফুটে উঠেছে শত শত উৎসুক কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি। অনেকগুলি লরী-ভর্তি নানারকমভাবে সজ্জিত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চলেছে। বিচিত্র পোশাকে সেজে হান্সের অনেকগুলি গল্পকেও তারা রূপদান করেছে। পুলিশরাও এদের সঙ্গে খুব আমোদ করতে করতে চলেছে। একদল পুলিশ ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে।

শোভাযাত্রা চলে গেলে রাস্তা একটু পরিষ্কার হয়ে এল। তখন এণ্ডারসেনের বাড়িটি খুঁজে বার করলাম। 'Hans Jensensstrœde' নামে রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাড়িটি, যেখানে এণ্ডারসেন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। মুখর চলমান জগৎ থেকে হঠাৎ যেন এমন একটি পরিবেশে এলাম, যেখানে কালের গতি গিয়েছে থেমে। ছোট ছোট চতুষ্কোণ পাথরে বাঁধানো বহু পুরাতন নাতিপ্রশস্ত পথ ও ছোট নীচু লাল টালিছাওয়া বাড়িগুলি দেখে মনে হচ্ছিল, সমসাময়িক জঙ্গম সভ্যতা এখানে বিক্ষোভ জাগায় নি, জীবন এখানে শান্ত, নিস্তরঙ্গ, শিল্পীর স্বপ্নালস দৃষ্টি বুনে চলে রূপকথার মায়া, আর তাঁর জানু আলিঙ্গন করে দাঁড়িয়ে থাকে উৎসুক ছেলেমেয়ের দল।

এণ্ডারসেনের বাড়িটি নানাপ্রকার স্মারকচিহ্নে পরিপূর্ণ। স্থান অকুলান হওয়াতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এর পাশে আরও কতগুলি ঘর এবং একটি স্মৃতিকক্ষ নির্মিত হয়েছে। বাড়িটি এখন ওডেন্সের জনসাধারণের সম্পত্তি। একটি যাদুঘর হিসাবেই এটি ব্যবহৃত হয়।

প্রবেশদ্বারের সম্মুখে উঁচু করে খোদাই করা আছে একটি ছবি, কলালক্ষ্মী ডেনীশ লোকদের এণ্ডারসেনের রূপকথা উপহার দিচ্ছেন। চিত্রটি সার্থক। ডেনমার্কের জাতীয় জীবনে এণ্ডারসেনের দান মস্ত বড় সম্পদ। এই রূপকথায় ডেনীশ শিশুর চিত্তশতদল বিকশিত হয়, বিদ্যালয়ে সে দেখে এই সব

গল্পের ছবি। খুব সমাদরে এই গল্পগুলি অভিনীত হয়। কোপেনহেগেনের সমুদ্রের ধারে জলের মধ্যে পাথরের উপর এণ্ডারসেনের বিখ্যাত কথিকা 'জলপরী' একটি ব্রোঞ্জের মূর্তিতে অপরূপ হয়ে উঠেছে সে কথা আগেই বলেছি। ডেনীশদের মানসিকতা এণ্ডারসেনের রূপকথার রসধারায় এমনভাবে পুষ্ট হয়েছে যে, তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে এই ভাবধারা ওতঃপ্রোত হয়ে আছে। সাধারণ কথাবার্তায় প্রায়ই তারা তাঁর গল্পের উল্লেখ করে।

এই যাদুঘরটি তাদের বড় আদরের বস্তু। ডেনমার্কের দ্রষ্টব্য জিনিসগুলির মধ্যে এটি অন্যতম শীর্ষস্থান অধিকার করে। রোজই বহু লোক এটি দেখতে আসে। স্থানীয় লোকের ভীড়ও মন্দ দেখলাম না।

যাদুঘরে ঢুকে সামনেই একটি বড় ঘর চোখে পড়ল। সেখানে দেয়ালজোড়া মস্ত দুটি তৈলচিত্র। দুটিরই বিষয়বস্তু এণ্ডারসেনের বিখ্যাত কথিকা 'মা'। ভারী সুন্দর ছবি দুটি। একটিতে বরফে চারিদিক ঢেকে গেছে। পাইন বনের উপর শুভ্র তুষারপাত সৃষ্টি করছে অপরূপ দৃশ্য। সন্তানহারা মা মৃত্যুর পথ জানবার আশায় দুহাতে জড়িয়ে ধরেছেন কাঁটাগাছ। অত হিমের মধ্যেও মার হৃদয়ের বেদনার স্পর্শে কাঁটাগাছে ফুটে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ। অপর চিত্রটিতে আমরা দেখি জননীর কালো কেশ হয়েছে কুন্দশুভ্র, সব ব্যাকুলতার হয়েছে অবসান শান্ত সমাধিতে। উইলো ডালের নীচে কূপের মধ্যে তিনি দেখেছেন তাঁর সন্তানের অকালমৃত্যু তারই মঙ্গলের জন্য। তাই মৃত্যু নিয়ে যাচ্ছে তাঁর ছেলেকে, তিনি বাধা দিচ্ছেন না, শুধু প্রার্থনা করছেন। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছবি দুটি দেখলাম, মাতৃহৃদয়ের শোক এবং নিবিড় শোকের মহান্ সান্ত্বনা আমার চিত্তকে উদাস করে তুলল।

বাড়িটি বহু প্রকারের ছবি, পত্রাদি, পুস্তক, এণ্ডারসেনের ব্যবহৃত এবং তাঁর স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্যাদি ও আসবাবে পূর্ণ।

এসব থেকে তাঁর জীবন সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা সহজেই করা যায়। তাঁর প্রকৃতিতে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় কবিপ্রাণ বড় সুন্দরভাবে প্রকাশিত। মন তাঁর অতি স্পর্শকাতর বীণার তন্ত্রীর মতো। নিসর্গ এবং মানবস্বভাব সহজেই তাতে ঘা দেয়, আর সৃষ্টি করে অপরূপ সুরের মূর্চ্ছনা।

গরীব মুচির সন্তান তিনি, জীবনের বহু দিন কেটেছে তীব্র দারিদ্র্যে, কিন্তু তা তাঁর চিত্তকে করেছে সহানুভূতিসম্পন্ন। প্রেমে পেয়েছেন তিনি প্রত্যাখ্যান, যাকে চেয়েছেন প্রণয়িণীরূপে, সে দিয়েছে সহোদরার স্নেহ। কিন্তু তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হলেও জীবনে বীতশ্রদ্ধ যে হন নি, তার প্রমাণ পাই, যখন দেখি তিনি সেই নীলনয়নার সন্তানদের জন্য পরম স্নেহে গল্প রচনা করেছেন।

তাঁর সহানুভূতি শুধু মানবসমাজেই আবদ্ধ নয়। রাজহাঁসের শাবক, মটরশুঁটির দানা, সাগরের জলকন্যা, সবই সসম্মানে স্থান পেয়েছে তাঁর সাহিত্য-শিল্পে। ছবি আঁকা ও কাগজ কেটে ছবি করাতেও তিনি ছিলেন শিশুদের হৃদয়রঞ্জনকারী। কাগজ কেটে নানারকম জীবজন্তু এবং অদ্ভুত প্রাণীর চেহারা ফুটিয়ে তোলা এণ্ডারসেনের একটি বিশেষ শখ ছিল। তাঁর কবিপ্রকৃতির আর একটি বড় মধুর নিদর্শন চোখে পড়ল। তিনি ছোট ছোট ফুলের গুচ্ছ শুকিয়ে কোনও একটি বিশেষ ঘটনা বা ব্যক্তি বা স্থানের স্মারকচিহ্ন হিসাবে রেখে দিতেন। সেগুলি এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাঁর স্নেহময় অন্তর পারিবারিক জীবনের মধ্যে সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু আর এক দিক দিয়ে বিচার করলে বোঝা যায় যে, তা ব্যর্থও হয়নি। তাঁর হৃদয়ের উচ্ছল প্রীতিরসধারা তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আজ সারা পৃথিবীর শিশুদের অভিষিক্ত করছে। এখানেই তো শিল্পীর চরম ও পরম কৃতার্থতা।

স্মৃতিকক্ষে কতগুলি বিরাট প্রাচীর-চিত্রে এণ্ডারসেনের জীবনী

অঙ্কিত আছে। চোদ্দ বছর বয়সে ভাগ্য পরীক্ষার জন্ম তাঁকে বিদেশে যাত্রা করতে হয়েছিল। সেই বিদায়ের দৃশ্যটি বড় প্রাণস্পর্শী। পাথর-বাঁধানো রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছে, মা চালককে সাবধানে গাড়ি চালাতে উপদেশ দিচ্ছেন, কিশোর হ্যান্স ঠাকুরমার কাছে বিদায় নিচ্ছেন। আলোছায়ামাখা প্রভাত, পুরানো ঘরবাড়ি, কুকুর, চালকের ব্যস্ততা, প্রতিবেশিনীর কোলাহল, জননীর উদ্বেগ, পিতামহীর স্নেহ, এণ্ডারসেনের বিহ্বলতা —সব কিছু মিলে ছবিটি চমৎকার। শুভানুধ্যায়ী বন্ধু জোনাস কলিনের বাগানে গাছের তলায় বসে কলিন পরিবারকে রূপকথা বলার চিত্রটিও সুন্দর। শুধু শিশুরা নয়, বয়স্ক ব্যক্তিরাও হ্যান্সের রূপকথা শুনতে শুনতে সব কাজ ভুলে যেতেন। আর একটি ছবি আমার ভাল লাগল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ছয়ই ডিসেম্বর এণ্ডারসেনকে ওডেন্স সহরের অধিবাসিগণ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছিল। এই ছবিতে আমরা দেখতে পাই, উৎসুক নগরবাসী মশাল হাতে কবিকে সম্মান দেখাতে একত্রিত হয়েছে, আর এণ্ডারসেন টাউন হলের বাতায়নে দাঁড়িয়ে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন।

যাদুঘরটির দোতলায় পুতুলনাচে তাঁর গল্প রূপায়িত করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় তাঁর রূপকথার অনুবাদও এখানে রক্ষিত আছে। জাপানের শিশুদের এণ্ডারসেনের রূপকথা সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী বোধ হল। তারা অনেক কিছু পাঠিয়েছে। আরবী হরফে ছাড়া ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ না দেখে দুঃখিত হলাম। স্মৃতিকক্ষের কাছে একটি ছোট সুন্দর বাগান আছে, তাই দেখে বাইরে এলাম।

ওডেন্সে আরও একটি বাড়ি আছে, যাতে তিনি তাঁর শৈশব অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু তখন বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সেটা দেখা হয় নাই। অবশ্য তাতে বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্যও ছিল না,

শুনলাম। ইচ্ছা করছিল, আরও কিছুক্ষণ এই রূপকথার রাজ্যে থাকি, কিন্তু আমার কর্মসূচী অনুসারে সেই রাত্রেই অরহুস পৌছাতে হবে বলে আর সময় দেওয়া সম্ভব হল না।

দেশে ফিরে যাদুঘরের জন্য একটি এণ্ডারসেনের রূপকথার বাঙলা অনুবাদ পাঠিয়ে দিয়েছি। যাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় জানিয়েছেন যে, এতে তাঁদের একটি বহুদিনকার অভাব মোচন হয়েছে।

অরহুস একটি প্রাচীন সহর। জাটল্যাণ্ডের পূর্বতীরে এটা অবস্থিত। এখন অবশ্য আধুনিক সুখসুবিধা সবই আছে। কোপেনহেগেনের পর এত বড় সহর ডেনমার্কে আর নেই। ডেনমার্কের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি এই সহরেই অবস্থিত। সেটি দেখাই আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল। অরহুসে গিয়ে ওয়াই ডব্লিউ সি এতে ছিলাম। ওদের দেশে অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানটির নাম কোফুকো (K. F. U. K.)। কোফুকোতে যাওয়া মাত্র মহিলারা ছুটে এলেন, এমনভাবে আমাকে স্বাগত জানালেন, যেন আমি তাঁদেরই আত্মীয়, কিছুদিন বিদেশে ছিলাম মাত্র। যে ঘরটিতে আমাকে থাকতে দেওয়া হল সেটি একটি স্থায়ী বাসিন্দার ঘর। তাঁর জিনিসপত্র বইখাতা সবই রয়েছে। ছোট্ট ঘর, বেশ সাজানো। তাঁর টেবিলে একটা মজার জিনিস দেখলাম। মাটি দিয়ে তৈরী ইঞ্চি আটেক বড় একটি পেটমোটা শূকর। উপরটা আবার গ্লেজ করা। তার পিঠে একটি ফুটো, পয়সা জমাবার জন্য। বোকা ভাঁড়ের রূপান্তর আর কি। কিন্তু পয়সা জমে গেলে অমন সুন্দর শূকরটা ভেঙে ফেলতে আমার অন্তত কষ্ট হত।

কোফুকোর বন্ধুরাই সব রাস্তাঘাট বাতলে দিলেন। একজন সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াতে গেলেন। অরহুসে একটা অদ্ভুত মিউজিয়াম আছে। তার নাম পুরানো সহর (The Old Town)। এটি একটি উন্মুক্ত যাদুঘর (Open air museum)। এখানে এলে হঠাৎ মনে হয় যেন রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যার

দেশে এসে পড়েছি। রাস্তা, ঘাট বাজার—সব সাজানো। সবই প্রাচীন কালের স্থাপত্যের নমুনা। খুব ভালো করে রাখার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য, এখানে লোক বাস করে না, সবটাই সাজানো। বাড়ির ভিতরে পুরাকালের জীবনযাত্রার প্রচুর নিদর্শন। সেকেলে আসবাব, বাসনপত্র, পোশাক প্রভৃতি যত্ন করে রাখা। যাদুঘরটি খুব সুন্দর আর শিক্ষাপ্রদ।

একটা বহু পুরাতন গ্রামার স্কুল দেখলাম অরহুসে। এটা ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দেরও পূর্বে স্থাপিত। এখানে ছেলে মেয়ে দুই পড়ে। এখন এটা রাষ্ট্র পরিচালিত।

অরহুস বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখলে প্রথম নজরেই কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এর পার্থক্য বোঝা যায়। বাড়িঘর সবই আধুনিক কায়দায় তৈরী। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত। একেবারে প্রগতিশীল। কোপেনহেগেনের মতো প্রাচীন ঐতিহ্য এর নেই। রাষ্ট্র এবং পৌরকর্তৃপক্ষ থেকে খরচের শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ অর্থ সাহায্য পায়। ৭৮টি ছাত্র নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। আমি যখন গেলাম তখন ছাত্রসংখ্যা ১৩০০। এখানে কোনও নিয়মিত বেতন দিতে হয় না। মোটের উপর বিনাপয়সাতেই পড়ানো হয়। ডেনমার্কের বৈশিষ্ট্য এই যে, উচ্চতম শিক্ষাও তারা বাস্তবিকপক্ষে অবৈতনিক করে তুলতে সমর্থ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখে ও তার কর্মকর্তাদের সঙ্গে ডেনীশ শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করে তৃপ্ত হলাম।

হাতে সময় সামান্যই ছিল, তবু ভারতবাসীর মুখ থেকে কিছু শুনতে কোফুকোর মহিলারা খুবই উৎসুক হওয়ায় তাঁদের ক্লাবে ভারতীয় ছাত্রসম্বন্ধে বক্তৃতা দিলাম। অবশ্য, দোভাষী আমার কথা শ্রোতাদের বোঝাতে সাহায্য করেছিলেন। বক্তৃতার পর ভারতের শিক্ষাবিষয়ক নানা সমস্যা নিয়ে খুব আলোচনা হল।

তারপর আবার 'যাত্রা হল শুরু।' এবার গন্তব্যস্থল সুইডেন।

॥ সুইডেনে ॥

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোল্‌মে যখন পৌঁছলাম তখন রাত হয়েছে, বৃষ্টি পড়ছে টিপ্‌টিপ্‌ করে। সেই অন্ধকারে আমার জন্য নির্ধারিত স্থানে গেলাম। জায়গাটি বেশ বড়ই মনে হল, কিন্তু ডিনার শেষ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং খাবার কিছুই মিলল না। ঠাণ্ডার মধ্যে একবার বাইরে গেলাম, কাছাকাছি কোনও রেস্তোরাঁও চোখে পড়ল না। একেবারে নতুন জায়গা, একটু ঘোরাঘুরি করেই চলে এলাম। তখন বেশ রাত। সঙ্গে কয়েকটা টক আপেল ছিল। সেই শীতের মধ্যে তাই খাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে খিদে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে উঠে রাজধানীকে ভালো করে দেখার ফুরসৎ মিলল। কোপেনহেগেনের চেয়ে ঢের বেশি রাজসিক। রাস্তার পুলিশগুলির অতি সুন্দর চেহারা। দেখে মনে হয়, ভালো চেহারা বোধ হয় এই পদের অত্যাবশ্যক গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম। ব্যবহারও অতি অমায়িক।

সুইডেনের শিক্ষামন্ত্রী দপ্তরের প্রধান শিক্ষা আধিকারিক (Chief Education Officer of the Ministry of Education in Stockholm) এর সঙ্গে নানাবিধ আলোচনা করে এদের দেশের শিক্ষাবিষয়ে মোটামুটিভাবে অনেকটাই জেনেছিলাম। বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সাধারণ বয়স সাত বছর। তবে, একবছর আগেও বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ করা যেতে পারে, আর, শিশু স্কুলে যাবার উপযুক্ত না হলে একবছর পরেও পাঠ আরম্ভ করা যেতে পারে। শিক্ষক ও চিকিৎসক নানাবিধ পরীক্ষা করেই এবিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করেন। নার্শারী স্কুল আছে, তবে এঁদের মতে সংখ্যায় তা পর্যাপ্ত নয়। চোদ্দ বছর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে থাকতেই হয়, তবে এঁরা পনের, এমন কি

ষোলো বছর পর্যন্ত ঐ বয়সকে বাড়ানোর কথা চিন্তা করছেন।

বিত্থালয় পরিদর্শকরা সাধারণতঃ শিক্ষামন্ত্রী দপ্তরের অধীন। কিছু কিছু বড় বড় স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের নিজস্ব পরিদর্শক আছেন, কিন্তু তাঁরা কেবলমাত্র প্রাথমিক বিত্থালয়গুলিই দেখতে পারেন। মাধ্যমিক বিত্থালয়গুলি সবসময়েই রাজকীয় পরিদর্শক (H. M. I.) দেখে থাকেন। বিত্থালয় তিন প্রকার,—সরকার পরিচালিত, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিচালিত এবং প্রাইভেট। শিক্ষিকারা পুরো বেতনসহ চারমাসের মাতৃত্ব ছুটি পেতে পারেন। বিত্থালয়ের পাঠ্যক্রমে ইংল্যাণ্ডের তুলনায় বেশি কড়াকড়ি, ইংল্যাণ্ডে এবিষয়ে ঢের বেশি স্বাধীনতা আছে। যাতে কারো পড়াশুনায় অসুবিধা না হয়, সেজন্য ছাত্রদের নানাবিধ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা আছে।

এই আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা করেই সুইডেনে কি কি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখব তা ঠিক করলাম।

স্টকহোল্‌মে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দেখে তারপর অন্যত্র যাব, এই ঠিক হল। সুইডীশ ইন্‌স্টিট্যুটেও গেলাম। এখানে এক ল্যাপ দম্পতীর সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা সুইডেনের উত্তরতম প্রদেশ ল্যাপল্যাণ্ডের বাসিন্দা। সেখানে বছরে সাতমাস শীত ও দুমাস গ্রীষ্মকাল। স্বামীস্ত্রী দুজনেই বরফের সৌন্দর্যে মুগ্ধ। শীতের শুভ্রমহিমা এঁদের নয়ন মনকে অনুরঞ্জিত করেছে। এঁরা যেখানে থাকেন সেখানে বৈদ্যুতিক আলোও নেই। দুজনেই আমাকে ল্যাপল্যাণ্ড সম্বন্ধে এমন লোভ দেখালেন যে, আমার ভ্রমণসূচীতে ল্যাপল্যাণ্ড দর্শন তখুনি ঢুকিয়ে ফেললাম।

এই সুইডীশ ইন্‌স্টিট্যুটেই সুইডেন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করলাম। সুইডেন পৃথিবীর উত্তরতম দেশগুলির অন্যতম। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মধ্যে সুইডেনই বৃহত্তম। অরণ্যে,

হ্রদে, পাহাড়ে সুইডেনের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। কাঠ, লোহা প্রচুর পাওয়া যায়। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পশ্চিম দিক দিয়ে গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীম (Gulf Stream) বয়ে যাওয়াতে সুইডেনের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত গরম। তা না হলে সুইডেন আলাস্কা এবং সাইবেরিয়ার মতো ঠাণ্ডা দেশে পরিণত হত। এম্‌নিতেও সুইডেনে ঠাণ্ডা বেশ। শীতকালে দেশের সর্বত্র বরফ পড়ে। উত্তর নরল্যাণ্ডে (Norrland) শীতের সময়ে প্রায় দুমাস ধরে মধ্যরাত্রির সূর্যের জন্য 'শাদা রাত' দেখতে পাওয়া যায়। আবার, জুনমাসে নাকি সারা দেশে বহুক্ষণ সূর্যের আলো থাকে। এমন কি, মধ্যগ্রীষ্মে স্টকহোলমে পর্যন্ত সারারাত ঘরের বাইরে এত আলো থাকে যে তাতে স্বচ্ছন্দে খবরের কাগজ পড়তে পারা যায়।

সুইডীশরা ক্রমশই গ্রাম্যজীবন থেকে নাগরিক জীবনে সরে আসছে। পুরুষের আয়ুর গড় ৬৪·৩ বছর এবং স্ত্রীলোকের ৬৬·৯২ বছর। শিশুমৃত্যুর হার পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন—হাজারকরা ২৬ জন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে সুইডেন যোগদান করে নি। অবশ্য, পরোক্ষভাবে যুদ্ধের প্রভাবের হাত সে এড়াতে পারে নি। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য যুদ্ধের সময়ে খুবই ব্যাহত হয়েছিল, এবং তার ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর রদবদল করারও প্রয়োজন হয়েছিল।

আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিস সুইডেনে আবিষ্কৃত হয়েছে। দেশলাই, কেরোসিন স্টোভ, টেলিফোন ইত্যাদি তার মধ্যে অন্যতম। তাছাড়া, রেফ্রিজারেটার, লাইটহাউস, ডিনামাইট প্রভৃতিরও আবিষ্কারক সুইডীশ। ডিনামাইট আবিষ্কারক আলফ্রেড নোবেল প্রদত্ত নোবেল পুরস্কারের কথা সকলেই জানেন। বিশ্ব-সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এই ছোট্ট দেশটির দান মোটেই নগণ্য নয়।

স্টকহোল্‌মে যে কয়টি প্রতিষ্ঠান দেখলাম তাদের মধ্যে

একটির কথা উল্লেখ করব। এর নাম নীবুদা হেমেট্ (Nyboda Hemmet)। এটি একটি অদ্ভুত প্রতিষ্ঠান। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এখানে কয়েক সপ্তাহ থেকে ষোলো বছর পর্যন্ত বয়সের বাচ্চাদের রাখা হয়। মা যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন, অথবা যদি পবিবারে কোনও বিচ্ছেদ বা গোলমাল উপস্থিত হয় তবে সাময়িকভাবে এখানে বাচ্চা রাখা যেতে পারে। বিভিন্ন বয়সের বাচ্চাদের জন্য পাঁচটি আলাদা বাড়ি আছে। বাচ্চাদের খুবই যত্ন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ফ্রীই ব্যবস্থা। চমৎকার কাজ হচ্ছে। দেখে মনে হল, আমাদেব দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকার খুবই প্রয়োজন রয়েছে।

স্টক্হোল্‌ম্ থেকে এলাম নরট্রিপিংএ (Norrkoping)। নরট্রিপিং সুইডেনেরই একটি সহব। এখানে ইংল্যাণ্ডের এক বান্ধবীব কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে একজন ভদ্র মহিলাব সঙ্গে দেখা কবলাম। তাঁর নাম মিস্ ইক্লুম। তিনি একটি বালিকা বিদ্যালযেব প্রধানা শিক্ষিকা। তিনি সানন্দে আমাকে তাঁর গৃহে স্থান দিলেন। সুইডীশ গৃহ দেখাব সৌভাগ্য এর আগে হয় নি। তিনি একটি ছোট ফ্ল্যাটে একলাই থাকেন। খুব অল্প জায়গার মধ্যে সবরকমের ব্যবস্থা করা এদের বৈশিষ্ট্য। একটি বসার ও একটি শোবাব ঘর। বসার ঘরেব সোফাটি টানলেই একটি বিছানা বেরিয়ে পড়ে। এভাবে বসার ঘর রাতে শোবার ঘবে পরিণত হয়। বসাব ঘবে কাঠেব খোদাই করা ছোট্ট পাখি স্প্রিংএব তাবের সঙ্গে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া ছিল। আর একটি ব্যাপার দেখলাম, যেটা সুইডেন ছাড়া অন্য কোথাও দেখিনি। বসার ঘবের দেয়ালে কাঁটা পুঁতে তাতে ছোট টব আটকানো। তাতে থাকে খুব সুন্দব আকৃতিবিশিষ্ট পাতার লতানো গাছ। সেই গাছ যখন লতা আন্দোলিত করে বাড়ে তখন দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট পেরেক পুতে তাতে লতাগুলি এমন ভাবে আট্‌কে

দেওয়া হয় যে, বেশ এম্‌ব্রয়ডারীর ডিজাইনের মতো দেখা যায়। জানালার পর্দারও বাহার খুব বেশি।

আমাকে নর্‌টি্র্‌পিংএ কয়েকদিন থাকতে হবে বলে ভদ্রমহিলার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও একটা হোটেল খুঁজে নিলাম। তিনি রোজ ছবেলা আমার হোটেলে এসে দেখা করতেন আমার সঙ্গে।

নর্‌টি্র্‌পিংএ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দেখলাম। তার মধ্যে একটি গার্হস্থ্য-বিদ্যানিকেতনের একটু বিশদ বর্ণনা দিচ্ছি।

সে দেশে প্রত্যেক নারীরই পুরুষের ন্যায় পরিপূর্ণ শিক্ষালাভ করার অধিকার অব্যাহত আছে। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে পুরুষ এবং নারীর শিক্ষার ক্ষেত্র ভিন্ন হতে পারে, এবং সেই বৈশিষ্ট্যকে এখানে পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়। মেয়েরা যদি কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে গার্হস্থ্য-বিদ্যা শেখার প্রয়োজন অনুভব করেন তো সে প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থাও শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে করতে হয়। আমি যে বিদ্যালয়টির কথা বলব, সেটির উদ্ভবও এই রকম চাহিদা মেটাতে।

বিদ্যালয়টির নাম গুস্তাভিয়ান্‌স্কা হুস্‌মোডার্‌স্কোলান্ (Gustavianska Husmoderskolan)। নর্‌টি্র্‌পিংএর উপকণ্ঠে লিওনার্ড্‌স্‌বার্গ (Leonardsberg) বলে একটি পাইন ও বীচ তরুর ছায়ায় শ্যামস্নিগ্ধ, পাখির কূজনে মুখরিত পল্লী আছে। আমার একটি বন্ধুর সহায়তায় সেখান থেকে এল এই স্কুল দেখার নিমন্ত্রণ।

ঘনসন্নিবিষ্ট চন্দ্রমল্লিকা ও রক্তগাঁদা ফুলের শোভার মধ্যে দোতলা স্কুলগৃহটি একটি ছবির মতোই দেখাচ্ছিল। আমি উপস্থিত হতেই একজন ইংরেজীভাষাভাষী শিক্ষয়িত্রী আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। স্কুলবাড়ি তো আমি অনেক দেখেছি,—এটা ঠিক স্কুলের মতো মনে হচ্ছিল না। মনে হল যেন অতি সুন্দরভাবে সাজানো একটি বাসগৃহে এসেছি।

প্রাচীরগাত্রে সুরুচিসম্পন্ন ছবি, চেয়ার ও সোফাগুলিতে মেয়েদের হাতে কাজ করা ঢাকনি ও কুশন, ফুলদানীতে রাখা টাট্‌কা ফুল। দুএকটি স্বাস্থ্য-উজ্জ্বল কিশোরী মেয়ে নিপুণ হাতে এটা সেটা করছিল, আমাকে দেখে জানাল সুইডীশ ভাষায় সাদর অভিবাদন।

শিক্ষয়িত্রীটি আমাকে নিয়ে গেলেন বাগানের সামনের বারান্দাতে। সূর্যের কিরণ এখানে দুর্লভ বলেই অতি আদরের; আর শরতের সকালটি সোনালী, সবুজে, সুনীলে জড়িয়ে একটি নীলাপান্নাখচিত স্বর্ণালঙ্কারের মতোই ঝল্‌মল্ করছিল। বারান্দাতে হনিসাক্‌লের লতা বেয়ে উঠেছে। গুটিকতক বেতের চেয়ার পাতা। সামনে প্রশস্ত উদ্যানে কত রকম বর্ণ বৈচিত্র্য। দূরে দিগন্ত গাছে আর পাহাড়ে ঢাকা।

প্রথমে ভদ্রমহিলার কাছ থেকে এই বিদ্যালয় বিষয়ক কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। এটি মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল। এর লক্ষ্য হল জীবনশিল্পে মেয়েদের নৈপুণ্য-বিধান। সংসারে লক্ষ্মীশ্রী উদ্ভাসিত করে জীবনকে মধুর করে তোলার স্বপ্ন অধিকাংশ মেয়েই দেখে। গৃহরচনা একটা মস্ত বড় আর্ট এবং এর টেক্‌নিক্ খানিকটা এখানে শেখানো হয়। সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ জানাবার জন্যই বিদ্যালয়ের পরিবেশটি এত সুন্দর।

শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্রীদের ব্যক্তিগত যোগ যাতে সুন্দর ও মধুর হয়ে ওঠে, যাতে তাঁদের মধ্যে একটি পরিবার-বোধ অক্ষুণ্ন থাকে, এই সব কারণে ছাত্রীসংখ্যা খুব বেশি নয়। প্রতি বছর ত্রিশটি করে মেয়ে নেওয়া হয়। শিক্ষাকাল এক বছর (যদিও এক বছর বড় কম সময় বলে এঁরা মনে করেন)। ভর্তি হবার নিম্নতম বয়স ষোল বছর। সাধারণতঃ ছাত্রীদের বয়স ষোল থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে। এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করে ইচ্ছা করলে এরা নরট্রিপিং-এর ফ্রোবেল ইন্‌স্টিটিউটে ভর্তি হতে পারে।

এটি মূলতঃ একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নয়। কোনও দাতার

সহৃদয়তায় এর জন্ম। ১৯৩৮ সালে এটি বর্তমান আকৃতি ধারণ করে। এটি অবৈতনিক নয়, নর্‌টি্‌পিং-এর মেয়েদের বেতন মাসে সত্তর ক্রাউন, অন্য মেয়েদের নব্বই ক্রাউন। তবে কোনও বালিকা বেতন দিতে অক্ষম হলে রাষ্ট্র থেকে তাকে বৃত্তি দেওয়া হয়। চারটি শিক্ষয়িত্রী আছেন, তাঁদের বেতনও রাষ্ট্র দেয়। রাষ্ট্রীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ থেকে ক্বচিৎ কখনও (দশ বছরে দুতিন বার) বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়।

এখানে বহু প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। রন্ধন, কাপড় কাচা, সেলাই করা, শিশুপালন, বাগান করা, সেবাশুশ্রূষা প্রভৃতি তো আছেই। তার উপর ব্যায়াম, খেলাধূলা, সংগীত, লোকনৃত্যও শেখানো হয়। সুইডীশ ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং সমাজতত্ত্ব ও শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে মেয়েদের সমাজসচেতন করে তোলাও এই স্কুলের কাজ।

কথাবার্তার মধ্যে অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরাও দেখা করে গেলেন। অধ্যক্ষ মহাশয়া অন্যত্র গিয়েছিলেন। তিনিও ইতিমধ্যে এসে পড়লেন। অতি প্রিয়দর্শনা এই প্রৌঢ়া, সহজভাব ও আভিজাত্যের, লালিত্য ও সম্ভ্রমের অদ্ভুত সমাবেশ এঁর মধ্যে। ইংরেজী খুব সামান্যই বলতে পারেন, তবে বুঝতে পারেন সবই মোটামুটি। এঁরা সকলেই ভারতবর্ষের নারীদের সম্বন্ধে জানতে খুবই উৎসুক। সুতরাং নানা প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় ভগিনীদের সমস্যাগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করলেন।

কফি পানের পর অধ্যক্ষা মহাশয়ার নির্দেশমত শিক্ষয়িত্রীটি আমাকে স্কুল দেখাতে চললেন। স্কুলটিতে পারিবারিক আবহাওয়া আছে বলে যে ক্লাসের ঘর নেই, তা নয়। শরীরতত্ত্ব ও সাহিত্যের জন্য এই ক্লাসরুমগুলির প্রয়োজন। শরীরতত্ত্বের ঘরে দেখি এ্যানাটমি ও ফিজিওলজি সম্বন্ধে সহজে জ্ঞানদানের বিশেষ

ব্যবস্থাও আছে। খাদ্যের পদার্থগুলির ভারসাম্য যাতে রক্ষিত হয়, তা খুব ভালোভাবে শেখানো হয়। বহু চার্ট, ছবি, মডেল ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। সাহিত্যের ক্লাসে বিখ্যাত সুইডীশ এবং অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং তাঁদের লেখার প্রতি ঔৎসুক্য জন্মানোই প্রধান উদ্দেশ্য।

রান্না, ভাঁড়ার ইত্যাদির জন্য ব্যবস্থা খুব বিস্তৃত। একেবারে আধুনিকতম সজ্জায় সজ্জিত রান্নাঘর। (অবশ্য, একথা স্মরণীয় যে, সুইডেনের সাধারণ গৃহস্থের পক্ষেও এরকম রান্নাঘর পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়।) উনানগুলির অধিকাংশই বৈদ্যুতিক, চারদিক ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার। মাটির তলায় ঠাণ্ডা ভাঁড়ার ঘরে সারি সারি বোতলে রক্ষিত ফল, জ্যাম, জেলী ইত্যাদি। ফলসংরক্ষণ এদের খুব যত্ন করে শিখতে হয়। এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি খাদ্যপ্রাণ ভাগ করে কি কি খাদ্যে এসব আছে তা আলাদা করে রাখা ছিল। এভাবে মেয়েরা দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার থেকেই বুঝতে পারে কি কি খাদ্যে কোন্ কোন্ খাদ্যপ্রাণ আছে।

কাপড় সেদ্ধ করা, কাচা, শুকানো, ইস্ত্রী করা ইত্যাদি সব কিছুরই খুব সুন্দর ব্যবস্থা। সেলাই শিক্ষার ঘরে কতগুলি তাঁতও আছে, তাতে সুইডীশ কৃষক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট প্যাটার্ণের বিছানার চাদর, টেবিলের ঢাকা ইত্যাদি বোনা হয়। হাতে এবং কলে সেলাই, ফুল তোলা এবং সর্ববিধ কাট ছাঁট—মোটামুটি সব কিছুই (এক বছরের পক্ষে যা সম্ভব) শেখানো হয়। আমি আসার কিছুদিন পূর্বেই একটি প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে ছাত্রীদের পিতামাতারা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। প্রদর্শনী শেষ হবার পর ছাত্রীদের বানানো কাপড় জামাগুলি এক ঘরে রাখা ছিল তাদের সেলাই-এর উৎকৃষ্ট নমুনা আমাকে মুগ্ধ করল।

সুরুচিসম্মতভাবে ঘর সাজানো এখানকার শিক্ষার বিশেষ অঙ্গ

বলে ছাত্রীদের উপর স্কুলবাড়িটি সাজানোর ভার বহুলপরিমাণে থাকে।

দুটি করে মেয়ের একটি শোবার ঘর। সব ঘরই central heating দ্বারা শীতকালে গরম করা হয়। এই শোবার ঘরও ছাত্রীদের নিজেদের ইচ্ছামত সাজাবার অধিকার আছে। সুতরাং শোবার ঘরগুলিতেও তাদের ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট।

মেয়েরা নিজের নিজের কাজ করছিল। যখন হাতের কাজ করছিল, তখন কথাও বলছিল, কিন্তু গোলমাল কেউ করছিল না। সকলেরই হাসিমুখ, সকলেই শিখতে ও অপরকে সাহায্য করতে উৎসুক। সর্বত্রই একটা শান্তির ভাব বিরাজ করছিল।

স্কুলবাড়ি দেখা হলে বাগান দেখতে গেলাম। বাগানের জন্য মালী আছে, কিন্তু প্রত্যেক ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীর জন্য ছোট্ট এক টুকরো জমি,—তাতে নিজের খুশিমতো ফুল ফোটানো চলে। এই বাগান করারও উদ্দেশ্য সৌন্দর্যানুভূতি প্রখর করা, প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ নিবিড় করা।

পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রার প্রতি এই বিদ্যালয় মোটেই উদাসীন নয়। একটি প্রতিবেশিনী তাঁব শিশুপুত্রকে নিয়ে বেড়াতে এলেন এবং আমার সঙ্গে খুবই আলাপ করলেন। স্কুলের ছাত্রীরা মাঝে মাঝে প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে। অতিথিকে অভ্যর্থনা করাও তো গার্হস্থ্যবিদ্যার একটা বিশেষ অঙ্গ।

দুপুরবেলায় ওখানে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। খাবার ঘরটি বেশ প্রশস্ত, সুইডীশ কায়দায় সাজানো। শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীরা এক সঙ্গেই আহার করেন। ছাত্রীরা তাদের এপ্রন ছেড়ে সুন্দর হয়ে খেতে এল। সম্মিলিত প্রার্থনার পর খেতে বসলাম। প্রত্যেকের সামনে ঝাড়নের উপর একটি করে গার্ডেন ন্যাস্‌টারশিয়াম ফুল ছিল। ওঁরা সবাই ফুলটি বুকের পিনে আটকালেন, আমি চুলে লাগালাম। চুলে ফুলপরা দেখে ওঁরা বিস্মিত ও

প্রশংসায় মুখর হল। রান্না খুবই চমৎকার হয়েছিল এবং আতিথেয়তার কোনও ত্রুটিই হয় নি।

প্রত্যাবর্তনের সময়ে অধ্যক্ষ মহাশয়া আমাকে কতগুলি অর্ধস্ফুট গোলাপ এবং সুইট্ পী উপহার দিলেন। কবে আমাদের ভারতের নারীরও এমনি সহজ আনন্দে, স্বাস্থ্যে, শিক্ষায় শ্রীময়ী হয়ে ওঠার প্রচুর সুযোগ মিলবে—তাই ভারতে ফিরে এলাম।

সুইডেনের কর্মসূচীর পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য। কিছু দিন নর্‌ট্রিপিং এর হাঁসপাতালে কাটাতে হল। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন হাঁসপাতাল, সামনেই বাগানে ছুটি নাসপাতিগাছ। ধোপা জমাদার এসে তলায় পড়ে থাকা পাকা নাসপাতি কুড়িয়ে নিয়ে যেত। আমি একটা প্রকাণ্ড ঘরে একলা ছিলাম, রাজসিক ব্যবস্থায়, অত্যল্প খরচে। একমাত্র অসুবিধা ছিল, এখানকার অধিকাংশ ডাক্তার ও নার্স ইংরেজী জানতেন না। অবসরবিনোদনের জন্য আমাকে একটি ছোট রেডিও এবং অনেকগুলি ইংরেজী গল্পের বই দেওয়া হয়েছিল। আটদিন ছিলাম। তখন সুইডেনে শীত পড়তে আরম্ভ করেছে। একটু সুস্থ হতে ডাক্তার আর ঘোরাঘুরি না করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন। তাঁর নির্দেশক্রমে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্ এক্সপ্রেসে স্লিপিং বার্থ নিলাম।

এই ট্রেণ খুবই আরামদায়ক। কচি সন্তানসহ মাদের জন্য আলাদা কামরা রয়েছে। সেখানে বাচ্চার জন্য কতরকম ব্যবস্থা। রেলের পরিচারিকা রয়েছে, নার্সের পোশাক পরা। মাদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা দেখে খুবই খুশি হলাম। সুণ্ড পার হবার সময়ে আমাদের বগি কেটে জাহাজে তুলে দিল। তখন জাহাজে নেমে রাতের খাওয়া খেয়ে নিলাম। তারপর জাহাজ ডেনমার্কে লাগলে আবার ইঞ্জিনের সঙ্গে গাড়ি জুড়ে দিল। কোপেনহেগেনে গাড়ি বদলাতে হল। স্টেশনে এক বন্ধু এসেছিলেন, তিনিই

মালপত্র ঠিক করে সিপিং বার্থে তুলিয়ে দিলেন। বার্থটি খুব সুন্দর। একেবারে ঘরের মতো। ট্রেণের ভিতরটা গরম রাখার ব্যবস্থা আছে। কামরায় দুটি বার্থ, উপরে ও নীচে। নীচে আমার বিছানা, উপরে আর একটি মহিলার। চমৎকার পুরু গদি, তোষক, কম্বল, বালিশ ইত্যাদি দেওয়া, মাথার কাছে আলো ও বেড-সুইচ, ইচ্ছে করলে শুয়ে শুয়ে পড়াশুনা করা যায়। ঘরেই মুখধোবার বেসিন, জলের গ্লাস স্ট্যাণ্ডে আটকানো। খুব আরামে ঘুমোলাম। সকালে ট্রেণের পরিচারক এসে বিছানাগুলি গুটিয়ে নিয়ে সোফায় পরিণত করে দিল।

লণ্ডনে ফিরে দু-তিন দিন বিশ্রাম নিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হলাম। বান্ধবী ইভা সে সময়ে আমার যে যত্নটা করেছিল তা ভুলবার নয়।



॥আমার চোখে ইউরোপের মানুষ ॥

পুরো ছুটি বছর ইউরোপের মানুষদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে কাটিয়েছি। বিদায় নেবার আগে একটি বাঙালী মেয়ের মনের ক্যামেরায় ইউরোপের মানুষের কি রূপটি ধরা পড়েছে একটু আলোচনা করতে চাই।

প্রথমে কিছুদিন লেগেছে তাদের সঙ্গে ঠিকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে। অত্যাচারিত দেশের মেয়ে, মনের কোণায় কোণায় সঞ্চিত ছিল ছুশো বছরের বিক্ষোভ। এর জন্যই বোধ হয় প্রথমের দিকে নিঃসঙ্কোচে মেশার পক্ষে বাধা এসেছে আমার মনেরই দিক থেকে।

ইউরোপের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এই মানুষের চেহারা যে আমার কাছে একেবারে অজানা ছিল একথা বললে সম্পূর্ণ সত্য বলা হবে না। শৈশবেই নভেলপাঠরূপ অভ্যাস আমাকে আক্রমণ করেছিল। বয়স্কদের ভাষায় যার নাম হল ডেঁপোমি। সুতরাং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডের এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি থিয়োরেটি-ক্যাল জ্ঞান ছিল। ভাবরাজ্যে সেইসব নায়ক-নায়িকাদের প্রতি সহানুভূতি ছিল অত্যন্ত প্রবল। প্রথম কৈশোরে জেন আয়ারের ছুঃখে লুকিয়ে লুকিয়ে কত যে চোখের জল ফেলেছি, অলিভার টুইস্টের সঙ্গে পথে পথে কত যে ঘুরেছি, তার ঠিকানা নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখেছি বিয়াল্লিশের আন্দোলন, কলকাতার রাজপথে দেখেছি বীভৎসতার স্রোত। তাই কল্পনা ও বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল তখন প্রতিষ্ঠা করতে পারি নি।

বিলেতে গিয়ে যখন ক্রমশঃ তাদের সঙ্গে মিশতে লাগলাম, ধীরে ধীরে তাদের মানবীয়রূপটি আমার কাছে প্রকাশিত হতে

লাগল। এ আবরণ উন্মোচন আমাকে নব আবিষ্কারের আনন্দ দিয়েছে। দেখেছি, এরাও আমাদেরই মতো মানুষ, আমাদেরই মতো এদেরও ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে, আমাদেরই মতো সুখদুঃখ-আলোছায়া-জড়ানো এদেরও জীবন।

দুনিয়া যতটুকু দেখেছি, তাতে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি সর্বত্র সমান। আমরা ভাত খাই, ইউরোপের লোকের খাদ্য আলাদা, কিন্তু খিদে আমাদের সকলেরই পায়। এইরকম, জল, খাদ্য, বাতাস, বাসস্থান ইত্যাদি ছাড়া আরও একটা চাহিদা মানুষের আছে। সেটা হল শান্তি। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে এর স্বরূপ ভিন্ন। ইউরোপেও এমন বিষয়বিরক্ত বৈরাগীর দেখা পেয়েছি। যাঁরা সংসারাশ্রয়ী, তাঁরা সংসারের মধ্যেই সে শান্তি পেতে চান। সন্ন্যাসী ছাড়া সকলের পক্ষেই একথা সত্য। এই সত্যের সূত্র আমার আবিষ্কারের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে।

মৌলিক চাহিদাগুলি সমান হলেও দেশভেদে বৈচিত্র্য তো সব স্থানেই আছে। আসমুদ্রহিমাচল যে ভারতবর্ষ, তারই অধিবাসী আমি, বৈচিত্র্য দেখার অভ্যাস আমার নতুন নয়। বৈচিত্র্য আছে বলেই পৃথিবী এমন সুন্দর, মধুর, এই জন্যেই বারংবার জন্মগ্রহণ করেও পৃথিবীকে কখনও একঘেঁয়ে, ক্লান্তিকর বোধ হয় না, এই জন্যেই সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দিয়ে মাপা দিনরাতগুলি আমাদের কাছে সেই পরম বিচিত্রের অনন্তলীলারই আস্বাদ এনে দেয়।

ইউরোপের মানুষের আকৃতি, জীবনযাত্রা-প্রণালী,—সবেতেই আমি বৈচিত্র্য খুঁজে পেতাম। কত রকমের রান্নাই যে তারা করে! লবণ না দিয়ে যে লোকে রাঁধে, সেদ্ধ করেই যে লোকে বলে খুব রেঁধেছি, তা আগে জানা ছিল না। ভিনিগার ভিন্ন অন্যরকম টকের সঙ্গে লবণ দিয়ে খাওয়ার প্রথা চোখে

পড়ে নি। টকে সাধারণতঃ মিষ্টি দিয়েই ওরা খায়। ফোড়ন সম্বরা ইত্যাদির ইংরেজী প্রতিশব্দ আমার অন্তত জানা নেই। কাঁচা মাংসের রং বজায় রেখে তাকে পাতে পরিবেশন করার কায়দা আবার আমরা জানি নে। কর্ণ্‌বীফ বা স্মোক্‌ড্‌ শূকরের মাংস পাতে নিয়ে প্রথম প্রথম গিলতে অনেক কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু ধীরে ধীরে তার স্বাদ পেতেও শিখেছি। বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন রকম রান্নার স্বাদগ্রহণের আন্তর্জাতিক মূল্য সম্বন্ধে পূর্ব-পরিচ্ছেদে বলেছি। আমার মনে হয়, বিলেতে গিয়ে ভারতীয়দের উচিত বিলেতী লোকদের সঙ্গে বাস করা। তা না হলে অনেকটা শিক্ষা আমাদের বাদ পড়ে যায়। কোনও বিশেষ স্বাদগ্রহণ একটা অভ্যাস। এবং অভ্যাসের ফলে নতুন স্বাদ পেতে শেখাও সম্ভব।

খাওয়ার সামাজিক মূল্য আছে, এবং তা থেকে আমরা অনেকটাই শিখি। আমাদের এক সঙ্গে খেতে বসা অথবা পংক্তিভোজের নিয়মের সঙ্গে ওদের টেব্‌ল্‌ ম্যানার্‌স্‌ (Table manners) এর কিছু মিল আর কিছু গরমিল। সবাই একসঙ্গে আরম্ভ করা, এবং নিজের শেষ হলেও সকলের শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উভয় ক্ষেত্রেই সমান। কিন্তু পরিবেশনের নিয়ম, খাদ্য মুখে তোলার নিয়ম প্রভৃতিতে অনেকই ভেদ আছে। চিবোতে হবে মুখ বুঁজে, এবং মাছের কাঁটা, মুরগীর হাড় ইত্যাদি না চিবিয়ে পাতের কোণে নামিয়ে রাখতে হবে। খাওয়ার শেষে অতিথির তৃপ্তির উদ্‌গারে আমাদের গৃহকর্তা খুশিই হন, ওদেশে কিন্তু এটা প্রায় অমার্জনীয় অপরাধ।

খেতে বসে ফাঁসির খাওয়া খেতে পারলে এবং খাওয়াতে পারলে আমাদের দেশে সাধারণের খেয়ে ও খাইয়ে তৃপ্তি। ইউরোপে দেখেছি, খাওয়ার পরিমাণের চেয়ে ক্যালোরি মূল্যের দিকে নজর বেশি। কোন খাবার কতটা খেলে শীতের দেশে দেহ কার্যক্ষম থাকবে, সেই ওজন করে খাওয়া। যেমন, মাংস রোজই খাওয়া

হয়, তবে নামমাত্র। তার সঙ্গে তরকারী ও সব্জীই বেশি। পেটভরানোয় অভ্যস্ত মানুষ আমরা, bulkএর অভাবে অনেক সময়েই পুরো কোর্স খেয়েও মন খুঁতখুঁত করত।

খাওয়ার ব্যাপারে আর একটা পার্থক্য লক্ষ্য করেছি। আমাদের খাবার সাধারণতঃ মুখরোচক ঝাল মশলা গন্ধদ্রব্যাদি দিয়ে ভেজেভুজে নানাভাবে রসনাতৃপ্তিকর করে আমরা রান্না করি। অনেক অমূল্য নারীজীবন প্রিয়জনের রসনেন্দ্রিয়ের সেবা করতেই উনুনধারে নিঃশেষে এবং নিঃশব্দে ব্যয়িত হচ্ছে। রান্নাবান্না করেও দেশের আরও পাঁচটা কল্যাণকার্যে যে তাদের শক্তি নিয়োজিত হতে পারত সে সম্বন্ধে চিন্তা করার অবকাশই তাদের নাই। ওদেশের খাবার মুখরোচক অপেক্ষা দৃষ্টিরোচক বেশি। সামান্য আলুগাজর সিদ্ধও এমন সাজিয়ে গুছিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে টেবিলে এনে হাজির করা হবে যে দেখেই আনন্দ হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং রসনেন্দ্রিয়ের পরিবর্তে দর্শনেন্দ্রিয়কে খুশি করে খাওয়ার আনন্দ বর্ধনে একটা লাভ আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, এতে পাকযন্ত্রেব উপর চাপটা কম পড়ে। বিলেতে ভারতীয় রেস্তোরাঁয় খেতে ভালোবাসতাম খুবই, কিন্তু ওদেশে বিলেতী খানায় হজমের গণ্ডগোল কদাচিৎ হয়েছে, যেটা দেশী খাবারে মাঝে মাঝে হত। বিশেষ কবে এই ভেজালের যুগে বোধ হয় এই দিকটিতে নজর দেবার সময় আমাদের দেশে এসেছে।

রান্নাখাওয়ার ব্যাপারে ওরা জিনিসপত্র ঢের বেশি ব্যবহার করে বলে মনে হয়েছে। খাবে তো সামান্য আলুসেদ্ধ, মাংসসেদ্ধ,—তার জন্যে চাই পুরো একটি ডিনার সেট, আরো কত কি যন্ত্রপাতি! খাবার টেবিল দেখে মনে হত যেন অপারেশন টেবিলে বসেছি। রান্নাঘরের আয়োজনও রন্ধন দ্রব্যের তুলনায় বেশি মনে হয়েছে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়েও ইউরোপ এবং ভারতের

ধারণার পার্থক্য লক্ষ্য করেছি। মনে হয়, এর জন্য অনেকটাই দায়ী দুই দেশের আবহাওয়া। যেমন, আমাদের দেশে নিত্যস্নান পরিচ্ছন্নতার একটি বিশেষ অঙ্গ। বিলেতে শীতের জন্য স্নানটা অনেক ক্ষেত্রেই বিলাসিতা। তিনসন্ধ্যা স্নান করায় অভ্যস্ত একটি শুচিবায়ুগ্রস্ত গৃহিণীকে বিলেতে ছেড়ে দিলে তিনি অভ্যাস পরিবর্তন না করলে অচিরে নিমুনিয়ায় কাশীপ্রাপ্ত হবেন, সন্দেহ নাই।

বিলেতের পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে সাজাগোজায়, ফিটফাট থাকায়। ভিতরের জামা যত নোংরাই থাক, যেটুকু বাইরে বেরিয়ে থাকবে, সেটুকু যেন ভদ্রসমাজে উত্‌রে যায়, তাহলেই হল। খাবার টেবিলে প্রত্যেকের একটি করে ঝাড়ন থাকে। খেতে খেতে এবং খাবার পরে সেই ঝাড়নে মুখ মুছলেই হল, তারপর সেই সুপের দাগলাগা, লিপস্টিকের দাগ লাগা এঁটো ঝাড়নটি পরেরবার ব্যবহারের জন্য তুলে রাখা হয়। সপ্তাহান্তে অথবা পক্ষান্তে সেটা যাবে ধোপার বাড়ি। আমাদের দেশের সকৃড়িতত্ত্ব এখানে অচল। খাবার পরে মুখ ধুতে দেখে আমার সঙ্গিনীরা বোধহয় আমাকে একটি দুনিয়া ছাড়া জীব ভাবত। খাওয়া শেষে লিপস্টিক ঠিক ভাবে লাগিয়ে নিলেই পরিচ্ছন্নতার পালা শেষ।

এরা কখনও রাস্তায় থুতু ফেলে না। এমন ঝকঝকে তকতকে রাস্তা আমাদের দেশে দেখা যায় না। থুতুর ব্যবহার এখানে অন্য। অন্যত্র এর যথেষ্ট মর্যাদা। যথা, খাম, টিকিট ইত্যাদি লাগানোর সময়ে জল থাকলেও চেটে লাগাতে প্রায়ই দেখেছি। বাচ্চারা নাকেমুখে অল্পস্বল্প ধুলো কাদা মাখলে মায়েরা অনেক সময়েই রুমালে একটু থুতু নিয়ে সযত্নে তাদের মুখ মুছিয়ে দেন, দেখেছি।

সহরের রাস্তার উপরে অথবা মাটির তলায় প্রচুর সাধারণের ব্যবহার্য পায়খানা ও প্রস্রাবখানা আছে। দরজার ফুটোয়

পয়সা ফেললে দরজা খোলে। কখনও সেখানে নোংরা পাই নি। অবশ্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একজন করে জমাদারনী বসে বসে উল বোনে অথবা রোমাঞ্চকর উপন্যাস পড়ে। সে এই পরিষ্কার রাখার কাজে অনেকটাই সাহায্য করে। তাছাড়া বাথরুমের গায়ে লেখা আছে, এটি যেমন পরিষ্কারভাবে পেতে আপনি ইচ্ছা করেন, তেমন পরিষ্কারভাবেই যাবার সময়ে একে রেখে যাবেন। এটি এদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করেই তারা পরের অসুবিধা ঘটায় না নিজের দেশে। যে রকম ব্যবহার তারা অপরের কাছ থেকে আশা করে, সে রকম ব্যবহারই তারা অপরের প্রতি করবে। অবশ্য, এই নীতিটা ঘরের গণ্ডীর বাইরেও প্রযুক্ত হলে বাঁচতাম। সেখানে অনেক ইউরোপীয় দেশ সঙ্কীর্ণভাবে স্বার্থপর। নিজেদের মতো অন্য দেশেরও সুখ সুবিধা আছে, তাদেরও নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি বলে কিছু কিছু ব্যাপারের বালাই আছে, একথা বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসনক্ষমতা যারা ভোগ করেছে সেই ইউরোপীয়দের বোঝানো কিঞ্চিৎ শক্ত।

গৃহিণীরা এদেশে প্রায় সব কাজই নিজে হাতে করে থাকেন। চাকরবাকরের খরচ সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। আমাদের সেণ্ট ক্যাথারিন্সে দেখেছি, একজন মালী ও বাসনমাজা, ঘর উপর উপর মোছার জন্য একজন ঝি ছিল। আর সব কাজ সিস্টারেরা হাতে করে করতেন। সিঁড়িগুলি পালিশ করা, রোজ পায়খানা ধোয়া, রান্নাবান্না করা,—সবই তাঁরা নিজেরাই হাসিমুখে করতেন। শারীরিক পরিশ্রমকে ইউরোপের মানুষ ভয় খায় না। তাদের অনেক উন্নতির মূলে আছে এই পরিশ্রম করার অভ্যাস। ভোর হতে না হতে গিন্নীরা প্যারাম্বুলেটারে ছেলেটাকে পুঁটলি পাকিয়ে, কুকুর, বেতের ঝুড়ি ও খবরের কাগজ নিয়ে বাজারে বের হন। কিউএ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের নিজের পালা এলে শাক-

তরকারী মাছ মাংস রুটি ইত্যাদি খরিদ করে বাড়ি ফিরে রান্না করেন, অর্থাৎ, প্রধানতঃ সেদ্ধ করেন।

গৃহিণীর কাজকর্মে পুত্রকন্যা ও স্বামী নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ পুরুষদের মতো গৃহকর্মে লজ্জা সেখানে দেখি নি। স্বামীও বাসন মাজছেন, পরিবেশনে সাহায্য করছেন, রবিবারে আবাব বাড়ির ভাঙা টেবিলের পায়া মেরামত করছেন অথবা দেয়ালের ফাটল সারাচ্ছেন,—এই রকমই দেখেছি। সংসারের সকলেব সহযোগিতা ব্যতীত সংসার চালানো দুরূহ কাজ। ইউরোপের সংসারে ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে সব কাজ হয়। খাবার সময়গুলিও বাঁধা। এতে গৃহিণীদের পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয়। সারাদিন সংসারের সব কাজকর্ম করার পবেও অন্যদিকে মন দেবার মতো তাঁদের যথেষ্ট সময় হাতে থাকে।

সকলের সহযোগিতা ছাড়া আরও একটা সুবিধা আছে। সেটা হল যান্ত্রিক ব্যবস্থা। ওদেশে ঘবে ঘরে আধুনিক যান্ত্রিক সুবিধা বর্তমান। যেমন, আদিম উনুন ধবানোর প্রণালী ওদেশে বিশেষ নেই। প্রায় সর্বত্রই গ্যাস, কোথাও বা বিজলীর উনুন। তাতে উনুন ধরানোর সময় ও হাঙ্গামা বাঁচে। ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়ে কাজ করতে এরা জানে বলেই এত কাজ একজনের পক্ষে করা সম্ভব হয়।

ইউরোপ নগদ বিদায়ের দেশ। কেউ কাবো জন্যে কিছু করলে তখুনি বলবে, 'ধন্যবাদ'। আমাদের দেশে ধন্যবাদটা মুখে দেওয়াব বিশেষ রেওয়াজ নেই। সাধারণতঃ সভাসমিতিতে কার্যশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার একটি অফিসিয়াল প্রথা আছে। এছাড়া ধন্যবাদ শব্দটি আমরা খুব বেশি ব্যবহার করি নে। এখানে কিন্তু ধন্যবাদ দেবার প্রথা অত্যন্ত বেশিরকম চালু বলে শিশু বয়স থেকেই মায়েরা বাচ্চাদের শেখান, কেউ লজেন্স চকোলেট দিলে তাকে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলতে। পদ্ধতিটি

ভালো। কেউ আমার জন্য কিছু করলে তাকে ধন্যবাদ দিলে ব্যাপারটি মিটে যায়। কিন্তু তা না হলে কৃতজ্ঞতার ভারে আমার ঘাড় ঝুঁকে পড়বে এবং এই কৃতজ্ঞতা মনের ও সময়ের রসায়নে কৃতঘ্নতায়ও কোনদিন পরিণত হতে পারে। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন ব্যক্তি তাঁর নিন্দে করেছে শুনে বলেছিলেন,—'কই, আমি তো ওঁর কোনও উপকার করিনি?' আমাদের দেশে বিদ্যাসাগরের মতো পরের জন্য আপনভোলা হয়ে এত উপকার খুব কম লোকই করেছেন। এত বড় কৃতঘ্নতার বোঝাও বোধ হয় খুব কম লোককে বহন করতে হয়েছে। 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলার প্রথা প্রচলিত থাকলে মহাপুরুষের মনের এই খেদটি হয়তো থাকত না। উপকারকাবীর কাছে উপকৃতের ঘাড় হেঁট হয়ে থাকে না যদি এই ধন্যবাদ দেবার প্রথা থাকে। এবং দুজনের সম্বন্ধের মধ্যেকার এইটুকু হুল থাকে না বলেই যে ঘটনা এ-দুজনকে কাছে এনেছে, তা দুজনের মধ্যে সহজ বন্ধুত্বের পথটি খোলা রাখে।

প্রথম প্রথম এই নগদ বিদায়ের ফিলজফিটা উপলব্ধি করতে পারতাম না বলে নানাবিধ উদ্ভট অবস্থায় পড়েছি। এরা দরকারে পড়লে যত সামান্য জিনিসই নিক না কেন, পরে ঠিক ফেরত দেবে। একটা কাগজ চেয়ে নিলেও পরে তা ফেরত দিতে দেখে প্রথমের দিকে একটু আহতই হতাম। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কমনরুমে একটি মেয়ের ডাকটিকিটের দরকার হয়ে পড়ল। আমার কাছে থাকায় আমি এগিয়ে দিলাম। তখন মেয়েটি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে দুটো পেনি আমাকে দিতে গেল। আমি তা নিতে সঙ্কোচ বোধ করাতে একটি সিগারেট বের করে বলল—Then have a Woodbine (তাহলে একটা উডবাইন নাও)। জানি না, বোধহয় ঐ সিগারেটটিরও দাম দুপেনি হবে।

ঠিক এই মনোভাব থেকেই তারা বলে, 'দুঃখিত, Sorry'. কারো পাটা জোর্‌সে মাড়িয়ে 'সরি' বলে দিলেই সাতখুন মাপ। বিলেতের

মতো ঠাণ্ডা দেশে জনসমাজে হেঁচে ফেলা সাংঘাতিক অপরাধ। হাঁচি পেলে নাকমুখ টিপে সেটি গলাধঃকরণ করতে হবে। যদি সামান্যতম শব্দও বের হয়, সঙ্গে সঙ্গে 'সরি' বলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ধন্যবাদ প্রদানের মতো দুঃখপ্রকাশের পদ্ধতিটিও ভালো, তাতে মনের মধ্যে কারো প্রতি আক্রোশ পুষে রাখা প্রয়োজন হয় না।

ইউরোপের ভদ্রতা এবং সামাজিকতার বিকাশের মধ্যেও অনেক কিছু লক্ষণীয় আছে। অবশ্য, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে আবার কিছু পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ ইংরেজ কথায় বার্তায় আলাপে আচরণে অত্যন্ত ভদ্র, কিন্তু একটু বেশি রক্ষণশীল। চট করে মনেব আবরণ সে খুলবে না, একবার যদি খোলে তো তখন বন্ধুত্ব হবে প্রগাঢ় এবং অচ্ছেদ্য। শ্লাভ দেশগুলিতে উচ্ছ্বাস একটু বেশি, আত্মীয়তাবোধও একটু বেশি মনে হয়েছে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির মধ্যে আমার স্বল্প অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে বলতে পারি, কথায় বার্তায় সুইডেনেব লোক ঢের বেশি রক্ষণশীল ডেনমার্কেব লোকদের চেয়ে। এইসব পার্থক্যের কারণ হয়তো নৃতত্ত্ববিদ্ ও সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের জানা থাকতে পারে।

ইউবোপের দেশগুলিতে চলাফেরা করা আমাদের দেশের তুলনায় অধিকতর সুবিধাজনক। রাস্তাঘাট সুগম বলে তো বটেই, তাছাড়া সাধারণ লোকেও সাহায্য করতে ব্যগ্র। রাস্তায় হৈ হল্লা প্যারিস্ ছাড়া কোথাও নজরে পড়েনি। ঘরে ঘরে বা বাড়ি বাড়ি বেডিও থাকলেও কখনও একঘর থেকে আর এক ঘরে বা এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে রেডিওর আওয়াজ শোনা যায় না। এ্যাম্প্লিফায়ার লাগিয়ে অপরের শান্তি নষ্ট করে আমোদ করার রেওয়াজ এখানে নেই। এসবই ইউরোপের জনসাধারণের উন্নত সমাজবোধের পরিচায়ক।

চুরি ডাকাতি রাহাজানি নরহত্যা প্রভৃতি সমাজবিরোধী কাজ

বর্তমান থাকলেও, সাধারণভাবে আমি অনেক সততা তাদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। পরেব জিনিস পথে পড়ে থাকলেও কেউ ছোঁয় না। রোজ ভোববেলায় দুধের বোতল প্রত্যেক বাড়িব দরজায় রেখে গয়লা চলে যায়, খবরের কাগজ রেখে কাগজওয়ালা যায়, কেউ নেয় না। বিশ্ববিদ্যালয়েব ক্লোকরুমে সারি সারি ওভারকোট ঝুলছে, কেউ অপবেরটাতে হাত দেবে না।

ভারতীয়দের প্রতি ওদেব মনোভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাধারণতঃ যেসব দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের স্বাদ পেয়েছে সে সব দেশের অনেকেই মনে মনে সাম্রাজ্যবাদী। পবেবটা নিয়ে বড় হতে তাদের আপত্তি নেই। অধিকাংশ লোকই আবার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ততটা জানেও না। এমন লোকের সন্ধান মিলেছে যারা মনে করে, ভারতবর্ষে ইংবেজ কোনদিনই নিজে থেকে শাসন করতে চায়নি, নেহাৎ পবোপকার প্রবৃত্তি দ্বারা পবিচালিত হয়ে এই দুরূহ কার্যভার তাকে তুলে নিতে হয়েছিল; ভারতবাসীরা সব সময়েই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করে এবং তাদের সভ্যতা অত্যন্ত কুসংস্কারবহুল। আফ্রিকা সম্বন্ধেও এই ত্রাণকর্তার ভূমিকাই ঔপনিবেশিকরা গ্রহণ কবে। দুটি ছোট্ট ঘটনা বলি। একবার লীড্সের একজন অধ্যাপিকা আমাকে বললেন, 'তুমি কি মনে কর না যে, ভারতে আমরা ইংরেজরা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষা করছি?' (তখনও দেশ স্বাধীন হয় নি)। আমি বল্লাম, 'সেই বেড়ালের ঝগড়ায় বাঁদরের ভারসাম্য রক্ষা করার মতো।' সেই থেকে ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে আর কোনওদিন রাজনীতি আলোচনা করেন নি। আর একটি গল্প। আমি একটা গ্রামার স্কুলে আফ্রিকা পড়াচ্ছিলাম। তার প্রাকৃতিক সম্পদ্ নিয়েই বেশি আলোচনা করেছি। আমাদের ক্লাস পরিদর্শক আর একজন লীড্সের অধ্যাপিকা ক্লাসের শেষে বললেন, 'তুমি যদি আফ্রিকাতে

ইউরোপীয় সভ্যতার প্রসার সম্বন্ধে বলতে,—কিভাবে আমরা সেই অনুন্নত দেশকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি,—তাহলে বেশ হত। আমি সবিনয়ে জানালাম, আফ্রিকাতে ইউরোপীয়দের বিস্তারের কথা বললেই আমার মানস চক্ষে এই ছবি ভেসে ওঠে যে, একটা জ্যান্ত লোককে কতগুলি শকুনি ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাচ্ছে। এ দৃশ্য আমার কাছে এত বেদনাদায়ক যে, এসম্বন্ধে আমি পড়াতে পারব না, তিনি যেন ক্ষমা করেন। এই ভদ্রমহিলাও আর কোনদিন রাজনীতি নিয়ে আমাকে খোঁচা দেন নি।

কিন্তু এও লক্ষ্য করেছি, ধীরে ধীরে তাদের ধারণা বদলাচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী ক্রমশঃই তাদের ভ্রমসংশোধন করাতে বাধ্য করছে। তবে, ইউরোপের মানুষের সঙ্গে যতটা মিশেছি, তাতে এইটাই মনে হয়েছে যে, তাদের আন্তর্জাতিক প্রীতির পশ্চাতে আত্মবিলোপের আশঙ্কা যতটা প্রেরণা জুগিয়েছে, বিশ্বমৈত্রী ততটা নয়।

ইউরোপের সভ্যতা উপকরণবহুল। তার মানে এই নয় যে, আমাদের সভ্যতায় উপকরণের স্থান নেই। যথেষ্টই আছে। কিন্তু যতটা হলে ভদ্রতা বজায় থাকে সেই বিচারে ইউরোপে জিনিসপত্র বেশি ব্যবহার করতে হয়। আমার মনে হয়, দেশের জলবায়ু এর জন্য অনেকটাই দায়ী। একটু উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। একটা পরিষ্কার মাদুর পেতে বসলে সাধারণ ভারতীয়ের বেশ চলে যাবে। কিন্তু বসতে হলে সাধারণ ইউরোপীয়ের চেয়ার, সোফা ইত্যাদি লাগবেই। গরম দেশে মেঝেতে বসা সভ্যতাব পরিপন্থী নয়। কিন্তু ঠাণ্ডা দেশে তা করা সম্ভব নয় বলেই বোধহয় এজিনিসটি সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। আমাদের দেশে একজন ভদ্রলোক একটা ধুতি আর বড়জোর একটা ফতুয়া কি গেঞ্জি পরে বাড়িতে এবং পাড়ার মধ্যে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারেন। কিন্তু ওদের দেশে তা

চলবে না। অবশ্য, রোদ পোহাবার সময়ে পুরুষদের একটি খাটো পায়জামাই যথেষ্ট হয়। মেয়েদের তার অতিরিক্ত একটি কাঁচুলি। রান্না খাওয়ার সরঞ্জামবাহুল্যের কথা আগেই বলেছি। সেলাই কবার মধ্যেও সেই কথা। আমরা সাধারণতঃ ও দেশের তুলনায় কম সবঞ্জাম নিয়ে সেলাই করি।

উপযুক্ত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি অল্প সময়ে অনেক কাজ করতে সাহায্য করে। অনেক সময়ে পরনির্ভরতার হাত থেকেও তা আমাদের রক্ষা কবতে পারে। কিন্তু দেখতে হবে, জীবন এগুলির দ্বারা অনর্থক জটিল্ হয়ে পড়েছে কি না। উন্নতি হলে জটিলতার সার্থকতা আছে, না হলে নয়। আরও দেখতে হবে, উপকরণ আমাদের পেয়ে বসেছে কি না। সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে গেলে উপকরণের উপযোগিতা অনস্বীকার্য, কিন্তু সেইগুলিই যেন আর সব কিছুকে ছাপিয়ে না ওঠে। মানুষের জন্যই উপকরণ, উপকরণের জন্য মানুষ নয়। তা না হলে আসে জড়ের দাসত্ব, চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। জীবনে যন্ত্রের স্থান অত্যধিক হলেই তাই হবে। আমার চাহিদা অতিরিক্ত হলে আমার দেশে না কুলালে পরের দেশের দিকে আমি হাত বাড়াবো। সুতরাং উপকরণবহুল সভ্যতা সেদিক থেকে আন্তর্জাতিক শান্তি এবং জগদৈক্যানুভূতির পক্ষে ক্ষতিকর।

এই সভ্যতার আর একটি অসুবিধা হচ্ছে যে, এতে মনে করায়, উপকরণের প্রাচুর্যের উপরেই নির্ভর করে জীবনের চরম সার্থকতা। লণ্ডনে যখন চিনি নিয়ন্ত্রিত ছিল, প্রাগে চায়ের সঙ্গে চমৎকার ছোট ছোট ইঁটের মতো চিনিব টুকরোব আস্বাদ নিতে নিতে একজন ইংরেজ মহিলা বলে উঠেছিলেন, 'Prague sugar with London tea will make life perfect' (প্রাগের চিনি আর লণ্ডনের চা জীবনকে নিখুঁত করে তুলবে)। কথাটা শুনে আমার মনে হল, জীবনের পরিপূর্ণতা কি এত সহজেই আসে?

আমেরিকানদের মধ্যে এ মনোভাব প্রবলতর দেখেছি। একজন আমেরিকান মহিলার সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করেছিলাম। আমার প্রশ্ন ছিল, আপনারা তো একটা হলে আর একটা চান, রেডিও হলে ফ্রিজিডেয়ার চান, ফ্রিজিডেয়ার হলে বাড়ি চান, বাড়ি হলে গাড়ি চান—কিন্তু এ চাওয়ার শেষ কোথায়? তিনি বলেছিলেন, 'সত্যিই আমাদের চাওয়ার শেষ নেই।' আমার মনে হয়েছিল, এর ঊর্ধ্বে আমি যদি উঠতে না পাবলাম, উপকরণের আকাঙ্ক্ষাতেই যদি নিজেকে আমবণ জড়িয়ে রাখলাম তবে মুক্তি কোথায়? সংসারের মধ্য দিয়ে বন্ধনমোচনের স্বাদ তো তবে মিলল না!

এই উপকরণবহুল সভ্যতার সন্তান হচ্ছে ফ্যাশান। দেহকে সাজিয়ে গুজিয়ে প্রয়োজন হলে উৎকটতম রূপ ধরতেও এদের আপত্তি নেই, যদি তাতে ফ্যাশান বজায় থাকে। মেয়েরা কাপড় পরবে এমনভাবে যাতে তাদের lines অর্থাৎ দৈহিক রেখা সুন্দর দেখায়,—কাবণ এটাই ফ্যাশান। কোনও ভদ্রলোক যদি কোনও ভদ্রমহিলাকে বলেন—'Oh! You have kept your lines wonderfully well!' (আপনি আপনাব ফিগারটি খুব সুন্দর রেখেছেন দেখছি), তাহলে সেটা একটা শিষ্টাচাব ও প্রশংসা বলে মেনে নিয়ে তাঁকে সৌজন্যসূচক ধন্যবাদ দিতে হবে। এই জন্যই fully fashioned nylon stokings এর অত্যন্ত আদর, কারণ, সেই নাইলনের মোজায় পায়ের সম্পূর্ণ গড়নটি দেখা যাবে। আবার আজ যে ছাঁটকাট চলছে কাল তা বাতিল, তার কারণ New look অর্থাৎ নতুন ফ্যাশানেব আমদানী। লীড্‌স্ বিশ্ব-বিদ্যালয়েব কর্মরত এক ভদ্রমহিলাকে মেয়েবা ডাকত মিস্ টুয়েন্টি-ফোর বলে, তার কারণ, তাঁব চুল ছাঁটাব ধরনটি নাকি ১৯২৪ সালের ফ্যাশন সম্মত। তাঁকে মেয়েবা এমনভাবে দেখত যেন তিনি একটি প্রাগৈতিহাসিক জীব। আমাদের দেশেও ফ্যাশান বস্তুটি অজানা

নয়। তবে, তার পরিবর্তন এদেশের মতো এত দ্রুত নয়, এবং সেই পরিবর্তন না করলেই যে সমাজে কেউ উপহসিত হবে, তাও নয়।

দেহের নানাস্থানের রং পরিবর্তন করার প্রথা ইউরোপীয় মহিলাসমাজে খুবই আদৃত। কয়েকটি মজার দৃষ্টান্ত দিই। আমি দেখেছি, একজন মহিলা তাঁর চুলকে ঘোর বেগুনী রংএ রঞ্জিত করেছিলেন। অনেকে আবার ব্লণ্ড সাজবার আশায় চুলগুলিকে bleach করে সাদা করে ফেলে, ঠিক যেন শনের নুড়ি। কিছুদিন পরে যখন চুল বাড়ে, তখন গোড়ার চুল ও আগার চুল দুইরঙা হয়ে অত্যন্ত কৌতুকাবহ হয়। গ্রীষ্মকালে রোদে ভাজা ভাজা হওয়া একটা ফ্যাশান বলে সে সময়ে অনেক মহিলা মোজা না পরে পায়ে হাল্কা করে খয়েরী রংএর প্রলেপ দেন, যেন রোদে পুড়ে পায়ের ঐ চেহারা হয়েছে। কিন্তু একথা সত্যি যে, রং না মাখলে এবং ঠিকমতো মেক আপ না করলে অনেক মেমসাহেবেরই মুখের দিকে তাকানো যায় না। একটি দিব্য শ্রীময়ী সুহাসিনী তরুণীকে রাতে শোবার সময়ে দেখে চম্‌কে উঠেছিলাম। সামনের কয়েকটা দাঁত ভাঙা, চোখের ভ্রূ বা পাতি আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না, সমস্ত মুখ যেন মড়ার কঙ্কালের মুখ, অন্ধকারে দেখলে ভয় পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তখন মনে হল, ভাগ্যিস্ এ রঙ্ মেখে জনসমাজে আসে!

ইউরোপে সমাজকল্যাণকর প্রচেষ্টার অবধি নাই। কি হলে সকলে সুখে থাকবে, সে চেষ্টা সবসময়েই চলে। কোন কোন দেশ, যেমন ডেনমার্ক, সেদিকে খুব উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। নিজেদের সমাজ এবং বৃহত্তর মানবসমাজের কল্যাণের জন্য নিঃশেষে আত্মবলিদান করেছেন এমন ইউরোপীয় মানুষের সংখ্যা প্রচুর।

নিরাসক্তভাবে পরের জন্য কিছু করতে ইউরোপের জুড়ি নাই। কিন্তু তারই পাশে পাশে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি।

পারিবারিক ব্যাপারে ইউরোপের মানুষকে আমার একটু অধিক পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক মনে হয়েছে। এবং এও মনে হয়েছে যে, এই আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে সে যথেষ্ট সুখী নয়।

কথাটা আর একটু বিশদ করে বলি। এদের পরিবারকে বিশ্লেষণ করলেই যা বলতে চাচ্ছি তা বোঝাতে পারব। পরিবারের গণ্ডী এদের খুব ছোট। পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। বিবাহের পর ছেলেও স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা থাকে, আগেই বলেছি। শ্বাশুড়ী পুত্রবধূর চিরন্তন সমস্যা এরা এইভাবে মিটিয়েছে। অবশ্য, এই নিয়ে নানা কথাই বলার আছে। যাই হোক, প্রত্যেকের স্বাধীন মনোবৃত্তিকে ইউরোপ শ্রদ্ধা করে।

শিশুদের যত্ন নেওয়ার অনেক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা আছে। এমন কি, শিশু গর্ভে এলে তার যত্নও রাষ্ট্র থেকে নেওয়া হয়। কিন্তু শিশু ও মায়ের মধ্যে কতগুলি ব্যাপার নজরে পড়ে। এরা বাচ্চাদের যত্ন যতটা করে, আদর ততটা করে না। আমাদের দেশে আবার আদর যতটা করা হয়, উপযুক্তভাবে যত্ন ততটা করা হয় না প্রায়ই। অবশ্য, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতাই এর কারণ। শিশুর বৃদ্ধির মুখে কি কি করা দরকার, আমরা অনেকেই সে বিষয়ে খুব সচেতন নই। যাই হোক, শিশুর উপযুক্ত বিকাশের পক্ষে দুইই দরকার,—উপযুক্ত পরিমাণে আদর ও যত্ন। ইউরোপের পরিবারে পরস্পরের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান আছে বলে মনে হয়েছে। শিশু ক্রমশঃ শেখে মাকে বিরক্ত না করতে, তাঁর সময় অসময়গুলি দেখতে। এ শিক্ষা যে খারাপ তা মোটেই বলছি না। কিন্তু এটা অনেক সময়েই এমন স্তরে পৌঁছায়, যেখানে বয়স্কদের মতো বিবেচনা শক্তির প্রয়োজন, এবং যার ফলে বাচ্চা ও মায়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম আড়াল গড়ে ওঠে। ভদ্রতার সীমা এখানেও কখনো লঙ্ঘন করা যাবে না। কোন কিছুর দরকার হলে মাকেও

প্লীজ না বললে চলবে না, মাকেও ধন্যবাদ দিতে হবে। এ শিক্ষা ওদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক বলে হয়তো এতে ওদের কিছু মনে হয় না, কিন্তু এতটা ফর্‌ম্যালিটি আমাদের চোখে দূরত্বের আভাস দেয়।

আমরা সাধারণতঃ এক পরিবারের লোকদের ঘরে ঢোকার সময়ে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রছাড়া অনুমতি নিয়ে ঢুকি না। এরা কিন্তু বিনা অনুমতিতে কখনও কারো ঘরে ঢুকবে না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এরা প্রিয়তম সম্পর্কের বেলাতেও এতটুকু বিসর্জন দেয় না।

স্বামী-স্ত্রীর বিবাহবন্ধন ছিন্ন হওয়ার ব্যাপার ইউরোপে বেশ সাধারণ। শিশুরা এসব ক্ষেত্রে খুব কষ্ট পায়। এ কষ্ট আর্থিক দিক দিয়ে যদি নাও হয়, তবু, হৃদয়ের দিক থেকে তো বটেই। অবশ্য, আমাদের দেশেও স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য যে নেই তা নয়, এবং বাচ্চাদের উপরে তার বিষময় প্রভাব কিছু কম পড়ে না। তবে ওসব দেশে সব কিছুরই হিসেব নিকেশ করার একটা রীতি আছে বলে এসব নজরেও পড়ে বেশি।

যৌবন ইউরোপে অভিনন্দিত। বৃদ্ধও এখানে যুবা সাজতে চায়। সাধারণতঃ বয়স্ক লোককে খুশি করার একটি সাধারণ উপায় হচ্ছে তাঁকে দেখে অল্পবয়স্ক বলে ভুল করা। আমাদের দেশের মতো যৌবন এখানে লজ্জার বিষয় নয়। তারুণ্যের আনন্দ উপভোগকেও ইউরোপের সমাজ মস্ত বড় স্থান দেয়। ইংল্যাণ্ডে একটি প্রথা আছে। এখানে একুশ বছরের জন্মদিন মেয়েদের পক্ষে খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (ছেলেদেরও পক্ষে কি না জানি না)। এ দিনটি বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। একুশ বছরের জন্মদিনের জন্য আলাদা ধরনের কার্ড পাওয়া যায়। তাতে একটি চাবির ছবি থাকে। প্রায়ই দেখেছি, সোনালী রংএর চাবি আঁকা থাকে। মেয়ে সাবালিকা হল, যৌবরাজ্যের তোরণের চাবি তার হাতে তুলে দেওয়া হল, এই অর্থ। ঐদিন

বাবা মা মেয়েকে তাঁদের বাড়ির সদর দরজার একটি বড় চাবি দেন। সেটা দিয়ে বাইরে থেকেও দরজা খোলা যায়। মেয়ে বড় হয়েছে, সে যখন খুশি বাড়ি ফিরবে, কিন্তু বেশি রাতে ফিরে দরজা খোলার জন্য অন্যকে যাতে বিরক্ত করতে না হয় সেইজন্যই তাকে চাবিটা দেওয়া হয়। মেয়েকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেবার অফিসিয়াল অর্থাৎ সমাজস্বীকৃত বয়সটা একুশ হলেও তার আগেও মেয়েরা অনেক স্বাধীনতাই ভোগ করে থাকে।

নরনারীর বন্ধুত্বের আনন্দ লাভ সাধারণতঃ এই স্বাধীনতার প্রধান অঙ্গ। ইউরোপের মানুষ খুব সহজেই একে গ্রহণ করে। দেখেছি, বন্ধুত্ব খুব সহজেই হয়, সহজেই অন্তরঙ্গতা বহুদূর গড়ায়, আবার, তার চেয়েও সহজেই একদিন ফাটা বেলুনের মতো এই বন্ধুত্ব যায় চুপ্‌সে। যতটুকু লক্ষ্য করেছি, তাতে মনে হয়েছে (জানি না অবশ্য একথা কতদূর সত্য,) ওদের দেশে এই বন্ধুত্বের মরশুম হল গ্রীষ্মকাল। সে সময়ে সূর্যদেব উঁকি মারেন, সোনায় নীলায় জড়ানো দিনগুলি দুর্লভ রত্নালঙ্কারের মতো মূল্যবান্ বোধ হয়, চারিদিকের সৌন্দর্যের কথা আগেই বর্ণনা করেছি। এই উদ্দীপন বিভাব হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে পরম পুলক। তখন পথেঘাটে ঘাসের উপরে এখানে সেখানে অসংখ্য প্রেমিকযুগল দেখা যাবে নানা ভঙ্গীতে। আমরা অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার দেখে বিস্মিত হতাম, ওরা কিন্তু নজরই করে না। এই প্রেম দেখেছি অনেক সময়েই স্তিমিত হয়ে আসে শরতে বা শীতে, যখন প্রকৃতি নিজের চাবদিকে টেনে দেয় হিমকুয়াশার অবগুণ্ঠন। তাই বলি,—গ্রীষ্মের প্রেম শরতে মিলায়।

এরা সাধারণতঃ একসঙ্গে থিয়েটার সিনেমা দেখে, বেড়াতে যায়, কখনও বা ইচ্ছে হলে এক হোটেলে কিছুদিন কাটিয়ে আসে। মেয়েটি প্রায়ই পুরুষ বন্ধুর কাছ থেকে নানারকম উপহার লাভ

করে। উপহারগুলিও অদ্ভুত, কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি, যথা— চকোলেটের বাক্স, পাউডার কেস, নাইলনের মোজা, রাতকামিজ, হটওয়াটার ব্যাগ ইত্যাদি। উপকরণবহুল সভ্যতা এদের মর্মে মর্মে কিরকম প্রবেশ করেছে তা এই তালিকা থেকেই বোঝা যাবে। এই তালিকার একটিও আমার কল্পিত নয়, যা দেখেছি, তাই লিখছি।

যখন ছাড়াছাড়ি হয়, মেয়েদের প্রশ্ন করে দেখেছি, জবাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম, যথা,—ওর সঙ্গে ঠিক মিলছে না, খাপ খাচ্ছে না, অথবা, ও বড্ড প্রভুত্বপ্রিয় (domineering), আমার মনকে আমি ভুল বুঝেছিলাম, ভালো লাগাকে মনে হয়েছিল ভালোবাসা—ইত্যাদি।

কিন্তু এই উপলব্ধির মূল্য কি ইউরোপের মানুষকে কম দিতে হয়েছে? সাময়িকভাবে হলেও অজস্র চোখের জল ঝরতে দেখেছি, মানসিক ব্রেক ডাউন হতে দেখেছি। ক্ষত শুকিয়ে গেলেও দাগ থেকে যায়, গোপনে দীর্ঘশ্বাস পড়ে সারাজীবন ধরে। এর বেদনা কি কম?

প্রায়ই বয়স্ক লোককে সন্ধ্যা কাটাতে দেখেছি ক্লাবঘরে। ক্লাবের সামাজিক মূল্য অস্বীকার করি না, কিন্তু গৃহে দিনের শেষে প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ করার মূল্য নিশ্চয়ই অধিকতর। মনে হয়, এখানেও সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিরাজ করছে ছুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতো, বাড়িতে আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয় বলেই দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি দূর করার জন্য আশ্রয় নিতে হয়েছে এই পাইকারী ব্যবস্থার কাছে।

বৃদ্ধদের জন্য অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশেই নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। পেনশন, থাকার ও চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থার কথা আমি প্রবন্ধান্তরে উল্লেখ করেছি। একদিক থেকে দেখতে গেলে, ভালোই লাগে এ ব্যবস্থা। আমাদের দেশে অনেক বৃদ্ধেরই বড়

কষ্ট। প্রাচীনকালে যে বানপ্রস্থের বিধি ছিল, সেটা মন্দ নয়। বৃদ্ধদের চেয়ে তাদের পুত্রকন্যারা পরবর্তী যুগের। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গীর মিল না হতে পারে। সংসারে থাকলেই বিভিন্ন ছোটবড় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে পারা যায় না, এবং ফলে অনেক অশান্তি। যে বৃদ্ধ সরকারী চাকুরে, কাজের শেষে সরকার থেকে পেনশন পান, সংসারে তাঁর আদর যত্ন হবেই। যে বৃদ্ধের সঞ্চিত অর্থ তিনি মরলেই হস্তগত হবে, অথবা যে বৃদ্ধের অর্থসম্বল কিছু নেই, তিনি তাড়াতাড়ি সরে পড়লেই মঙ্গল, এরকম মনোভাব অনেক সময়েই আমাদের দেশে দেখেছি। একটি প্রচলিত ছড়া এই সমস্যার কথা ইঙ্গিত করছে,—

বুড়োকে উদ্‌বিড়ালে খাক্,
আমার ঝক্কি চুকে যাক্।

শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গরও এই কথাই বলছে।

এই বার্দ্ধক্যের অভিশাপ মোচন করেছে ইউরোপ। সেখানে কেউ কারো গলগ্রহ নয়, রাষ্ট্রই ব্যবস্থা করে। কিন্তু এরও একটি অতি করুণ দিক আছে। নাতিনাতনীর স্নেহস্পর্শ থেকে এই মৃত্যুপথযাত্রীরা বঞ্চিত হয়।

ইউরোপে পারিবারিক দায়িত্বের অনেকটাই আজ রাষ্ট্র বহন করেছে বলে লোকের ঘাড়ের বোঝা হাল্‌কা হয়েছে সন্দেহ নাই, এবং তার জন্য জীবনযাত্রা ঢের সুগমও হয়েছে।

কিন্তু, একটা কথা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে মানসিক একাকিত্ব। পরিবারে পরস্পরের মধ্যে যতটা আন্তরিকতা থাকা উচিত, অনেক ক্ষেত্রেই তা থাকে না। তার মূলে আমার মনে হয়েছে, অত্যুগ্র স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা যা নিজের চারিদিকে একটা গণ্ডী কেটে রাখে। হৃদয়ের সর্বস্বঢালা অকৃত্রিম ভালোবাসা পাওয়া ও তেম্‌নিভাবে ভালোবাসতে পারাও আলো বাতাস খাদ্যের মতো মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। নিজের মনের বাধা

যদি সেখানে বড় হয়ে দাঁড়ায় তো সে বাধা দুরতিক্রম্য। এই কারণেই মানসিক গোলযোগ বা সাময়িক মস্তিষ্কবিকৃতির কথা ইউরোপে আজকাল খুব বেশিই শোনা যাচ্ছে। মানুষের একটি মৌলিক চাহিদার পূরণ না হলে জীবনের মূল ধরে নাড়া পড়ে। ইউরোপের মানুষ ভিতরে ভিতরে অসুখী, ঐশ্বর্যের বিলাস-উপকরণের মধ্যে কাঁদছে একটি স্নেহকাঙাল নিঃসঙ্গ মন। আমার চোখে ইউরোপীয় জীবনের এইটিই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডী।

॥ ফেরার পথে ॥

দীর্ঘ দুটি বছর বিলেতবাসের পর ঘনিয়ে এল দেশে ফেরার দিন। বাইশে অক্টোবর সাউদাম্পটন্ থেকে পি এণ্ড ও'র জাহাজ ছাড়বে। একখানা স্পেশাল ট্রেণ ওয়াটার্লু স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। ভারী মালপত্র আগেই পাঠান হয়েছিল, সঙ্গে ছিল শুধু দুটো ছোট ছোট সুটকেশ। স্টেশনে বন্ধুরা বিদায় দিতে এসেছিলেন। দুবছর আগে এম্‌নি কুয়াশা ঢাকা আকাশের তলায় এই ওয়াটার্লু স্টেশনে এক ভীরু বাঙালী মেয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত আবেষ্টনীতে এসে দাঁড়িয়েছিল, মনে ছিল তার উদ্বেগ কৌতূহলের মিশ্রণ, সুদূর সাগরপারের ছোট্ট ঘরটির জন্য বেদনা আর নতুনকে জানার আনন্দ। আজ বাইশে অক্টোবর আবার সেই স্টেশনে এসে সে পিছনে ফেলে যাচ্ছে সেই আবেষ্টনী যা দুবছর ধরে তিল তিল করে হয়ে উঠেছিল তার অতি আপনার। প্ল্যাটফর্মে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে বিদায় জানাবার জন্য ব্যথাতুর জনতার ভীড়। একটা কুড়ি মিনিটে বিদায়ের পালা হল সাঙ্গ, ট্রেণ ছুটে চলল সাউদাম্পটন ডকের অভিমুখে।

ট্রেণে আমার সামনে একটি ইংরেজ মহিলা অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জন করছিলেন। তাঁকে দেখে আমারও মনটা ভারী উদাস উদাস হয়ে গেল। কয়েকটি ভারতীয় ভদ্রলোকও সেই কামরায় ছিলেন, তাঁরা খুবই সদালাপী ও সাহায্যপরায়ণ। আমাদের মনে ছিল বাড়ি ফেরার আশা, কিন্তু যাঁরা তাঁদের ঘর আজ পিছনে ফেলে চললেন কোন সুদূরের পানে, তাঁদের জন্য আমার বড়ই দুঃখবোধ হল।

সাউদাম্পটন ডকটি বেশ প্রশস্ত। আমাদের জাহাজ এস্. এস্. কার্থেজ (S. S. Carthage) চৌদ্দ হাজার টন ভারী। অতিশয় বৃহদাকার না হলেও মোটের উপর বড়ই, জলে দাঁড়িয়ে

ধোঁয়া ছাড়ছিল। ডকে নেমে খালি মনে হচ্ছিল কতক্ষণে উঠি। কাস্টম্‌সে জিজ্ঞাসাবাদ করেই ছেড়ে দিল, জিনিসপত্র কিছুই খুঁজে দেখল না।

জাহাজে উঠতে উঠতে বিকেল হয়ে এল। ঘণ্টা দিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। ইংলিশ চ্যানেলের শান্ত জলে সামুদ্রিক পাখির কলরব তখনও থামেনি। আমরা সবাই ডকে দাঁড়ালাম। ধীরে ধীরে সমুদ্র মথিত করে জাহাজ বন্দর ছাড়ল। তখন আমরা কেবিনে ঢুকে জিনিসপত্র গুছোতে লাগলাম।

আমার কেবিনটি বেশ। দুজনের জন্য দুটি বার্থ,—আমারটা উপরের। আমি উপরের বার্থই পছন্দ করি। পোর্টহোল দিয়ে আকাশ ও সমুদ্রের টুক্‌রো চোখে পড়ে। কেবিনটি সুন্দরভাবে সাজানো, গরম ও ঠাণ্ডা জলের বেসিন, দাঁড়ানো আয়না, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ডরোব, লিখবার জায়গা, চেয়ার ইত্যাদি আছে। আর আছে একটি মই, যা বেয়ে 'ভোজরাজার সিংহাসনে' ওঠা যায়। আমার কেবিনে একটি সিন্ধী মেয়ে ছিল, তার সঙ্গে ভাব হতে এক মিনিটও লাগল না।

কিছুক্ষণ জাহাজ চলবার পরই পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠল, আর লাইফবেল্ট নিয়ে মহড়া দেবার জন্য সবাই ডেকের উপর জড় হল। তখন আর কূল দেখা যায় না। মহড়ার পর জাহাজটা ঘুরে দেখতে গেলাম। জাহাজ এ, বি, সি, ডি, ই—এই পাঁচটি তলায় বিভক্ত। "ই" ডেকের তলায় আছে গুদাম ঘর, হোল্ড এবং এঞ্জিন। গুদাম ঘরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে জিনিস আনা যায়। খালাসীগুলির অধিকাংশই ভারতীয়, তারা হিন্দুস্থানী বুঝতে পারে, সামান্য বলতেও পারে। যতদিন জাহাজে ছিলাম, খুবই ভদ্র ব্যবহার পেয়েছি তাদের কাছ থেকে। তাছাড়া ভারতবাসী বলে একটি স্বাজাত্যবোধও ছিল।

"ডি" ডেকে আমাদের খাবার ব্যবস্থা। "সি" ডেকে বেশ

বড় দুটি লাউঞ্জ, একটিতে লাইব্রেরী এবং অন্যটিতে পানীয় বিক্রয়ের দোকান। নানাপ্রকার পত্রিকা এবং খেলাধুলোর ব্যবস্থাও প্রচুর। "বি" ডেকের একটা অংশে প্রথম শ্রেণী। সেই দিকটি বিধিনিষেধের প্রাচীর তুলে একেবারে পৃথক করা আছে। "বি" ডেকে সাঁতার কাটা এবং সূর্যস্নানের ব্যবস্থা আছে। "এ" ডেকে সাধারণতঃ যাত্রীদের যেতে দেওয়া হয় না, কিন্তু একদিন সকালে আমাদের সবাইকে ডেকে ওঁরা জাহাজের যন্ত্রপাতি দেখান। নানাপ্রকার কলকব্জায় সে জায়গা পূর্ণ। কর্ণধার একদৃষ্টে একটি কাঁটার দিকে চোখ রেখে জাহাজের গতির দিক্ নির্ণয় করছিল এবং আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। প্রতি ছয় ঘণ্টা করে ওখানে একজনের পালা থাকে এবং সে সময়টা কর্ণধারকে সমানে দাঁড়িয়ে ঐ কাঁটার দিকে লক্ষ্য রেখে চাকা ঘুরোতে হয়, একটু এদিক ওদিক হলেই অকূল সমুদ্রে পথ হারাবার সম্ভাবনা।

বছরের এই সময়টা সাধারণতঃ সমুদ্র শান্ত থাকে। তাই সামুদ্রিক পীড়ায় বিশেষ কষ্ট কেউই পায়নি। খেলাধুলো, নাচগান, থিয়েটার, সিনেমা, ফ্যান্সি ড্রেস ইত্যাদিতে যাত্রীদের সময় কাটত মন্দ না। রোজ সন্ধ্যাবেলায় বেতারে সংবাদ আসত। এছাড়া বহির্জগতের সঙ্গে যোগ বিশেষ ছিল না। তাই জাহাজের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল একটি ছোট জগৎ। সেখানে বহির্জগতের মতো হাসি, কান্না, দ্বন্দ্ব, কৌতূহল, পরচর্চা ইত্যাদি সব কিছুই ছিল। কিন্তু আমার এই ভেবে আশ্চর্য লাগত যে, এই যে এত সৌন্দর্য অকৃপণ হস্তে বিধাতা এখানে ছড়িয়ে রেখেছেন এওকি মানুষকে একটু ভুলতে দেয়না তার মনের নাগপাশ? দিগন্ত এখানে মানুষেব তৈরী ইট পাথরের ঔদ্ধত্যে ক্ষত-বিক্ষত নয়, কূলহারা সমুদ্রে কদাচিৎ দেখা মেলে দূরগামী জাহাজের, পথভ্রান্ত পথিকের নির্দেশের জন্য মানুষের কল্যাণবুদ্ধির দান বাতিঘর ছাড়া মনুষ্য-মনের চিহ্ন বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য

কতরূপেই না আত্মপ্রকাশ করেছে এখানে! বিরাট সমুদ্রে সকালসন্ধ্যা কতরকম বর্ণ বৈচিত্র্য। মাথার উপরে দিগন্তজোড়া আকাশ তার চন্দ্রসূর্যনক্ষত্রের সমস্ত মহিমা নিয়ে বিরাজমান। বাতাস এখানে মুক্ত উদার, মানুষের যান্ত্রিক বুদ্ধির প্যাঁচে পড়ে বিষাক্ত হয়ে ওঠেনি। তবু এখানেও দেখি মানুষের আত্মম্ভরিতার বড়াই, তুচ্ছ ঈর্ষা কলহ। এক শান্ত সন্ধ্যায় চাঁদ উঠেছিল। আমি একটি নির্জন স্থানে চুপ করে দেখছিলাম তরঙ্গের উপরে জ্যোৎস্নার খেলা, কিছুদিন আগে দেখা এক চৈনিক শিল্পীর আঁকা "তরঙ্গ ও চাঁদ" নামক ছবিটির ব্যঞ্জনা চোখের সামনে অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছিল। অকস্মাৎ সন্ধ্যার শান্তি ছিন্ন ভিন্ন করে তীব্র স্বরে কে কথা কয়ে উঠল। চমকে দেখি একটি ইংরেজ ভদ্রমহিলা দুজন ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ কর্কশ সুরে খুব জোর দিয়ে বললেন, "কিন্তু আমি একথা নিশ্চয় বলব যে এই উদীয়মান চন্দ্র আমার মন অবশ্য হরণ করে।" বলে দুসেকেণ্ড চাঁদের দিকে তাকিয়েই পূর্বের প্রসঙ্গ ধরে কি সব বৈষয়িক আলাপে ব্যাপৃত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন। অনুভূতির প্রকাশ ব্যক্তি অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে, তথাপি এই সৌন্দর্য আস্বাদের প্রণালীটি আমার কাছে বড়ই অদ্ভুত লাগল।

জাহাজে পতিতোদ্ধার ব্রত নিয়ে বহুসংখ্যক মিশনারী ভারতবর্ষ, সিংহল, মালয় ও চীনে যাচ্ছিলেন। তাঁদের কথাবার্তার দুএকটি টুকরোও কানে আসত মাঝে মাঝে। এক রবিবারে উপাসনার সময়ে খ্রীষ্টধর্মের প্রশংসা করতে গিয়ে অন্যান্য ধর্মের বহুবিধ নিন্দাবাদ করা হয়েছিল। তার অবশ্য প্রতিবাদও হয়েছিল এবং এই নিয়ে কিছুদিন খুব আন্দোলন চলল। সেই মিশনারীদের কেউ কেউ প্রায়ই নাকি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতেন। আমার একটি বৃদ্ধা মিশনারীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মানুষটি মোটের উপর মন্দ ছিলেন না। আমাকে তিনি অনেক ধর্মকথা শোনাতেন,

আমিও তাঁর পক্ষে খুব ধৈর্যশীল শ্রোতা ছিলাম। তবু, মাঝে মাঝে তাঁর কথা শুনে আমার হাসি পেত। একবার তিনি ঈশ্বরের কথা শোনার প্রণালীটা আমাকে একটু বলেছিলেন। একটা সভায় আগত লোকদের কাগজ পেন্সিল দিয়ে বলা হল, আপনারা মনে মনে পাঁচমিনিট ভাবুন, আর ভগবান আপনাদের যা করতে নির্দেশ দেন সেটা কাগজে লিখুন এবং সেইমতো কাজ করুন। একবার একজন এই ভাবে স্থির করল যে তার বাগ্‌দান ভেঙ্গে-দেওয়াই ভগবানের অভিপ্রায়, এবং একবার এক দম্পতী স্থির করল যে, তাদের বিবাহবিচ্ছেদ অনিষ্টকর। এই রকম ছোটখাট অনেক ঘটনা তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে নিয়ত যুক্ত যিনি তাঁর লক্ষণ গীতাতে ভালমতোই আছে। কিন্তু এদের তো কাউকে 'বীতবাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীঃ' ইত্যাদি বলে মনে হয় না! যিনি ঈশ্বরকে জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি জাগতিক ক্ষুদ্রতাব বহু উর্ধ্বে। বাহ্যিক আড়ম্বরে কোন কোন মানুষকে ভোলানো যায় বলে ঈশ্বরকেও এঁবা তাই দিয়ে ভোলাতে চান!

যাই হোক, আমি সাধারণতঃ ভীড় থেকে একটু দূরেই থাকতাম। সারাদিন সমুদ্রেব দিকে তাকিয়ে থেকেও আমার ক্লান্তি আসত না।

এমনি কবে অতলান্তিক সমুদ্র, বিস্কে উপসাগর, জিব্রাল্টার, ভূমধ্যসাগর পেবিয়ে এলাম। আফ্রিকার সমুদ্রতট মাঝে মাঝে বেশ একটু বৈচিত্র্য আনল। সূর্যের তাপ প্রখরতর হয়ে উঠল, আর ইংরেজ সহযাত্রিণীরা দেহে বাদামী আভা আনার জন্য রৌদ্রাভিলাষিণী হলেন। দেখে আমার ছেলেবেলার রচনাশিক্ষা বইএর একটি পদ্য মনে এল—

"নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস
ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।"

গৌরবর্ণ সৌন্দর্যের লক্ষণ ভেবে ভারতীয়ারা প্রাণপণে ফর্সা হবার

চেষ্টা করেন, আর ভারতীয়াদের মসৃণ শ্যামল গাত্রবর্ণ শ্বেতাঙ্গিনীদের মনে জাগায় বিক্ষোভ।

দেখতে দেখতে পোর্ট সৈয়দে পৌঁছবার দিন ঘনিয়ে এল। আগে থেকেই আমরা নোটিশ পেলাম যে, তিরিশে অক্টোবর সকালে জাহাজ সৈয়দ বন্দরে লাগবে। যাত্রীরা ইচ্ছা করলে নেমে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বন্দরটা ঘুরে আসতে পারে। দুপুরবেলায় জাহাজ আবার চলবে। এতদিন পরে আবার মাটিতে পা দেব এই আনন্দে সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

তিরিশ তারিখে ভোর পাঁচটা নাগাদ জাহাজ বন্দরে ঢোকানোর চেষ্টা চলল। আমরা তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে তৈরী হয়ে নিলাম। তখন জাহাজ খালের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অনেকগুলি ছোট ছোট নৌকা বোঝাই করে নানাপ্রকার চামড়ার জুতো, ব্যাগ, কুশন, সুটকেশ, পুঁতির মালা, গালিচা প্রভৃতি জিনিসপত্র নিয়ে মিশরীয় ও আরবী লোক এসে জাহাজের যাত্রীদের সঙ্গে দরদস্তুর আরম্ভ করে দিয়েছে। সে জিনিসগুলির অধিকাংশই রমণীমনোহারী, সুতরাং হয় মহিলারা নয় তাঁদের স্বামীরা ছিলেন ক্রেতা। অনেকেই স্ত্রীর জন্য উপহারস্বরূপ পিরামিড আঁকা হাতব্যাগ কিনলেন। জাহাজে মিশরের জাতীয় পতাকা উড়ছিল। আমাদের পাসপোর্টগুলি জাহাজে মিশরীয় পুলিশের জিম্মা করে দিয়ে বন্দরে নামলাম। বেশ উঁচু থেকে একটা সিঁড়ি জেটিতে লাগানো হল। আমরা ভারতীয়রা একটা দল বেঁধে নেমে গেলাম। জেটিতে নামতেই সরকারী গাইড সহর ঘুরিয়ে দেখানোর প্রস্তাব করল। তার পরনে আগুল্ফলম্বিত সার্ট ও লাল ফেজ টুপি। আমরাও অপরিচিত জায়গায় গাইড নিয়ে যাওয়াই সঙ্গত মনে করলাম। সহরের গেটে ঢুকবার আগেই কাস্টম্‌সের ঘাঁটি পার হতে হয়। এখানে খুবই কড়াকড়ি করে। মেয়েদের আবার আলাদা স্থান। একটি ছোট্ট ঘরে মুক্তার মালা গলায় দুলিয়ে মেয়ে অফিসার

বসেছিল। আমার হাতে কিছুই ছিল না। অন্যান্য মেয়েদের হাতব্যাগ খুলে কি দেখল কে জানে?

গেটে ঢুকতেই চোখে পড়ল নোংরা একটি সহর। দুবছর ইউরোপে কাটিয়ে জঞ্জাল ভর্তি রাস্তা, নোংরা শ্রীহীন বাড়িঘর চোখে বড়ই খারাপ ঠেকল। রাস্তার দুধারে নানাপ্রকার ফেরিওয়ালা। তারা পুঁতির মালা, স্মারকচিহ্ন ইত্যাদি বিক্রী করছিল। হাল্কা নাচুনে সুরে বাজনা বাজিয়ে গান গেয়ে পয়সা নেওয়াও চলছিল। আমাদের গাইডটি কাক তাড়ানোর ভঙ্গীতে দুইহাতে ফিরিওয়ালা তাড়াতে তাড়াতে আমাদের সাবধান করে দিল যে, ওরা মহা ডাকাত, ভালো সম্ভ্রান্ত দোকানে সব দ্রব্য উচিত মূল্যে পাওয়া যাবে।

পথ দিয়ে নানারকম লোক চলাফেরা করছিল। ছেলেদের অধিকাংশই লম্বা আলখাল্লা ও লাল টুপি পরা, মেয়েদের পরণে কারো কারো ইউরোপীয় পোষাক, কারো বা পা পর্যন্ত ঢাকা কাল কাপড়, তাদের মুখ, নাক ঢাকা, চোখ দুটি ও কপালের একটু অংশ শুধু বেরিয়ে আছে। রাস্তার দুধারে বাজার বসেছিল। স্তূপীকৃত পেয়ারা লেবু ইত্যাদি গড়াগড়ি যাচ্ছিল। তারই মাঝে পরম আলস্যভরে বসেছিল বিক্রেতা। আমাদের মধ্যে একজন একটি পুলিশকে সেলাম জানাতে সে পরম প্রীত হয়ে তাঁকে 'ভাইজান' সম্বোধনে আপ্যায়িত করে কোলাকুলির অভিপ্রায় জানাল। ভদ্রলোকটি তখন কোনমতে পাশ কাটাতে পারলে বাঁচেন।

গাইড আমাদের কতগুলি দোকানে নিয়ে গেল। অনেকেই আত্মীয়বন্ধুদের জন্য অনেক কিছু কিনলেন। এখানে নানা দেশের মুদ্রা চলে।

ছাড়বার কিছুক্ষণ আগে জাহাজ ভোঁ দিল। তারপর ধীরে ধীরে জাহাজ সুয়েজ খালে ঢুকল। দুপাশের দৃশ্য বেশ সুন্দর। পরিচ্ছন্ন বাড়ি, অঙ্গনে গৃহপালিত উট, গাছের সারি। রাতে

ইস্‌মাইলিয়া সহর আলোয় ঝল্‌মল্ করছে। সেখানটা হ্রদ বলে বেশ চওড়া।

আবার সেই কুলহারা সমুদ্র। তবে, দিন কতকের মধ্যেই এডেন পৌছাব।

তেসরা নভেম্বর সকালে জাহাজ এডেন বন্দরে লাগল। এটি ভারত স্বাধীন হবার আগে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের অধীন ছিল। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস থেকে খাস ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তীরের জল অগভীর বলে বেশ খানিকটা তফাতেই জাহাজ নঙ্গর করল। ছোট ছোট মোটর বোট জাহাজের কাছে এল, এবং একটি লম্বা মইএর মতো সিঁড়ি বেয়ে আমরা সেই বোটে চড়ে বন্দরে গেলাম। সেখানে ধুতি কোর্তা ও গান্ধীটুপি পরা মূর্তি দেখে মন খুশিতে ভরে উঠল। আমাদের দলটি নেহাত ছোট ছিল না। একজন ডাক্তারের লণ্ডনের বন্ধুর দাদারা এখানে ব্যবসায় উপলক্ষ্যে থাকেন। তাঁদের খুঁজে বার করবার জন্য ডাক্তারটি ধুতিপরা ভদ্রলোকের শরণাপন্ন হলেন। নাম করতেই তিনি তাঁদের চিনতে পারলেন।

তখন তাঁরা এসে অত্যন্ত সমাদরে দুটী মোটর করে আমাদের তাঁদের বাড়ি নিয়ে গেলেন। এঁরা গুজরাটী, পৃথিবীর বহুস্থানে এঁদের বহুপ্রকারের ব্যবসায় আছে।

এডেন অতি রুক্ষ স্থান। চারিদিকে ধূসর পাহাড়, হিংস্র পাথরের চাঁই, বালু, মরুভূমি, অসহ্য গরম। উঁচু পাহাড়ের মাঝে সঙ্কীর্ণ পথ দূর থেকে তোরণের মতো লাগছিল। বাড়িগুলি খুব বড় নয়। অনেক বাড়িঘর পুড়ে ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। প্যালেস্টাইনের আরব ও ইহুদীদের কলহের রেশ এখানেও লেগেছে। স্থানীয় আরব ও ইহুদীদের মধ্যে দাঙ্গার ফলে এই ধ্বংসাত্মক কার্য।

এডেন সহর পোর্টসৈয়দের মতো অত অপরিচ্ছন্ন না হলেও খুব

বেশি পরিষ্কার নয়। গরীবদের বাসস্থান দুধারেই চোখে পড়ল। ছোট ছোট ভাঙাচোরা বাড়ি. যেখানে সেখানে ছাগল বাঁধা, অলস উট, ভিস্তিওয়ালা, অর্ধ উলঙ্গ ছেলেমেয়ের ভীড়। কেমন একটা হতশ্রীর ছাপ। সব কিছুই যেন নিষ্প্রভ।

প্রথমেই আমরা গৃহস্বামীর বাড়ি গেলাম। নীল, সাদা, লাল, হলদে প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের বিচিত্র সমাবেশে বাড়িটি রুক্ষ পরিবেশে বেশ একটু নূতনত্বের সৃষ্টি করেছে। গৃহকর্তা অত্যন্ত সমাদর করে বসালেন। বৈঠকখানার দেয়ালে গান্ধী, নেহেরু, নেতাজীর, বহুপ্রকার কাল্পনিক রঙিন ছবি। তাতে হিন্দী ভাষায় দুলাইন করে পদ্যও লেখা আছে। ঠিক হল একটু বেড়িয়ে এখানে ফিরে এসে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে জাহাজে পৌঁছানো যাবে।

গাড়ি করে আমাদের একটি উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হল। মরুভূমির মধ্যে উদ্যান দেখতে আমাদের খুবই কৌতূহল হল। আট আনা দর্শনী দিয়ে ঢুকতে হয়। অতি রুক্ষ বাগান, গাছগুলি ধূসর পাটল মাটিতে নুয়ে পড়েছে; গ্রীষ্মের দিনে ঝুড়িতে রাখা শুকনো শাকের মতো তার পাতা। পাইপ করে গাছের গোড়ায় জল দেবার ব্যবস্থা আছে। এরই মধ্যে ফুটেছে লঙ্কা জবা, রক্ত করবী আর নয়নতারার ফুল। প্রাগে রক্তকরবী দেখেছিলাম। তাছাড়া এসব ফুল বিদেশে দেখিনি। বাংলাদেশের শ্যামল স্নিগ্ধ কুটীর প্রাঙ্গণে বঙ্গবধূর কাঁকনপরা হাতের জলসেচনে বর্ধিত হয়ে এফুল সরস পরিবেশকে সরসতর করে তোলে। এত দূরে এই আরবদেশের মরুপ্রান্তরে জবা আর করবী আমার মনকে উদাস করে তুলল।

উদ্যানটি উঁচুনীচু পাহাড়ে ভর্তি। জল জমিয়ে রাখবার জন্য প্রকাণ্ড পুকুরের মতো অনেকগুলি গর্ত আছে। দশ বারো বছরে অবশ্য এক আধবার বৃষ্টি হয়। একটা প্রবাদ আছে যে, যদি এখানে উনিশ জন লোক একত্রে একটি জলভরা জায়গা দেখে

তবে তাদের মধ্যে একজনের অকালমৃত্যু অবধারিত। এ প্রবাদের মূল কি তা জানি না।

নভেম্বর মাসেও এত ভীষণ গরম হচ্ছিল, যেন একটা জ্বলন্ত চুল্লীর মধ্যে এসে পড়েছি। তার উপরে কতগুলি আরব বালক পয়সার জন্য মাছির মতো বিরক্ত করছিল। বাগানে একটা খুব গভীর কূপ ছিল, পাথর ফেলে তার গভীরতা পরীক্ষা করা হোল। একটি বৃদ্ধ মুসলমান সেখানে বসে ছিল, তাকে কিছু পয়সা দিয়ে আমরা বাগান থেকে ফিরলাম।

বাড়ি ফেরার পথে 'মাতাজী'র মন্দিরে যাবার জন্য বন্ধুরা আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এডেনের হিন্দু অধিবাসীদের উদ্যমের ফল এটি। পাহাড়ের গায়ে মন্দির। গেটের মধ্যে ঢুকতেই কেমন একটি স্নিগ্ধভাবে শরীর মন আপ্লুত হয়ে উঠল। গাছের তলায় জুতো ছেড়ে হাত পা মুখ ধুয়ে যেতে হয়। আমাদের সঙ্গে একটি মুসলমান বন্ধু ছিলেন। তিনি বেঞ্চিতে বসে রইলেন। ইউরোপীয় ও মুসলমানের প্রবেশ নিষেধ শুনে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। জগন্মাতার মন্দিরে এখনও সন্তানদের প্রবেশ নিষেধ। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি মনে এল—

"মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল-ঘট হয়নি তো ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে।"

আগেই বলেছি মন্দিরটি পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। পাহাড়টি বেশ অদ্ভুত। দেখলে মনে হয় যেন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে মন্দিরটিকে প্রখর সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা করছে। ফাটলে পায়রার ঝাঁক, তাদের কূজন পরিবেশের স্নিগ্ধতা বাড়িয়ে তুলেছে। কিছুদিন আগে দেওয়ালী উৎসব হয়ে যাওয়াতে এখনও জায়গায় জায়গায় সিঁদুর আবীরের ছড়াছড়ি। মন্দিরের ভিতরটা খুবই শীতল। মাতাজীর মূর্তি ধাতুর

তৈরী, বোধ হয় পিতলের। আমাদের অনেক বন্ধুই স্যুটশুদ্ধ আভূমিনত হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন। পুরোহিত প্রত্যেককে সিঁদুর ও শুকনো নারকেলের টুকরো দিলেন।

• সেখান থেকে শেঠজীর বাড়ি গেলাম। আমাদের উপরে নিয়ে যাওয়া হল। বাড়ীর গৃহিণী—খুব সজ্জিতা একটি মহিলা, তাঁর পাঁচ বছরের শিশুকন্যার হাত ধরে এলেন। মেয়েটি ভারী মিষ্টি দেখতে, বেণীতে, টিপে, কাজলে, গহনায় একেবারে পুতুলের মতো দেখাচ্ছিল। অনেকগুলি মুসলমান ভৃত্য ঘরের কাজকর্ম করছিল।

'সামান্য' জলযোগের আয়োজন দেখে কিন্তু চক্ষু চড়কগাছ হল। এত যে মানুষে খেতে পারে তা জানা ছিল না। বিরাট লুচি, নানাপ্রকারের ভাজি, পকৌড়ি, ঝুরিভাজা, লাড্ডু, মেঠাই, পাঁপরভাজা, চা। টেবিলের মধ্যখানে প্রকাণ্ড থালায় ভিন্ন ভিন্ন বাটিতে আম, ঢেঁড়স, পটল, লঙ্কা, ধনেপাতা ইত্যাদির বিভিন্ন আচার। আমরা যথাসাধ্য খেলাম। তারপর পান দেওয়া হল। দুবছর পরে এই প্রথম পান খেলাম। দেওয়ালী উৎসব এঁদের কাছে বিজয়া দশমীর মতো। তার অব্যবহিত পরেই ভারতীয় দেখে এঁরা খুবই উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বার বার বললেন, 'আমাদের দেওয়ালী সার্থক হল।'

খাওয়ার পর গৃহিণী আমাকে ও সিন্ধী মেয়েটিকে ঘরদোর দেখাতে চললেন। দরজায় জানালায় লম্বা লম্বা পুঁতির কাজ ঝোলানো, তাতে স্বাগতম্ লেখা, চাদরে নিপুণ হাতের সূচীশিল্প।

এঁদের আপ্যায়নে খুবই প্রীত হলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার উপায় ছিল না। তাই অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম। যাবার সময়ে এঁরা অনেকগুলি পান মশলা দিয়ে দিলেন।

জাহাজে এসে দেখি ছোট ছোট ছেলেরা মাছের মতো জলে

সাঁতার কাটছে, আর কেউ পয়সা ফেলে দিলে ডুব দিয়ে তা তুলে আনছে। ক্রমে সময় ঘনিয়ে এল, ধীর গতিতে জাহাজ বন্দর ছাড়ল।

এডেনের পর সমুদ্রকে ভারতবাসীরা বলেন হোম ওয়াটার। সাতই নভেম্বর সন্ধ্যায় বোম্বাই এর আলোকমালা চোখে পড়ল। আমরা সবাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। ক্রমশঃ জাহাজ বন্দরে লাগল। কুলীদের অবিশ্রান্ত চীৎকার, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সিন্ধী বাস্তুহারাদের অস্থায়ী সংসার চক্ষুকর্ণকে পীড়িত করল। বোম্বাইয়ের পথে পথে রাত্রে লোক শুয়েছিল। এত অপরিচ্ছন্নতা দেখে মনে একটি আশাভঙ্গের সুর বাজতে লাগল। কিন্তু তারই সঙ্গে মনে হল, এ ভারতবর্ষ তো আমারই, এই হতশ্রী দারিদ্র্যের দায়িত্বে তো আমারও অংশ আছে, এবং এই নবলব্ধ স্বাধীনতাকে সার্থক করে তোলায় আমার দানও নিশ্চয় অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষের মৃত্তিকাকে প্রণাম জানিয়ে জাহাজ থেকে নামলাম।

॥ সমাপ্ত ॥